ইয়োরোপের চিঠি

পারির সব জায়গার সৌন্দর্য্য ভাল করে বুঝতে হলে, পারির ও ফ্রান্সের ইতিহাস জানা দরকার। প্লাস্ দে লা কনকরড্ (Place de la Concord) বলে যে স্থানটির দক্ষিণে সঁাজেলিজের সুন্দর রাস্তা, এই স্থানটি ফ্রান্সের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ছবিতে দেখছ একটি সুন্দর ফোয়ারা। কিন্তু এক সময় ফ্রান্সের লোকেরা ফ্রান্সের রাজাকে ওই জায়গায় হত্যা করেছিল। সে দু'শ বছরের ওপর হবে: তখন ফ্রান্সের রাজা ছিলেন ষষ্ঠদশ লুই। তিনি তাঁর রাজ্য ভাল করে শাসন করতে না পারায় প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তাঁর তত দোষ ছিল না, তাঁর মন্ত্রী ও সভার সব লোকেরা, বড় বড় জমিদারেরা দেশের গরীব লোকদের পীড়ন করে খুব টাকা আদায় করত নিজেরা আমোদ-প্রমোদ করত, দেশের সব লোক সুখে সচ্ছন্দে আছে কি না, ভাল খেতে পরতে পারছে কিনা, সে বিষয়ে কোন দৃষ্টি ছিল না। দেশের লোকেরা অনেকদিন এই সব ধনী সভাসদ, জমিদারদের অত্যাচার সহ্য করে অবশেষে বিদ্রোহী হয়ে উঠল! তারা নিজেরা প্রতিনিধি ঠিক করে নিজেদের ভাল করে শাসন করবার ব্যবস্থা করলে, রাজাকে বন্দী করে রাখলে, তারপর রাজা একবার পালাতে চেষ্টা করেন। পারি থেকে অনেক দূর রাজা রাণী তাঁদের ছেলে নিয়ে পালিয়ে গেছলেন, কিন্তু পথে এক জায়গায় ধরা পড়ে যান; তখন বিদ্রোহী প্রজারা তাঁকে আবার পারিতে নিয়ে এল, তাঁর বিচার হল, দেশের শত্রু বলে তাঁর মৃত্যু দণ্ডের হুকুম হল। ১৭৯৩ খৃঃ এই জায়গায় ফ্রান্সের তখনকার রাজাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। তখন গিলোটিন বলে এক রকম কাঁসীগাছ মানুষের মাথা কাটবার যন্ত্র বাহির হয়েছিল, তাই দিয়ে সব শত্রুদের বধ করা হত। আজ যেখানে সুন্দর জলের ফোয়ারা, সেখানে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দ থেকে ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে প্রায় তিন হাজার লোককে গিলোটিনে বধ করা হয়েছিল। রাজার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের প্রজাদের এই বিদ্রোহকে ফরাসী বিপ্লব বলে। এক রাজা আর এক রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং যুদ্ধে হারিয়ে তাকে মেরে ফেলেছে,

এ রকম তোমরা ইতিহাসে পড়েছ কিন্তু প্রজারা রাজাকে বন্দী করে বিচার করে তাকে মেরেছে এরকম বোধ হয় তোমরা কখনও পড়নি। অবশ্য এরকম ঘটনা
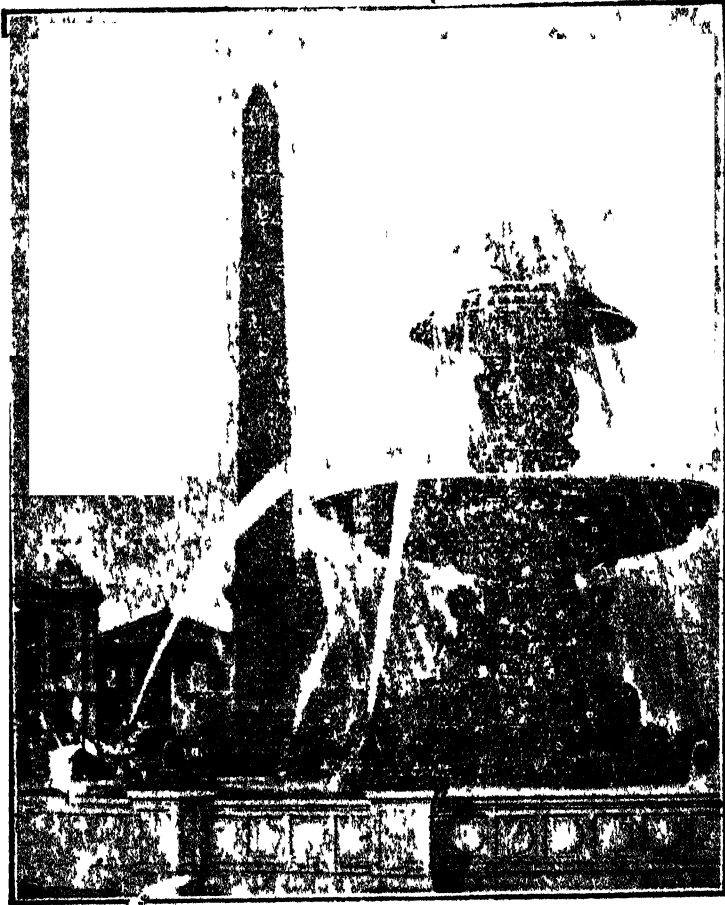
প্লাস দে লা কনকর্ড

খুব কমই ঘটেছে। কিন্তু ফ্রান্সের প্রজাদের আগে, ইংরাজেরা তাদের এক রাজাকে এমনি ভাবে বিদ্রোহ করে বন্দী করে বিচার করে মেরেছিল। তাঁর নাম হচ্ছে প্রথম

চার্লস। সে ১৬৪৯ খৃঃ অব্দে। রাজা চার্লসের খারাপ শাসনে ও তাঁর মন্ত্রীর অত্যাচারে দেশের লোকেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠল, দেশের বড় ধনী জমিদার লর্ডেরা রাজার পক্ষ নিলে, দু'দলে খুব যুদ্ধ আরম্ভ হল। অবশেষে রাজার দল হেরে গেল, রাজা বন্দী হয়ে শেষে ফাঁসি কাঠে প্রাণ দিলেন। প্লাস্ দে লা কনকর্ডের ফোয়ারা জলের খেলা দেখতে দেখতে মনে হল এখানে একদিন রক্তের নদী বয়ে গেছে।
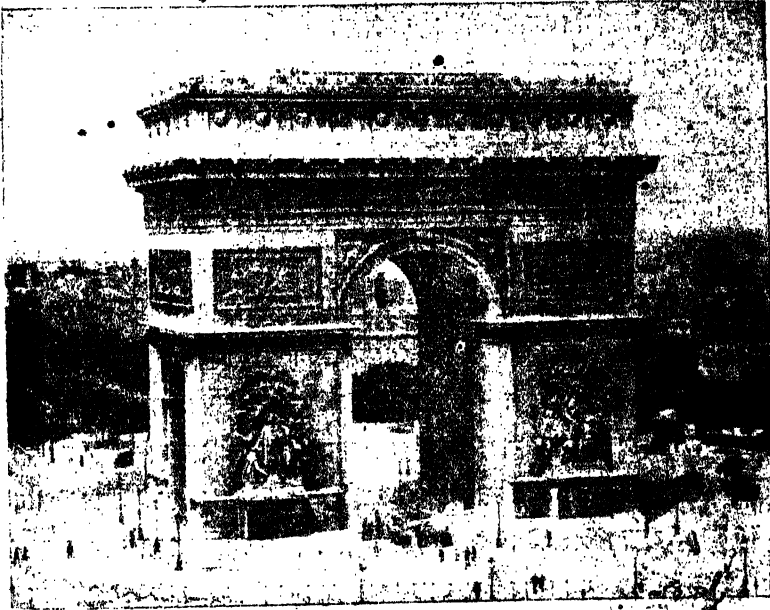
আর্ক দ্যো ত্রোয়াম্প

এই জায়গাটির উত্তর দিকে একটি সুন্দর বাগান আছে নাম জারদাঁ দ্যো তুইলেরি, অর্থাৎ তুইলেরির বাগান। এখানে আগে একটি সুন্দর প্রাসাদ ছিল, সেই প্রাসাদে ফরাসী বিপ্লবের সময় পারির প্রজারা তাদের রাজাকে বন্দী করে রেখেছিল। এই প্রসাদে নেপোলিয়ান যখন ফ্রান্সের রাজা হন তখন বাস করতেন, তাঁর প্রধান অফিস ছিল। তারপর পরবর্তী আর একটি প্রজাদের বিদ্রোহে, বিদ্রোহীরা এ

প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে দেয়, একেবারে ধ্বংস করে ফেলে। এখন সেখানে সুন্দর বাগান।

ছবিতে ফোয়ারার সামনে একটি ছোট পাথরের স্তম্ভ দেখতে পাচ্ছ। এটিও বেশ দেখবার জিনিষ। এটি ইজিপ্ট থেকে আনা। ইজিপ্টের অতি প্রাচীন এক সহরে এক মন্দিরের সামনে এটি ছিল। মিসরের অতি প্রাচীন ভাষায় সে দেশের অতি পুরাতন এক রাজার কীর্ত্তিকথা এতে লেখা আছে। সে রাজা খৃষ্ট জন্মাবার বার শ' বছর আগে অর্থাৎ প্রায় তিন হাজার দুশ' বছর আগে মিসরে রাজত্ব করতেন। এই পাথরটি ৭৫ ফিট উঁচু কিন্তু ওজনে ২৫০ টন এবং দেখতেও বেশ সুন্দর। এই হাজার হাজার বছরের পুরাতন পাথরটি দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়।

দক্ষিণ দিকে সুবিখ্যাত সাঁ-জেলিজে। তিনশ' বছর আগে এ জায়গাটি একটা পোড়ো মাঠ ছিল, মাঝে মাঝে সেন নদীর বানের জলে ডুবে যেত, এখন অনেকের মতে সাঁজেলিজের রাস্তার মত রাস্তা পৃথিবীর কোন সহরে নাই। রাস্তাটি সত্যই যেমন প্রশস্ত তেমনি সুন্দর! দুধারে গাছের ঘন সারি। সাঁজেলিজের সামনের অংশটি একটি সুন্দর পার্ক বা বাগানের মত, দেড় মাইল লম্বা ও সিকি মাইল চওড়া। শেষের অংশটিতে প্রশস্ত মসৃন পরিষ্কার পথের দুধারে অতি সুন্দর বাড়ীর সারি। কাউন্ট, ডিউক উচ্চবংশীয়দের, লক্ষপতিদের, সুন্দর কারুকার্য্যময় প্রাসাদের সারি বড় বড় সুন্দর হোটেল ও দোকান পাটে, ইত্যাদি রাস্তাটি অতি চমৎকার সাজান। সন্ধ্যেবেলায় যখন সব বাড়ীতে দোকানে আলো জ্বলে ওটে, তখন অতি সুন্দর দেখায়। এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড়লোক ও বংশগৌরবে উঁচু লোকদের পাড়া।

রাস্তাটি একটি বড় চৌমাথায় এসে শেষ হয়েছে, সেখানে বারটি প্রশস্ত রাস্তা বা অ্যাভিনিউ এসে মিলেছে। এই বারটি রাস্তার সঙ্গমক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে একটি জয়স্তম্ভ আছে, তার নাম আর্ক দো ত্রোয়াম্প। ছবিতে দেখতে পাচ্ছ, দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি বিপুল। পৃথিবীতে এরকম বড় জয়স্তম্ভ আর নাই। এটি লম্বায় ১৪৭ ফিট আর চওড়ায় ১২৯ ফিট। নেপোলিয়ান এটি তার যুদ্ধজয়ের কীর্ত্তি-

স্তম্ভরূপে তৈবী করতে আরম্ভ কবেন, ত্রিশ বছব পবে এটি শেষ হয়। স্তম্ভের গায়ে কোন প্রসিদ্ধ যুদ্ধের দৃশ্য, কোন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা ইত্যাদি নেপোলিয়ানের জীবনের নানা কীর্তি খোদাই করা আছে। একদিকে ১৭২টি যুদ্ধের নাম লেখা আছে। ডানদিকেব থামটিতে যে পাথবেব বীবত্ব ব্যঞ্জক চিত্র খোদাই করা সেটি হচ্ছে,

আর্ক দ্যো ত্রোম্ফ পাথরের বীরত্ব ব্যঞ্জক চিত্র

স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য দেশভক্ত সৈন্যদের যুদ্ধ যাত্রা। যে ফরাসী-বিপ্লবের কথা আগে লিখেছি, সেই রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সেনাদের প্রাণের রূপ শিল্পি পাথরে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত করে গেছেন।

এই জয়স্তম্ভটি এখন সমস্ত ফরাসী জাতির একটি তীর্থ বিশেষ। তোমরা

গত ১৯১৪-১৯১৮ খৃঃঅব্দে পর্য্যন্ত ফরাসী জাতির সহিত জার্ম্মান-জাতির খুব যুদ্ধ হয়। ফরাসীদের সহিত বেলজিয়াম, ইংরাজ, রাসিয়ন, ইতালীয়ান, আমেরিকান ইত্যাদি নানাজাতি জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। তাতে অবশেষে জার্ম্মান রাজা কাইজার যুদ্ধে হেরে যান। তিনি রাজা ছেড়ে হল্যাণ্ডে পালিয়ে যান। তখন ফ্রান্সের মত জার্ম্মানীতে কোন রাজা নাই। সকল দেশবাসীরা প্রতিনিধি ঠিক করে, তাঁরাই দেশের শাসন রাজত্ব চালান।
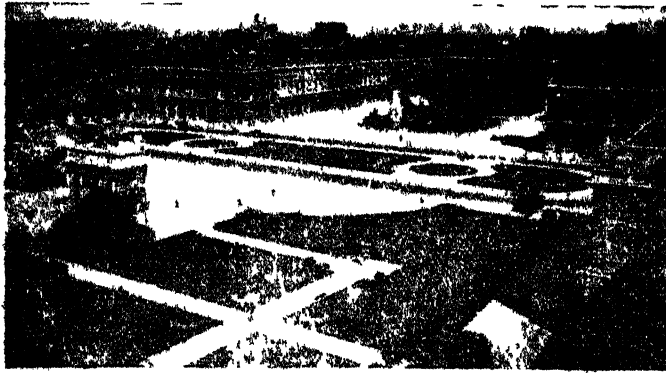
টুইলারির বাগান

এই গত যুদ্ধে যত ফরাসী সৈনিক মরেছে, তাদের যুদ্ধের কথা, দেশের স্বাধীনতার জন্যে তাদের আত্মত্যাগ ও মৃত্যুর কথা সব সময়ে মনে রাখবার জন্যে ও তাঁদের প্রতি সম্মান ও ভালবাসা দেখাবার জন্যে, যুদ্ধক্ষেত্র হতে একটি অজানা সৈনিকের মৃতদেহ এনে এই জয়স্তম্ভের তলায় যে খালি জায়গাটি আছে সেইখানে, সেই অজানা সৈনিকের সমাধি দেওয়া হয়েছে। সেই অজানা সৈনিক যেন যুদ্ধে মৃত সব সৈনিকদের প্রতিনিধি। সেই অজানা সৈনিকের সমাধির ওপর একটি ছোট চুল্লীর মত আছে, সেখানে দিনরাত সমস্তক্ষণ আগুন জ্বলছে। সে আগুন সবাইকে জানাচ্ছে যে ফরাসীজাতির প্রাণের আগুন কখনও নিভবেনা। জাতি চিরদিন বীর ও স্বাধীন থাকবে। মৃত বীর সৈন্যদের প্রতি শ্রদ্ধার

রাজা ঘটের জল মাথায় একটু ছিটিয়ে নিয়ে বললেন,—কে তুমি ?

বন্দিবুড়ী বললে—আমায় চেনো না ? আন্তিকালের দানা-লোকের আমি হলুম রাণী ; আমার নাম বন্দিবুড়ী ।

রাজা বললেন,—তা এখানে কি জন্যে ? কি চাও ?

বন্দিবুড়ী ছ'বুড়ি ছত্রিশ পাটী দাঁত মেলে এমন অট্টহাস্য করে উঠলো, যে তার কাছে বাজের আওয়াজ সোডার বোতল খোলার শব্দর মতই মিহি বোধ হয় ! সে আওয়াজে রাজবাড়ীর খিড়কির দরজার খিলেনটা হেলে পড়লো ! বন্দিবুড়ী বললে,—তুমি আমার যত প্রজা ধরে এনে মেরে ফেলচো...তার কৈফিয়ৎ নিতে এসেছি আমি । তোমার অত্যাচার অসহ্য হযেছে ..ক্ষুদ্দুর মানুষ হয়ে এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার !.. তাই তোমায় সাজা দিতে এসেচি ?

রাজা বললেন,—তুমি সাজা দেবার কে ? আমি তোমার প্রজা নই,...ক্ষমতা থাকে, তোমার সেপাই শান্ত্রী নিয়ে যুদ্ধ কর ।

বন্দিবুড়ী বললে,—সেপাই-শান্ত্রী নিয়ে একটা মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়াও ঢের ভালো !

রাজা বললেন,—কি চাও তবে ?

বন্দিবুড়ী বললে—কি তোমার মন্তর তন্তর আছে, বার কর । আমি রাজবাড়ী শুদ্ধু তোমাদের গিলে খাবো...কি করে রক্ষা পাও, দেখি...বলে বন্দিবুড়ী হাঁ করলে .সে কি হাঁ ! মনে হলো, পৃথিবীখানা যেন ফট করে ফেটে গেছে, আর মাটী-গাছ-পালা ঘর-বাড়ী পাহাড়-পর্ব্বত সব সরে গিয়ে এক প্রকাণ্ড গহ্বর বেরিয়েছে । রাজা ঘট থেকে মন্ত্র-পড়া জল নিয়ে বুড়ীকে লক্ষ্য করে ছিটিয়ে দিলেন—যেমন বন্দিবুড়ীর মুখে সে জলের ছিটে পড়া, অমনি তার হাঁ তো বুজে গেলই, সঙ্গে সঙ্গে সেও পুড়ে ছাই হয়ে একধারে পড়লো ! ঠিক রংমশাল জ্বাললে যেমন ছাই পড়ে, তেমনি !

রাজা তাড়াতাড়ি একটা কাগজে সেই ছাইটুকু না পুরে কাগজটুকু মুড়ে একটা কৌটোয় সেটা রাখলেন, তার পর সে কৌটো আর এক কৌটোর মধ্যে এমনি করে সাত কৌটোর মধ্যে সে ছাই ভরে মস্ত এক লোহার সিন্দুকের মধ্যে সে কৌটোগুলো

পুরে একজন পাইককে বললেন,—আমার পুষ্পক রথে ওটা চাপিয়ে দে ! সিন্দুক পুষ্পক রথে চাপানো হলে রাজা নিজে সেই রথে চড়ে কত মাঠ-ঘাট দেশবিদেশ পার হয়ে কত পাহাড়-পর্ব্বতের মাথা টপ্‌কে যে মস্ত মরুভূমি ছিল, সেই মরুভূমির মাঝখানে বালি খুঁড়ে মানুষভোর গর্ত্ত করে সেই গর্ত্তে সিন্দুক পুতে বালিমুড়ি চাপা দিয়ে রাজ্যে ফিরলেন। ফিরেই হুকুম দিলেন, সবাই মিলে আমোদ-আহ্লাদ কর—মস্ত বড় শত্রু নিপাত হয়েছে। ভূত-প্রেতের বংশ এবারে নির্ব্বংশ হবার উপায় করেছি। প্রজারা হেসে খেলে বাঁচবে এবার !

এর প্রায় পাঁচশো বছর পরের কথা।

পৃথিবীতে বিস্তর মানুষের আমদানি হয়েছে। তারা সব পাহাড়-পর্ব্বত ভেঙ্গে নদীনালা বুজিয়ে অনেক দেশে অনেক রাজ্যের সৃষ্টি করে তুলেছে। কত মরুভূমিতে বাগান হয়েছে! কত মাটী কেটে নদী তৈরী করেছে! আর সেই যে মরুভূমি আদ্যিকালের বদ্দিবুড়ীকে যেখানে পুঁতে রাখা হয়েছিল, সেখানেও নতুন রাজ্য-পাট বসেছে, কত ঘরবাড়ী তার গায়ে পটে আঁকা ছবির মত ঝলমল করছে !

সেই জায়গাটুকু, বদ্দিবুড়ীকে ঠিক যেখানটিতে পোঁতা হয়েছিল,—সেখানে এক বুড়ো পণ্ডিতের কুঁড়ে-ঘর। পণ্ডিত মারা গেলে পণ্ডিতের ছেলে হলো তার মালিক। ঘরের আশেপাশে অনেকটা জমি পড়ো হয়ে ছিল। পণ্ডিতের ছেলে লাউ-কুমড়োর বীচি ছড়িয়ে গাছপালা তৈরী করার দিকে মন দিলে। পণ্ডিতের ছেলের নাম দিগ্‌গজ। দিগ্‌গজ লেখাপড়া করে না, গাছপালা পোঁতে, আর সেই সব গাছের ফল ফুল বেচে ব্যবসার দিকে সে ঝোঁক দিলে।

সেদিন নিজের হাতে দিগ্‌গজ মাটী কোপাচ্ছিল। হঠাৎ মাটীর নীচে ঘং করে একটা আওয়াজ হলো। দিগ্‌গজ ভাবলে, বুঝি, সোনার ঘড়া পোঁতা আছে! মাটী কুপিয়ে কুপিয়ে শেষে উঠলো সেই সিন্দুক। দিগ্‌গজ মহাখুশী হয়ে ডাকলে,—মা, ওমা...

মা তখন উনুনে আগুন দিয়ে রান্না চাপাচ্ছিলেন। মা বললেন,—কিরে, ডাকছিস কেন ?

দিগগজ বললে—শীগগির এদিকে এসো মা একবার। এসে ছাখো, মোহরের সিন্দুক বের করেছি।

মা ছুটে এসে দেখেন, মস্ত এক সিন্দুকই বটে! কত কালের লোহা ..মাটী আর বালি লেগে লেগে দু'চার জায়গায় মরচে ধরেছে! দিগ্‌গজ সাবলের ঘা দিতে দিতে সিন্দুকের ডালাটা খুলে গেল -অমনি সে ঝুঁকে পড়ে ডালা সরিয়ে দেখে, মস্ত এক কৌটো। কৌটোর গায়ে লেখা আছে, --"খুলো না।" হঠাৎ,... এ আবার কি কথা! দিগ্‌গজ কৌটো খুলে [illegible] আর একটা কৌটো—তার ওপরেও লেখা, "খুলো না।"—তার মধ্যে আর একটা কৌটো; তার উপরেও ঐ একই কথা লেখা, "খুলো না!" এমনি কৌটোর পর কৌটো খুলতে খুলতে শেষ মিললো, সেই কাগজের মোড়ক। তার উপরেও লেখা - "খুলো না।" দিগ্‌গজ কাগজ খুলতে যাচ্ছে, মা বললেন,—খুলিস্ নে বাবা ..বারণ করেছে .

দিগ্‌গজ বললে, —তুমিও যেমন! খুলবে না? একেই বলে মেয়ে-বুদ্ধি! দিগ্‌গজ কাগজের মোড়ক খুলতে দেখে, একটু ছাই! 'ধেৎ!' বলে ছাইটা সে মাটীতে ফেলে দিলে...যেমন মাটীতে পড়া, অমনি ছাই থেকে ধোঁয়া বেরুতে লাগলো। ক্রমে সেই ধোঁয়া মানুষের মূর্ত্তি ধরলে! সে মূর্ত্তি থেকে ফুটে বেরুলো সেই বদ্দিবুড়ী! এ্যাকে আদ্যিকালের বদ্দিবুড়া, তায় পাঁচশো বছর নায়নি, খায়নি,...তার চেহারা যা হয়েছে, সে আর বলবার নয়! বদ্দিবুড়ার মূর্ত্তি দেখে দিগ্‌গজের মা তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। দিগ্‌গজ হাজার হোক বামুন মানুষ, ভয় পেলেও সে চমকালো না! তাড়াতাড়ি আঙুলে পৈতে জড়িয়ে সে গায়ত্রী জপ করতে লাগলো! • এখন ভূত-প্রেত দানা-দত্যির দল মন্তর শুনলে একটু মুষড়ে পড়ে। বদ্দিবুড়ী বললে,—ভয় নেই তোমার। তুমি আমায় বাঁচিয়েছ, কাজেই তোমার ঘাড় মটকাবো না বরং হুকুম কর, আমি সে হুকুম তামিল করবো।...শোনো, রোজ সকালে তোমার কাছে আমি আসবো...তুমি আমায় হুকুম ফরমাশ করবে—সে হুকুম আমি তামিল করবো। তবে হুঁশিয়ার, যেদিন হুকুম দিতে পারবেনা, সে দিন তোমার ঘাড় ভাঙ্গবো, বুঝলে!

দিগ্‌গজ বাঁচলো। ভয়ে সারা হচ্ছিল, তার ভয় এখন ঘুচে গেল। দিগ্‌গজ বললে,—বেশ!.

বদ্দিবুড়ী বললে,—এখন হুকুম কর...

দিগ্‌গজ বললে—এখানকার এই সব মাটী কুপিয়ে ফলফুলের বীজ পুঁতে তাতে জল ঢেলে আজই গাছ বার করে দাও! শুধু গাছ বার-করা নয়, তাতে ফল-ফুল ফুটিয়ে দেওয়া চাই—এই আমার হুকুম।

সেই ধোঁয়া মানুষের মূর্ত্তি ধরলে

বদ্দিবুড়ী বললে—বেশ! বলেই সে গেল মাটী কোপাতে। দিগ্‌গজ তখন মার মুখে-চোখে জল দিয়ে তাঁর জ্ঞান করালে। মার জ্ঞান হতে আড়ালে মাকে নিয়ে গিয়ে বদ্দিবুড়ী কথা সে তাঁকে খুলে বললে! শুনে মা বললেন,—কে জানে বাপু, ভূত-প্রেতকে ঘাঁটানো...কি হতে কি হবে শেষে...।

একগাল হেসে দিগ্‌গজ বললে—তোমার কোনো ভাবনা নেই, আর। দ্যাখোনা মা, ভূতের কি হাল করি...

সন্ধ্যার সময় বদ্দিবুড়ী এসে বললে—কাজ দেখে নাও।...আমি এবার বাড়ী যাবো। আবার কাল সকালে আসবো কাজ ঠিক করে রেখো না হলে...মনে আছে তো?

দিগ্‌গজ ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে, সামনেই মস্ত বাগান...দেদার গাছপালা...কত রঙের ফুলে গাছ আলো হয়ে রয়েছে, আর হেন ফল নেই যা বাগানের গাছে ফলেনি! আম কাঁঠাল বাদাম আখরোট থেকে কুল-হর্‌তকিটি অবধি।

দিগ গজ বললে,—যা বুড়ী, এবার তোর ছুটী !

পরের দিন সকালে বদ্দিবুড়ী আবার এসে হাজির। এসেই বললে—কাজ কি আছে গো ঠাকুর ?

দিগ্‌গজ বললে,—শোন্‌ এই কুঁড়ে-ঘরে আর থাকতে পারি না। এ কুঁড়ে ঘুচিয়ে সাত-মহল বাড়ী করে দে—বিজলী বাতি, টেলিফোন, মোটর, মোটরের গারেজ, এরোপ্লেন সব চাই—

বুড়ী বললে,—বেশ !

দিগ্‌গজ তখন কাঁধে গামছা ফেলে ও পাড়ার বড় দীঘিতে স্নান করতে চল্‌লো। মা বললেন,—আমি বুড়া শিবের পূজো দিয়ে আসিগে। তোর কল্যাণে অবস্থা যখন ফিরলো—

সন্ধ্যা-নাগাদ আশপাশের লোক এসে দেখে, বামুন পণ্ডিতের কুঁড়ে ঘুচে সেখানে মস্ত সাতমহল কোঠা উঠেছে! কি তার বাহার! রাজার বাড়ী তার কাছে যেন ছেলেদের খেলার ঘর! তা ছাড়া মোটর এরোপ্লেন...এ সব তো কেউ চক্ষেও দেখেনি কখনো...রাজার পুষ্পক রথ এর কাছে নেহাৎ খেল্‌না যেন! দিগ্‌গজ বললে—বেশ হয়েছে রে বুড়ী... ।

বুড়ী বললে—আজ তাহলে আসি। আবার কাল আসবো...কাজ ঠিক রেখো।

পরের দিন বুড়ী আসতে দিগ্‌গজ বললে—দ্যাখ্‌ বুড়ী, আমার বাড়ীর ছাদ থেকে দক্ষিণ দিকে যে ঐ উঁচু পাহাড়টা দেখা যায়, ওটা ওখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে। পাহাড়টার জন্যে হাওয়া বন্ধ হচ্ছে! পাহাড় সরিয়ে ওখানে মস্ত এক দীঘী বানিয়ে দে। সে দীঘীর জলে রাজহংস সাঁতার দেবে, আর লাল নীল পদ্ম ফুটে থাক্‌বে, তার জল হবে স্ফটিকের মত...আর আগাগোড়া শ্বেতপাথরে বাঁধানো হবে।

বুড়ী বল্লে,—আচ্ছা! বলেই সে ছুটলো পাহাড়ের দিকে!

সন্ধ্যার পর সাতমহলের সাতশো বিজলী বাতি জ্বলে উঠতে সেই আলোয় দিগ্‌গজ দেখে, সামনে পাহাড়ের চিহ্নমাত্র নেই ..যেখানে পাহাড় ছিল, সেখানে শ্বেতপাথরে বাঁধানো মস্ত দীঘী...চমৎকার !

পর দিন ভোরের আলো ফুটতে দিগ্‌গজের মা এসে বললেন,—ছাখ, ছাখ,... মরি, মরি, নতুন দীঘিতে পরী এসেছে চান করছে ..

দিগ্‌গজ ছাদে গিয়ে দীঘির দিকে চেয়ে দেখে পরীর মত একটি মেয়ে জলে সাঁতার দিচ্ছে ! কে ও ?

দরোয়ানকে এত্তেলা দেওয়া হলো। দরোয়ান বললে,—উনি এ রাজ্যের রাজকন্যা !

দিগ্‌গজ বললে,—বটে ?

মা বললেন—আহা, বউ যদি করতে হয় তো অমনিটি ...

ঠিক এই সময়ে বদ্দিবুড়ী এসে হাজির। এসে বললে—কাজ ?

দিগ্‌গজ বললে,—এ রাজ্যের রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিয়ের বন্দোবস্ত কর্ বুড়ী !

বুড়ী ছুটলো, রাজ-দরবারে ! রাজা সিংহাসনে বসে ছিলেন। বুড়ী গিয়ে তাঁর কাছে পাত্রের কথা বললেন। রাজা বললেন, তখন ঐ দশগজ বামুনের ছেলে দিগ্‌গজ বামুন ! তা ওর আছে কি ' একখানা সাতমহল বাড়ী আর বাগান ? আগে রাজার খুশ্যি ভেট্ পাঠাতে বল্‌গে যা ..ভেট্ যদি পছন্দ হয়, তখন বিয়ের কথা কাণে তুলবো।

বুড়ী ফিরলো, ফিরে দিগ্‌গজকে রাজার কথা বললে। দিগ্‌গজ বললে,—বেশ, তাহলে এমন মণি-মাণিক এনে দে বুড়ী, যা রাজা বাহান্ন পুরুষেও চোখে দেখে নি—

বুড়ী আবার ছুটলো...ঘণ্টাখানেক বাদে হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এলো, ফিরে আঁচলের গেরো খুলে এক মণি বার করে বললে, -এই নাও ঠাকুর...।

দিগ্‌গজ দেখে, মণির কি জলুষ ! সাতটা রঙ ফুটে বেরুচ্ছে মণির গা থেকে। দিগ্‌গজ বললে—বেশ, পঞ্চাশ জন ঘোড়সওয়ার ডাক্...তারা আগে-পিছনে যাবে, তার মাঝখানে তুই এক চতুর্দোলে—রেশমী রুমালে মণি বেঁধে নিয়ে যাবি !

বুড়ী হুকুম পালন করলে। কোথেকে কুচকুচে কালো ঘোড়া এলো পঞ্চাশটা, তাদের পিঠে টকটকে লাল পোষাক-পরা পঞ্চাশ জন ঘোড়সওয়ার...তারা বুড়ীকে নিয়ে

রং বাড়ীতে চললো। মণি দেখে রাজার চক্ষুস্থির...এমন মণি চোখে দেখা কি—এ মণির কথা কানেও শোনেননি কোনো কালে।

খাতাঞ্চি বললে—কি একটা পুরোনো পুঁথিতে পড়েছি মহারাজ, দেবরাজ ইন্দ্রের তোষাখানায় এমনি একটি মণি আছে! এর জুড়ি পাবার জন্য ইন্দ্র একবার নারদকে ত্রিভুবনে পাঠিয়েছিলেন, জুড়ির খোঁজে। তা নারদ কোনো সন্ধানও পাননি!

রাজা বললেন—এমন মণি যে এনে দিতে পারে, তার হাতে মেয়ে দেওয়া যায়, কি বল?

পাত্রমিত্রের দল বললে—নিশ্চয়!

তখন বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেল। এর মধ্যে বুড়ীকে রোজ ফরমাশ করে করে দিগ্‌গজ স্বর্গের ঐশ্বর্য্যে নিজের বাড়ী ভরে ফেললে। কত রাজ্য তার হাতে এলো, কত পাহাড় ধ্বসিয়ে সে গ্রাম-নগর বসালে··কত শত্রুর মাথার পাগড়ী এনে পায়ের সামনে জড়ো করলে—তার পর বিয়ের আয়োজন যা হলো, তা দেখে স্বর্গের দেবতাদের অবধি চক্ষু স্থির হয়ে গেল! ইন্দ্র ছুটে গিয়ে ব্রহ্মার কাছে বললেন,—এ বামুন করে কি, মশায়! এ যে ঐশ্বর্য্যের বহরে কুবেরকে কাহিল করে দিলে, আমার বাবুগিরিকেও ধিক্কার ধরিয়ে দিলে!

ব্রহ্মা বললেন,—মানুষের বুদ্ধি বাপু,—তার সঙ্গে টেক্কা দেওয়া কি সহজ কথা।

ইন্দ্র বললেন—মানুষের বুদ্ধির এমন দৌড়!

ব্রহ্মা বললেন—হ্যাঁ, তবু তো ও একা...এর পর বিয়ে হলে বৌয়ের যা বুদ্ধির বহর দেখবে...মেয়ে-বুদ্ধি বলে উড়িয়ে দাও...মেয়ের বুদ্ধির বহর আরো বেশী দেখো একদিন...

যাক্—দিগ্‌গজের তো বিয়ে হয়ে গেল রাজকন্যার সঙ্গে। বদ্দিবুড়ীর রোজই একটা-না-একটা ফরমাশ চলেছে! শেষ এমন হলো, যে, দিগ্‌গজের ফরমাশের পুঁজি ফুরিয়ে এলো...রাত্রে তার ভাবনা হলো, কাল সকালে বুড়ী এলে তাকে কিসের ফরমাস করবে! রাজকন্যা বললেন—কি ভাবচো তুমি?

দিগ্‌গজ তখন বুড়ীর কথা খুলে বললে। তারি গুণে দিগ্‌গজের এত ঐশ্বর্য্য, এত

বাড় বাড়ন্ত, সব কথা খুলে বললে ! তার উপর সেই সর্ত্ত—ফরমাশ করতে না পারলেই ঘাড়টি মট্‌কে দেবে...।

রাজকন্যা হেসে বললেন—এই ! আচ্ছা ! আজ তো ঘুমোও...সে কাল সকালে আমি ফরমাশ বলে দেবো'খন...।

দিগ্‌গজ বললে, তুমি ফরমাশ বাত্‌লে দেবে ? বল কি রাজকন্যা ..!

রাজকন্যা বললেন,—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমিই বলে দেবো !

এ কথায় ভরসা পেয়ে দিগ্‌গজ তো ভাবনা ভুলে ঘুমিয়ে পড়লো। রাত পোহাতেই বুড়ী এসে হাজির ! এসে বললে—আজকের ফরমাশ কি, ঠাকুর ?

ঠাকুর তাড়াতাড়ি রাজকন্যাকে ডেকে বললে—এখন উপায় কর।

রাজকন্যা বললেন—এই কোঁকড়া চুলগাছিকে সোজা করে দে

রাজকন্যা বললেন—শোন্ বুড়ী আজকের ফরমাশ—বলে' তাঁর মাথার কোঁকড়া চুলের গুছি থেকে এক গাছি চুল ছিঁড়ে নিয়ে বললেন,—এই কোঁকড়া চুলগাছিকে সোজা করে দে...

বুড়ী বললে—এই !...বলে সে রাজকন্যার কোঁকড়া চুলটিকে সোজা করতে বসলো ! হাত দিয়ে চেপে চেপে কোনমতেই সে চুল সোজা হয় না ! তখন সে তাড়াতাড়ি হাতুড়ি, কুড়ুল, দুরমুশ্ এনে হাজির করলে—তাতেও হয় না...বুড়ী হিমসিম্ খেয়ে গেল। নানা কসরতেও সেই একগাছি কোঁকড়া চুল আর সোজা হয় না। আস্ত বড় বড় পাহাড় এক নিমেষে কেটে মাটী কাটিয়ে চৌরুস্ করে ভাঙ্গে, কত রাজ্যপাট

করে বলছেন—"খবরদার গণ্ডী পার হস্‌নে! খবরদার গণ্ডী পার হস্‌নে! পার হলেই মরবি!"

দর্শকরা তখন গান শোনা ছেড়ে সবাই কর্তার কাণ্ড-কারখানা দেখছে—ব্যাপার কি! এদিকে সীতা যতই গণ্ডীর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন কর্তা ততই ধীরে-ধীরে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠতে লাগলেন। তারপর সীতা যেই গণ্ডী পেরিয়ে সন্ন্যাসীর ঝুলিতে ভিক্ষে দিয়েছে অমনি সন্ন্যাসী টান-মেরে জটাজুট খুলে ফেলে রাবণের মূর্ত্তি ধারণ কোরে সীতার চুলের মুঠি ধরেছে। সীতা তখন কেঁদে-কেঁদে বলছেন—"হা রাম! হা লক্ষ্মণ! আমায় রক্ষা কর!"

কর্ত্তা তখন রাগে ঠক্‌-ঠক্‌-কোরে কাঁপতে-কাঁপতে এগিয়ে এসে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে

কর্তা নিজেই সীতাকে হিড় হিড় কোরে টানতে টানতে সাজ ঘরের দিকে নিয়ে চললেন

বলছেন—"রক্ষে কর! কে তোকে রক্ষে করে? তখন রাম, হরিণ চাসনে—হরিণ

চাস্‌নে, সে কথা শোনা হল না! এখন রাবণের বাড়ি দাসীবৃত্তি কোরে মর গে যা!” বোলেই ঠাস করে তার গালে এক চড়! ছেলেমানুষ একটি ছেলে সীতা সেজেছিল, কর্ত্তার হাতে সেই প্রকাণ্ড চড়-খেয়ে ভ্যাঁ কোরে কেঁদে ফেল্লে।

কর্ত্তা বল্লেন—“এখন কাঁদলে কি হবে! তখন যে বলেছিলুম গণ্ডী পেরুসনি!” বলেই কর্ত্তা আর একটা চড় তুল্লেন। সীতা সেই চড়ের ওজন দেখেই রাবণের হাত থেকে চুলের মুঠি ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে যাবে, কর্ত্তা ফস্ কোরে তার হাত ধরে বল্লেন —“পালাবি কোথা! দাঁড়া!” বলেই বল্লেন—“রাবণ! লে যাও বেটীকে ধরে!”

কিন্তু রাবণ তখন কোথায়? সে গতিক দেখে সীতাকে ফেলে আসর ছেড়ে সাজ-ঘরে সেঁধিয়েছে। কর্ত্তা নিজেই সীতাকে হিড়-হিড় কোরে টানতে-টানতে সাজ-ঘরের দিকে নিয়ে চল্লেন।

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মৃত্যু বরণ

মৃত্যু, তোমায় ভয় করি না
ভয় করি না আমি।
প্রিয় আমার, বন্ধু গো মোর
তোমায় আমি জানি।
মরণ, তোমার গলায় দেব
আমার বরণ মালা,
তোমার পায়ে লুটিয়ে দেব
হৃদয়-কুসুম ডালা।
ওগো, তোমায় হাসি মুখে
করব আমি জয়,

তাকাতে হঠাৎ দেখলুম, খালের জল থেকে ডাঙ্গায় উঠে একটা মিশ্‌মিশে কালো বস্তু জানোয়ার বেগে ছুটতে সুরু করলে! খানিক পরেই জানোয়ারটা পাহাড়ের কাছে এসে পড়ল,—সেটা কুকুরই বটে!

কুমার ব'লে উঠল, "নিশ্চয়ই আমার বাঘা!"—ব'লেই সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল, আমরাও তার পিছনে পিছনে চল্‌লুম!

কুমার চেঁচিয়ে ডাক দিলে, "বাঘা, বাঘা, বাঘা!"

কুকুর পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘেঁষে, অন্যদিকে চ'লে যাচ্ছিল, কিন্তু কুমারের ডাক শুনেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল! তারপরে খুব জোরে চীৎকার করতে করতে তীরের মতন বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল! হ্যাঁ, এযে বাঘা, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই!

বাঘা ছুটে এসে একেবারে কুমারের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল, কুমারও মহানন্দে তাকে নিজের কোলের ভিতরে টেনে নিলে!

আমি দেখলুম, বাঘার গলা থেকে একগাছা সোণার শিকলের আধখানা ঝুলছে! বাঘা নিশ্চয়ই শিকল ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছে!

বাঘা তারপর বিমল, রামহরি, কমল ও আমার কাছেও এসে ল্যাজ নেড়ে মনের আহ্লাদে ও আমাদের গা চেটে দিয়ে বা পায়ের কাছে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বুঝিয়ে দিলে যে, তার নূতন আর পুরাতন কোন বন্ধুকেই সে ভুলে যায়-নি। বাঘাকে ফিরে পেয়ে আমাদেরও কম আনন্দ হ'ল না! এই নূতন জগতে এসে সমস্তই আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে, কুকুর ব'লে বাঘাকে আর ছোট মনে হচ্ছে না! উড়োজাহাজে যে বানরদের দেখেছিলুম, তারাও যদি কোন পালিয়ে আসতে পারে, তাহ'লে তাদেরও আমি আদর ক'রে আশ্রয় দিতে নারাজ তারাও যে পৃথিবীর জীব, আমাদের প্রাণের সঙ্গে তাদেরও যে যোগ আছে!

বাইশ

বামনদের আস্তানায়

ভরে গেছে। আকাশের দুই চাঁদ যেন পরস্পরকে দেখে হাসতে সুরু

ক'রে দিয়েছে—যদিও তাদের হাসির ক্ষীণ আলো চারিদিককার আবছায়া করতে পারছে না।

আমরা একে একে পাহাড় থেকে মরুভূমিতে এসে নামলুম, তারপর সকলে মিলে যাত্রা করলুম বামনদের সহরের দিকে। সব আগে রইল বন্দুক নিয়ে বিমল ও কুমার, তারপর আমি, কমল ও রামহরি, তারপর আর সকলে। বিমল ও কুমারের পকেটে দুখানা বড় ছোরা ছিল, আমি আর কমল সে দুখানা চেয়ে নিলুম। অন্য সকলে বন থেকে গাছের এক-একটা মোটা ডাল ভেঙে নিলে—দরকার হ'লে তা দিয়ে বামন বধ করা কিছুমাত্র শক্ত হবে না। মানুষের হাতের অমন লম্বা ও মোটা ডালগুলোর কাছে বামনদের ক্ষুদে তরোয়ালগুলো একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে!

এক এক লাফে আমরা খাল পার হয়ে গেলুম। আমাদের দেখাদেখি বাঘাও লাফিয়ে খাল পার হ'ল—মঙ্গলে এসে তারও লাফ মারবার ক্ষমতা আশ্চয্য-রকম বেড়ে গেছে!...

বার বার লাফ মেরে অগ্রসর হ'লে পাছে হাঁপিয়ে পড়ি, সেই ভয়ে আমরা পায়ে হেঁটেই এগুতে লাগলুম। আর বেশী তাড়া করবারই বা দরকার কি, আমাদের সামনে এখন সারারাত্রিটাই প'ড়ে রয়েছে!

ঘণ্টা আড়াই পরে দূর থেকে বামনদের সহর আবছায়ার মত দেখা গেল। সহরটা দেখেই বাঘা রেগে গরর্ গরর্ ক'রে উঠল, কিন্তু কুমার তখনি তার মাথায় এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললে, "খবর্দ্দার, বাঘা, চুপ ক'রে থাক্!" বাঘা একেবারে চুপ হয়ে গেল, তারপর একবারও সে টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করলে না! আশ্চর্য্য কুকুর!

সহরের ভিতরে মাঝে মাঝে আলো দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু জনপ্রাণীর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না! বামনরা বোধ হয় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে!

আচম্বিতে বিমল ও কুমার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল!

আমি বললুম, "ব্যাপার কি?"

বিমল সামনের দিকে আঙুল তুলে দেখালে।

তাইতো, প্রকাণ্ড একটা ছায়ার মত, অনেকখানি জায়গা জুড়ে কি ওটা প'ড়ে রয়েছে ?

বিমল চুপি চুপি বললে, "বিনয়বাবু, উড়ো-জাহাজ !"

কুমার বল্‌লে, "বোধ হয় এইখানাই আমাদের পৃথিবীতে গিয়েছিল !"

আমি বল্‌লুম, "হুঁ, এর আকার দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে ! এখানা নিশ্চয় পৃথিবী আক্রমণ করতে যাবে ব'লে বিশেষ ভাবে তৈরী হয়েছিল, কারণ মঙ্গলের আর যত উড়োজাহাজ দেখেছি, সবই ছোট ছোট। কিন্তু এখানা এমন খোলা জায়গায় প'ড়ে কেন ?"

বিমল বললে, "বোধ হয় সহরের ভিতরে এত বড় উড়ো-জাহাজ রাখবার জায়গা নেই !"

বিমলের অনুমান সত্য ব'লেই মনে হ'ল !.........আমি নীরবে ভাবতে লাগলুম।

বিমল বললে, "এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য ?"

ধাঁ ক'রে আমার মাথায় এক ফন্দি জুটে গেল !... ... এর আগে এমন ফন্দি আমার মাথায় ঢোকে নি কেন, পরে তাই ভেবে আমি নিজের বুদ্ধিকে যথেষ্ট ধিক্কার দিয়েছি, কারণ তাহ'লে আজ আমাদের মঙ্গল-গ্রহে হয়তো আসতেই হ'ত না ! আমি বিমলকে বল্‌লুম, "দেখ, এই উড়োজাহাজখানা আমরা যদি আক্রমণ করি, তাহ'লে কি হয় ?"

বিমল বললে, "এ প্রস্তাব মন্দ নয়। উড়োজাহাজের ভিতরে হয়তো অনেক রসদ আছে। তাতে আমাদের পেটের ভাবনা দূর হ'তে পারে।"

আমি বললুম, "কিন্তু খুব চুপি চুপি কাজ সারতে হবে। কারণ সহরের লোক জানতে পারলে আমাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা শক্ত হয়ে উঠবে।"

বিমল বললে, "দাঁড়ান, আগে আমি দেখে আসি।"

বিমল হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। আমরা স্তব্ধ হ'য়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম।. ...

খানিকপরে বিমল ফিরে এসে বললে, আক্রমণের কোনই বাধা নেই। উড়ো-

জাহাজের প্রধান দরজাটা খোলা রয়েছে। সিঁড়ির উপরে ব'সে একজন বামন সেপাই ঢুলচে, আমি এখনি এমন ভাবে চেপে ধরব, যাতে সে কোন গোলমাল করতে পারবে না! আপনারা চুপি চুপি আমার পিছনে আসুন!"

বিমল আবার হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হ'ল, আমরা সকলেও ঠিক সেই ভাবেই তার পিছু নিলুম।

খানিক দূর অগ্রসর হয়েই দেখলুম, উড়োজাহাজের ভিতর থেকে খোলা দরজা দিয়ে একটা আলোর রেখা বাইরে এসে পড়েছে। দরজার তলাতেই নীচে নামবার জন্যে সিঁড়ি ঠিক তার উপর-ধাপে পা ঝুলিয়ে এবং উড়োজাহাজের গায়ে ঠেসান দিয়ে ব'সে আছে এক বামন-সেপাই!

আমাদের অপেক্ষা করতে ব'লে বিমল বুকে হেঁটে আরো খানিক এগিয়ে গেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সে মারলে এক লাফ এবং সিঁড়ি টপকে পড়ল গিয়ে একেবারে সেই বামন-সেপাইয়ের বুকের উপরে! তারপর কি হ'ল তা জানি না, কিন্তু বামনটার মুখ থেকে কোন রকম আর্ত্তনাদই আমাদের কাণে এসে বাজল না। অল্পক্ষণ পরেই বিমল উঠে দাঁড়াল এবং হাতছানি দিয়ে আমাদের অগ্রসর হ'তে বললে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

তিত্তির

আমাকে যদি কোনও ছেলে-মেয়ে জিজ্ঞাসা করে যে সে কোন্ পাখী পুষবে, আমি তাকে পরামর্শ দেব তিত্তির বা তিতির পাখী পালন করতে। কারণ পাখী পোষার সঙ্গে যে একটা প্রচ্ছন্ন নিষ্ঠুরতা আছে, পালিত তিতির বোধ হয় স্বাধীনতা হারানোর সে নিষ্ঠুরতা টুকু ভোগ করে না। তাকে তো আর সর্ব্বদা বন্দীভাবে থাকতে হয় না। টিয়া, চন্দনা প্রভৃতির পায়ে শিকল বাঁধতে, হয়, শালিখ বা

কোকিলকে খাঁচায় বন্দ করতে হয় আবার শ্যামা, দোয়ল, ভীমরাজ প্রভৃতিকে খাঁচায় পুরে খাঁচাটির উপর ওভারকোট মোড়ার মত কাপড় চাপা দিতে হয়। মুনিয়া বেচারা ছোট পাখা, তাকে বন্ধও রাখতে হয়, আব সব্বদা তার খাঁচায় কামনা-দানা না থাকলে সে পঞ্চত্ব পায়। বুলবুলির দেহ বেষ্টন কবে "ফেট্টি" বাঁধা যে কতদূব নৃশংস তাহা বুঝে উঠা মোটেই শক্ত না।

তিতিরকে একটু মিষ্ট ব্যবহাব করলেই সে পোষ মানে। তখন তাকে খাঁচা হাতে করে ডাকলে সে কুকুরের মত পেছু পেছু যায় আর মাঝে মাঝে মাথা তুলে বুক ফুলিয়ে ডাকে—পাটিলা পাটিলা পাটিলা। সকাল বেলা দেখবে, হেদো, গোলদিঘি, ময়দানে বা সড়কে বাম সিং দুর্ব্বল সিং এখন-যাই, তখন-যাই পাঁড়ে দ্বাববানরা একটি পিঞ্জরা হাতে চলছে– পিছনে চলছে পোষা তিতিব। বাঙালীর
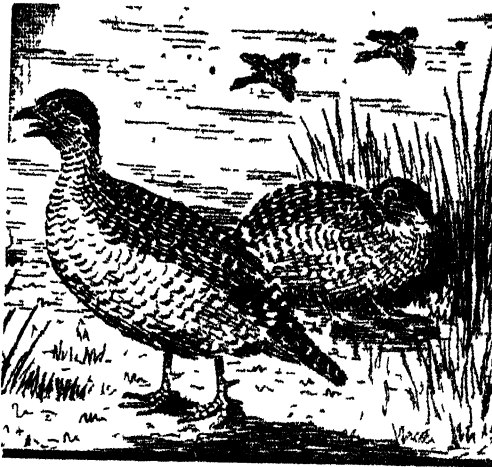
তিত্তির

ছেলে-মেয়েবা অনায়াসে এক একটি তিতির পুষিতে পারে। ইহাতে তাদের পক্ষী-প্রীতি বাড়বে, অথচ বন্দী পাখীব কাতবতা দেখে দুঃখিত হতে হবে না।

কলিকাতার হগ্‌সাহেবের বাজারে দশ আনা বারো আনায় তিতির পাওয়া যায়। প্রথম দুইচার দিন তাকে খাঁচায় রেখে বাজ্‌রা-দানা খাওয়াতে হয়। আর পিঁজরার বাহির হতে ময়দা, রুটীর টুকরা প্রভৃতি মুখের কাছে ধরে ভোজন করাতে হয়। ক্রমশঃ সে পোষ মানে। প্রথমে বন্ধ ঘরে ছেড়ে, ক্রমে বাহিরে ছাড়া বুদ্ধিমানের কাজ। আর ডানার বড় পালক দশটা করে দুইদিকে অর্দ্ধেক

কাটলে—সে উড়ে পালাবার ক্ষমতা হারায়। আমার একটা পোষা তিতিরের এত স্পর্দ্ধা ও সাহস বেড়েছিল যে সে আমার থালা হতে গম্ভীর ভাবে ভাত কেড়ে খেত।

তোমরা যদি একটু লক্ষ্য করে দেখ, তো বুঝবে যে ময়ূর, মোরগ, প্রভৃতি পক্ষীর সঙ্গে তিতিরের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ইহাদের সকলেরই পালকের বেশ বাহার আছে, কিন্তু ইহাদের পায়ে পালক নাই। এই শ্রেণীর সকল বিহঙ্গমই খুটে খায়—তাই তাদের ঠোঁট তিন কোণা। খাবার সময় এরা নখের দ্বারা মাটি বা জঙ্গল চেঁচে লয় আর শস্যের সঙ্গে সঙ্গে ছোট-ছোট পোকা-মাকড় গলাধঃকরণ করে। কচি গাছের পাতাও ইহাদের প্রিয়। যত পাখী শক্ত দানা খায় তারা দেখবে মাঝে-মাঝে ছোট ছোট কাঁকড় উদরস্থ করে। সে কাজটা যে রসনার পরিতৃপ্তির জন্য করে তাহা নয়। আমরা গমকে জাঁতায় পিসে ময়দা প্রস্তুত করলে গমকে হজম করতে পারি। পাখীদের মধ্যে তো আর তেমন "ঘরট্ট পেষক" জাতি নাই। তাই ভগবান তাদের উদরের মধ্যে এক রকম জাঁতা পেষার ব্যবস্থা করেছেন। ইহাদের পাকস্থলীতে এক স্থলে খুব শক্ত একটা মাংসর পিণ্ড আছে। ইংরাজীতে ইহাকে বলে গ্রিজার্ড। যত শক্ত খাবার তাদের এই গ্রিজার্ডের ভিতর দিয়া যায়! দানা-খোর পাখিরা কাঁকড় খায়। কাঁকড় আর দানা গ্রিজার্ডের মধ্যে পড়লে সেই দানা পেষন হয়—জাতার দুইখানা পাথরের মাঝে যেমন গম পিষে ময়দা হয়, ছোলা পিসে ছাতু হয়। সেই গুঁড়া খাবার পাকস্থলীতে সহজে হজম হয়।

তোমরা তো পাখা পোষ তার পালকের সৌন্দর্য্যের জন্য আর তার কণ্ঠ-স্বরের জন্য। অবশ্য কোকিল পাপিয়া শ্যামা, দোয়েলের প্রাণ-মাতানো স্বরের সঙ্গে তিতিরের কণ্ঠস্বর তুলনা করতে যাওয়া পাগলামী। তবে তিতির কর্কশ নয়, আর ভোরের বেলা তিতিরের শব্দ শুনলে মনে হয় যেন বাঙালা দেশের বাইরে আছি।

সৌন্দর্য্য হিসাবে তিতিরের দেহের বর্ণবিন্যাসে বেশ শোভা আছে। অঙ্গ-সৌষ্টবও উত্তম—বেশ বেঁটে-খেটে বলিষ্ঠ চেহারা, মাথাটি ছোট—দেহের তুলনায় খুব ছোট,

লেজ ক্ষুদ্র। তিতিবেব গায়েব রঙে বেশ বেখা আছে। ইহাদের গৈরিক খয়ের বঙেব জমি—তাই বাঙালার কোনও কোনও স্থলে তিতিরকে বলে খয়রা।

এ বর্ণনা সাধাবণ তিত্তিরেব। এই সাধাবন তিত্তিব ব্যতীত আরও অনেক জাতীয় তিত্তিব আছে—তাদের দুই একটিব রূপেব কথা বলি। ইহাদেব এক জাতীব নাম—চকোব। আলিপুব চিড়িযাখানায় পাখীব ঘবে কিম্বা হগ্ সাহেবের বাজারে পাখী বিক্রেতাদের দোকানে মাঝে মাঝে চকোর দেখতে যাবে। চকোর-তিত্তির সাধারণ খয়রা তিত্তির অপেক্ষা অনেক বড়। এক একটি প্রায় পনেরো ইঞ্চি লম্বা। আকৃতি একই—কেবল মাথা চওড়া বুক ডানা অপেক্ষা পুচ্ছ ছোট। চকোরেব চোখেব চাবিদিকে কালো দাগেব গণ্ডী আব বুকে কালো কালো বেখা এক পক্ষ হতে অপব পক্ষ পর্যান্ত। এই বেখা গুলা চকোবকে অত সুন্দব কবেছে।
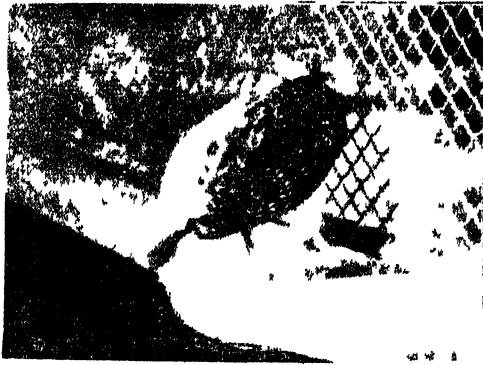
তিতিব

আমি শিমলা পাহাড়েব আবও উপবে এক বকম তিত্তির দেখেছি তাদেব বলে—মোনাল। এবা চকোরেব মত বড় কিন্তু এদের গায়ের বং চক্‌চকে পালিস কবা সবুজ আব গলাব বঙ ময়ূরকণ্ঠী, লাল ও নীলে মিশানো। সূর্য্যেব আলোয এদেব বড় সুন্দব চক্‌চকে দেখায। আলিপুবে মোনাল আছে। পাহাড়েব উপব টকটকে লাল বরাস ফুলেব জঙ্গলে সবুজ শৈলেব গায়ে পাঁচ ছয়টি শিশু লয় মোনাল দম্পত্তি বোদ পোহাচ্ছে—কি মনোবম শোভা। জগদীশ্বব যে আমাদেব ইঙ্গিত দেন যে তিনি পৃথিবীকে এত সুন্দব কবে সৃষ্টি করেছেন, শব্দে এত সৌন্দর্য্য দিয়াছেন আমাদেব শিক্ষা দিবাব জন্য যে আমরা যেন কুৎসিৎ

কাজের দ্বারা কুৎসিৎ কথা বা শব্দের দ্বারা তাঁর অমন সৌন্দর্য্যকে নষ্ট না করি।

আমার কাছে আর এক রকম তিতির আছে তাকে কালো তিতির বলে। ইহার সৌন্দর্য্যও অনিবর্বচনীয়। ইহা আমাদের খয়রা তিতিরের মত। আকৃতিও তার অপেক্ষা একটু বড়। কিন্তু বর্ণ অপরূপ। সকল তিতিরের পুরুষের পায়ে পিছনে একটু উপরে একটা নগ থাকে। স্ত্রী তিতিব তাহাতে বঞ্চিত। চকোরে ও খয়রা তিতিরে ইহা ব্যতীত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। কিন্তু কালো তিতিরে স্ত্রী পুরুষে বিশেষ প্রভেদ দেখা যায়। কালো তিতির পুরুষের গায়ের রঙের জমিটা কালো। কিন্তু তাহার চোখের দুইদিকে সাদার ছোপ। বুকে পেটে ছোট গোল সাদা দাগ। আর পিঠের উপর হতে লেজ অবধি অতি চমৎকার সাদা লম্বা লম্বা রেখা। গলার চারিদিকে গোল একটি খয়বা রঙের চক্র, টিয়া পাখীর গলায় যেমন কণ্ঠী থাকে। আর পুচ্ছের দিকেও খয়রা রঙের ছোপ। পক্ষগুলার রঙ খয়রা তার উপর প্রত্যেক পালকের শেষগুলা তেঁতুল বীচি রঙের। সমস্ত দেহটার এত সুললিত রঙের বাহার যে আমি নয়নিতাল পাহাড়ের বাহিরে একটা পাহাড়ের জঙ্গলে এক পাল এই পাখী দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেছিলাম। বলাবাহুল্য আমার হাততালির শব্দে তখনই তারা জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছিল। পাহাড়ে কালো তিতির অনেক দেখা যায় --তবে দার্জ্জিলিংএ দেখেছি বলে মনে হয় না। আমাব নিকটে এমন একটি খয়রা কালো তিতির পুরুষ ও খয়রা তিতির স্ত্রী আছে। এর বেশ বন্ধুভাবে বাস করছে।

বলেছি খয়রা তিতিবের ডাক—পটিলা পটিলা পটিলা—এই রকম একটা শব্দ। কেহ বলে ইহারা বলে—ঘী—চক্ চক্ বা কি চক্-চক্। কালো তিতিরের ডাক ও বিচিত্র—চুচক—চুক্—চুক্চক। পাহাড়ী মুসলমানেরা বলে ইহারা বলে—সোভান্ তেরি কুদরত—হিন্দুরা বলে—পাখির ডাক—সীতারাম দশরথ। আর এই দুই দল ভক্তকে পরিহাস করিয়া এক দল বলে যে কালো তিতির বলে—"রসুন, পেঁয়াজ আদ্রক।" আমরা বলি পাপিয়া পাখি বলে—"চোখ গেল।" সাহেবদের

মতে সে বলে—"ব্রেইন ফিভার।" নানা মুনির নানামত পাওয়া যায় পাখীর ডাকের ব্যখ্যাতেও।

তিতিরেরা বড় লড়াই প্রিয়। হিন্দুস্থানী দ্বারবানেরা প্রায়ই সকালে একটা-বাগানের মধ্যে তিতিরের লড়াই দেয়। দুইটা তিতির দুইজন খাঁচায় রেখে তাদের গায়ে ফুঁ দেয়। তারপর পিঁজরার দরজা খুলে দিলেই দুই জনে খুব লড়াই করে। লড়াইয়ের অস্ত্র নখ। খালি পরস্পর লাথালাথি করে—তা তাহাতে তীব্র নখ লেগে এমন একটা তিতির রক্তাক্ত কলেবর হয়: এই শ্রেণীর পক্ষীকে তাই সংস্কৃতে নখাযুধ বলে; মোরগের লড়াইও এই রকম। শুনেছি লড়াই করাইবার জন্য লোকে মোরগের পায়ে ছুরি বেঁধে দেয়। সে যখন তার শত্রুকে লাথি মারে তখন তরাপায়ে বাঁধা ছুরি শত্রুর বুকের মধ্যে বিঁধে যায়। মানুষের নিষ্ঠুরতার অন্ত নাই।

তিতির

তিতির উড়তে পারে মন্দ নয় তবে সে পছন্দ করে দৌড়িতে। মাঠে চুরি করে গম ধান ছোলা মটর অড়হর কলাই খায় আর চাষা ভোষাকে দেখলেই ছুটে ঝোঁপের আশ্রয় লয়। সেই জন্য ইহাদের বীরভূম বাঁকুড়া জেলা ছাড়া বোধ হয় বাঙ্গালা দেশের অন্যত্র দেখা যায় না যেহেতু বর্ষার সময় আমাদের দেশ জল প্লাবিত হয়! আফিম-খোর মানুষের মত ইহারা জলে নাহিতে চায় না—ইহারা ধূলায় স্নান করে। খয়রা তিতির উচু পাহাড়ে থাকে না।

মৌচাকের পাঠকপাঠিকাদের কেবল সব জীবজন্তু লক্ষ্য করে শিক্ষা পাবার

জন্য এত কথা বলিলাম। সব কথা এ প্রবন্ধে বলা যায় না। আর একটা কথা প্রবন্ধে বলব। যত পক্ষী আছে তারা সকলেই ডিম পাড়ে। বাদুর পাড়ে না তাই সে পাখী নয়। ডিম ফুটিবার পর যখন ছানা হয় তখন সেই শিশুকে কোনও কোনও পাখী মুখে করে খাওয়াইয়া দেয়। বৈশাখ মাসে প্রায় সব পাখীর বাচ্ছা হয়। তোমরা লক্ষ্য করে দেখ কোন কোন পাখী শিশুর মুখ নিজের মুখের ভিতর নিয়ে তাকে খাওয়ায় আর কোন কোন্ পাখী শাবকদের চঞ্চুর মধ্যে নিজের ঠোঁট ভরে তাকে খাওয়ায়। পাখাব গলায় খাবার থাকে সে উদ্গার করে শিশু পালন করে। তোমরা এ বিষয়ে নিজেরা দেখিও মোরগ, ময়ূর, তিতির প্রভৃতি যে শ্রেণীর পাখী তাদের শাবকদের খাওয়াতে হয় না। ডিমের ভিতর হতে বের হয়েই এদের শাবক খুঁটে খেতে পারে। তারা জননীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় আর চিল্ বাজ কিক্ড়ে প্রভৃতি দেখলে তারা ছুটে মাতার পক্ষের নিম্নে আশ্রয় লয়। ডানা ঢাকা দিয়ে তাদের মা তাদের রক্ষা করে। জগদীশ্বরের কেমন সৃষ্টি বৈচিত্র! এই সব দেখলে আমরা বুঝি কত যত্নে ভগবান তাঁর সৃষ্টি পালন করেন। আমরা মানুষ, আমাদের তিনি জ্ঞান দিয়েছেন। আমরা যদি গ্রীষ্মের ছুটিতে পাখীর ডিম ভাঙ্গি বা বাচ্ছা বধ করি তাহা হলে আমাদের নিশ্চয়ই পাপ হবে আর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ ; বি এল,

ডাকাতী গল্প

আমেরিকায় ছিল মস্ত দুই ডাকাত—প্যালিষ্টার আর রল্‌ফ্। এক গরীব চাষাকে খুন করে তারা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল। তাদের ধরায় পুলিশের বিশেষ কিছু যে বাহাদুরী ছিল তা নয়—এমনি ঘটনা ক্রমে সেটা হয়ে গেছল। তাদের শাস্তির হুকুম হল "ইলেক্‌টিক্ চেয়ারে" বস্‌বার। তোমরা যেন মনে

করো না এটা একটা সম্মান। এ হচ্চে এক রকম প্রাণ দণ্ড। সেদেশে তো আর ফাঁসি দেওয়ার নিয়ম নেই ফ্রান্সের মত 'গিলোটিন্' দিয়ে মাথা কেটে ফেলবারও চলন নেই - সেখানে অপরাধীকে একটা ব্যাটারির যোগ করে দেওয়া হয়। অপরাধীর শরীরের মধ্যে দিয়ে চিড়িক্ করে একটা চেয়ারে বসিয়ে চেয়ারটার সঙ্গে বিদ্যুতের প্রবাহ ছুটে যায় আর এক সেকেণ্ডের মধ্যেই সব শেষ। এক রকম বেশ ভালই—কষ্ট দিয়ে মারা হয় না।

প্যালিস্টার আর রল্‌ফ্‌কে পুলিশ যেন ভাল করেই জান্‌ত, তাই জেলে এদের জন্যে খুব কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হল পরের দিন তাদের সেই চেয়ারে বসাবার কথা।

এরা দেখলে, ভারী বিপদ! কাউকে ঘুষ দিয়ে পালাবার উপায় নেই; তখন তাদের মাথায় অন্য একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

রাত তখন দশটা। চারিদিকে একটা স্তব্ধতা থম্‌থম্ করছে কেবল মাঝে মাঝে বাইরে পাহারাওলার পায়ের শব্দ। প্যালিস্টার এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন তার বড় অসুখ—আর বুঝি বাঁচে না! অনেক রাতে পাহারাওলাকে ডেকে সে বল্লে, ভাই পাহারাওলা- এক্ গ্লাস গরম দুধ দিতে হবে আমাকে—এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি যে উঠতে পর্য্যন্ত পারছিনে।

গার্ড্ বেচারী ভাল মানুষ; মৃত্যুপথের পথিকের একটা কথা শুনবে না? এই ভেবে সে দুধ নিয়ে এসে দুয়োর খুলে প্যালিষ্টারের ঘরে ঢুকল। যেই ঢোকা আর কোথায় যাবে! দেখতে দেখতে গার্ডের "পতন ও মূর্চ্ছা!" প্যালিষ্ট্যারের গায়ে অসাধারণ জোর—গার্ডের ওপর লাফিয়ে তার গলা টিপে ধরে বেঁধে ফেলতে তার খুবই কম সময় লাগল। তারপর তার চাবির থোলোটা কেড়ে নিয়ে আগে সে তার সঙ্গী রল্‌ফ্‌কে মুক্ত করলে; কাছেই আর একটা গার্ড্ ছিল—তারও সেই প্রথম গার্ডের দশা হল।

এখন জেল থেকে সে বেরুনো যায় কি করে। সেই এক্ ভাবনা—গেটে ২০ জন পাহারাওলা সঙ্গীন্ হাতে দাঁড়িয়ে। তখন তারা অন্য এক ফন্দি করলে;

এক মজার ডাকাতী কায়দায় যা শুধু ডাকাতরাই জানে—তারা জেলের ছাদে উঠে পড়ল। তারপর সেখান থেকে মরিয়া হয়ে বাইরের দিকে ২০ ফীট নীচে এক্ লাফ! এম্‌নি করে জেলের বাইরে এসে তারা মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লে।

এ জেলটা সিন্‌সিন্ নামে একটা জায়গায় ছিল। এখান থেকে তারা সোজা নিউ ইয়র্কে চম্পট দিলে। সেখানে সুলিভান্ নামে একটা লোকের বাড়ী গিয়ে তারা উঠল। সুলিভান্ প্যালিস্টারকে খুব ভয় করে চলত—কারণ সে একবার এক্ বুড়িকে খুন করেছিল আর এ খবরটা কেবল প্যালিস্টারেরই জানা ছিল। এখানে এসেই রল্‌ফ্ ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে একেবারে ব্রেজিলে পালিয়ে গেল—প্যালিস্টার সাহস করে সুলিভানের বাড়ীতেই কিছুদিনের জন্যে রইল।

এদিকে আমেরিকার চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গেছে—বড় বড় পুরস্কার ঘোষণা করা হল এদের ধরে দেবার জন্যে—ডিটেকটিভ্‌রা তোলপাড় সুরু করে দিলে। প্যালিস্টার তখন ইউনাইটেড্ স্টেটসের সবচেয়ে বড় সহরে পুলিশের প্রধান আড্ডার সাম্‌নে থেকে মজা দেখতে লাগল।

একবার কিন্তু সে ধরা পড়তে পড়তে খুব বেঁচে গেল। সন্দেহ করে পুলিশ হঠাৎ একদিন এসে সুলিভানের বাড়ী খানাতল্লাসী সুরু করে দিলে। প্যালিস্টারও তেম্‌নি চালাক—পালাবার উপায় নেই দেখে সে বাড়ীতেই রইল। পুলিশ সব ঘর খুঁজে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে হাজির। সেখানে কতকগুলো মদের বড় বড় পিঁপে রাখা ছিল। তারা সেগুলো খুলে দেখে কোথাও প্যালিস্টারকে না পেয়ে একে একে সে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল—মুখ চূণ করে! তাদের পায়ের শব্দ মিলোতে না মিলোতেই সেই পিঁপেগুলোর একটা থেকে ভিজে বেড়ালের মত অবস্থায় বেরিয়ে এল—কে বুঝতে পারছ তো? প্যালিস্টার! পুলিশরা যখন তাকে খুঁজছিল তখন সে এমন চুপটি করে পিঁপের মদের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে লুকিয়েছিল যে পুলিশরা তাকে দেখতেই পায় নি। এর পর সে ব্যাপার সুবিধার নয় দেখে মেক্সিকোয় চম্পট দিলে। তারপর আর তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আর এক ওস্তাদ ডাকাতের কথা শোন। সে থাকাত আয়ারল্যাণ্ডে। নাম [...]ঞ্চিহান। আমরা তার নাম ছোট করে নিয়ে লিঞ্চি বলে ডাকব। একটি মেয়েকে [...]ন করে ধরা পড়ায় তার ২০ বছরের জেল হয়। তাকেও বেশ কড়া পাহারায় [...]খা হয়েছিল।

জেলে যে ঘরে সে থাকত তাতে সতর্কতার জন্যে এক রকম মজার তালা ব্যবহার করা হত। দুয়োর ঠিক মত বন্ধ হলে সে তালাটার মধ্যে থেকে সাদা কাগজের চাকতি বেরিয়ে আসত, তাতে গার্ডরা তালা দেখেই বুঝতে পারত দুয়োরটা ঠিক বন্ধ হয়েছে কি না।

লিঞ্চি বেশ করে তালাটা দেখলে! তারপর কয়েকদিন ধরে কি ভাবতে লাগল। তার ভা—রি বুদ্ধি। একদিন সে জেলের লাইব্রেরী থেকে একটা বই চেয়ে আনিয়ে তা থেকে এক টুকরো সাদা কাগজ কেটে নিলে। সেদিনও রাতে গার্ডরা তালা বন্ধ করে অন্যদিনের মত সাদা চাকতিই দেখে নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু লিঞ্চি আগে থেকেই তালাটা খারাপ করে রেখেছিল আর সত্যিকার চাকতিটার ওপর নিজের চাকতিটা এমন কায়দা করে রেখে দিয়েছিল যাতে বোঝা যায় দুয়োর ঠিক বন্ধ হয়েছে। গার্ডরা এ সবের কিছু বুঝতে পারেনি।

তখন আর লিঞ্চিকে পায় কে! অনেক রাত্তিরে বারান্দায় বেরিয়ে ছাদে উঠে একটা নলের ভেতর দিয়ে ও খানকয়েক তক্তার সাহায্যে সে একেবারে জেলের বাইরে এসে দাঁড়াল তারপর জাহাজে করে আমেরিকায় চম্পট।

জর্জ ব্রিন্ ছিল ফ্রান্সের এক্ দাগী চোর। সে ২০ বার জেল থেকে পালিয়েছিল। একবার সে বেশ মজা করে পালায়— অসুস্থতার ভাব দেখিয়ে সে জেলের হস্‌পিটালে জায়গা পেলে। সেখানে একদিন জেল-ডাক্তারের পোষাক চুরি করে সেই পোষাকে গম্ভীরভাবে জেল থেকে বেরিয়ে গেল, কেউ সন্দেহও করলে না। ব্রিনের জ্বালায় প্যারিস্ অস্থির হয়ে উঠেছিল। শেষকালে কিন্তু জেলেই তার মৃত্যু হয়।

এক্ বন্ধুকে খুন করে লেড্ রাইভার অষ্ট্রেলিয়ার জেলে ছিল। বুদ্ধি আর ভালমানুষী দেখিয়ে সে দুদিনেই জেলের সকলকে বশ করে ফেল্‌লে। জেলারের

বাড়ীতে একবার একজন মজুরের দরকার—কয়েদীদের দিয়েই সে সব কাজ করানো হয় কিনা—তাই জেলার লেড্‌কেই সে কাজ দিলেন। লেড্ খুব খাটতে লাগল। জেলার ভাবলেন, যাক্ এর দেখছি খুব্ সুবুদ্ধি হয়েছে! কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি যে মানুষের মধ্যেও বিড়াল-তপস্বার অভাব নেই। একদিন জেলারের বাড়ীর গার্ড জেলারের স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আস্‌তে দেখে সাধারণতঃ যেমন করে থাকে তেম্‌নি লম্বা এক সেলাম করলে।

কিন্তু যখন জানা গেল যে লেড্‌কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আর জেলারের স্ত্রীর একটা পোষাক চুরি গেছে তখন সকলে লেডের চালাকি বুঝ্‌তে পারলে। গার্ড্ বেচারি কি লজ্জায় পড়ল ভেবে দেখ!

চার্লস্ ওয়েবষ্টারের ১৪ বছরের জেল হয়। জেলে এসেই পা ভেঙ্গে সে জেলের হস্‌পিটালে আশ্রয় নিলে। দোতলার যে ঘরে সে থাক্‌ত তার মেঝে ছিল কাঠের। চার্লস্ তার সঙ্গী দুজন কয়েদীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক্ করলে সেই কাঠের তক্তা কেটে পালাতে হবে। সুবিধামত তক্তাটা কেটে তারা বেশ করে বসিয়ে রেখে দিলে। তাদের রাতদিন পাহারার বন্দোবস্ত ছিল। পাহারাওলা একদিন ২০ মিনিটের জন্যে কোথায় গেছ্‌ল- ফিরে এসে দেখে কয়েদীরা নেই। তখন তার নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। দুয়োর তো বন্ধই রয়েছে—তারা কি তবে বাতাসে মিলিয়ে গেল নাকি! সে বাঁশি বাজাতেই অন্য গার্ডরা ছুটে এল। তারপর খুঁজে দেখা গেল টেব্‌লের নীচে একটা তক্তা আল্‌গা হয়ে রয়েছে। সেটা তাদেরই কীর্ত্তি! সেখান দিয়ে নীচের ঘরে নেমে জেলের বাইরে আসতে তাদের বেশী কষ্ট পেতে হয়নি। চার্লস্ ছদ্মবেশে সাজতে ওস্তাদ ছিল। তাকে ধরবার জন্যে অনেক চেষ্টা হল—কিন্তু সে ধরা পড়েনি! এ ঘটনার ২০ বছর পরে সে লণ্ডনে এক খবরের কাগজের দোকান খুলেছিল, আর সে দোকানটা ছিল একটা পুলিশ আফিসের ঠিক্ সাম্নে।

যাক—যদি তোমাদের ভাল লাগে, এর পরের বার আমাদের দেশের দুজন ডাকাতের কথা বলব। এদের নাম দুখুয়া আর সুখুয়া। কয়েক বছর ধরে

ছোটনাগপুর তোলপাড় করে তুলেছিল এরা—আমি তখন ছোটনাগপুরের হাজারিবাগ ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে একটা পাহাড় ও বনজঙ্গলে ভরা জায়গায় থাকতুম। সেই দিকেই এদের অড্ডা ছিল। শেষকালে এরা বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়ে ও ফাঁসি হয়। বন্দী ও আহত অবস্থায় আমি সুখুয়াকে দেখেছিলুম। এদের সাহস ও কৌশল রঘু ডাকাতের চেয়ে হয়তো কম নয়—গল্পের বইতেই তেমন আশ্চয্য ঘটনার কথা দেখা যায়।

শ্রীভবানীচরণ ভট্টাচার্য্য

সবজান্তা

কাঠের পা—অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে কোন কারণে পা নষ্ট হয়ে গেলে যারা কাঠের পা পরেন তাঁরা অনেক সময়ে সাধারণ লোকের মতই কাজ কর্ম্ম কোরতে পারেন। ইংলণ্ডে একজন দুই কাঠের পাওয়ালা মানুষ ১৩½ মিনিটে এক মাইল হাঁটতে পেরেছে এবং আর একজন এ ... কাঠের পাওয়ালা মানুষ ৫ ফিট ৭ ইঞ্চি লাফাতে পেরেছে।

পাখীর ডানা—সাধারণ মাছি উড়বার সময় এক সেকেণ্ডে প্রায় ৩৩০ বার ডানা নাড়ে ও মৌমাছি এক সেকেণ্ডে প্রায় ৬৬০ বার নাড়ে।

আশ্চর্য্য ছু—...লণ্ডের কোন ছুরির দোকান ১৫৮১ ফলা যুক্ত একটী কলম কাটা ছুরি তৈরী ক

কুকুরে সব চেয়ে পিত—বিলাতে কুকুরদের লোম কাটবার জন্যে, সিঁত্তি করবা... ...য়ে গা পরিষ্কার করে দেবার জন্যে ও নখ কেটে দেবার জন্যে ছোট ...ম বলব, এগেল ... -সেই সব দোকানে কুকুরের মালিকরা তাঁদের কুকুরের সব রকম হতে হয়। আলে ... ।। কুকুরের দাঁতও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়।

করেছেন, তাঁরি

...াফে হাতের লেখা—এখনকার নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হচ্ছে বিদ্যা সহ... ...ফে ফটো পাঠানো। এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কৃপায় যে টেলিগ্রাফ করে তাঁর হাতের লেখা অনায়াসে তারে পাঠান হয়। যে টেলিগ্রাফ পায় সে ঠিক সেই হাতের লেখাই পায়।

নেপোলিয়ান—নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বই পড়তে খুব ভালবাসতেন; এমন কি ওয়াটারলু যুদ্ধের সময় তাঁর সঙ্গে বই ভরা বড় বড় ছয়টী বাক্স ছিল। এক একটী বাক্সে প্রায় একশ খানা কোরে বই ছিল।

ভারতে প্রথম

[ভারতবর্ষে যে সব বিষয়ে বাঙ্গালী সর্ব্ব প্রথম উন্নতি লাভ করে তার একটা তালিকা আমরা তৈরী করেছি। এ তালিকা অবশ্য সম্পূর্ণ নয়—এর বেশী যদি কারো জানা থাকে তবে আমাদের লিখবেন আমরা তা ছাপবো]।

কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি বাঙ্গালী —শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম নোবেল প্রাইজ পান বাঙ্গালী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম 'লর্ড' উপাধী পান বাঙ্গালী—লর্ড সিংহ

প্রথম বেলুনে উঠেন বাঙ্গালী—রামবাবু

আই, সি, এস পরিক্ষা প্রথম পাশ করেন বাঙ্গালী—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আই, সি, এস পরিক্ষায় প্রথম হন বাঙ্গালী—স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম বারিস্টারী পাস করেন শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর

বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউনসিলের প্রথম সভ্য বাঙ্গালী সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

প্রথম বাঙ্গালী গভর্ণর লর্ড সিংহ

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙ্গালী র‍্যাংলার শ্রীআনন্দমোহন বসু

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গল্প প্রতিযোগিতায় ফল আগামী মাসে বেরুবে। আগামী মাসে মৌচাকে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন লিখিত একটি গল্প বেরুবে। এই গল্প তিনি নিজেই চিত্রিত করেছেন।

কলিকাতা—২৯, কালিদাস সিংহের লেন, ফিনিক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅতীন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক প্রকাশিত
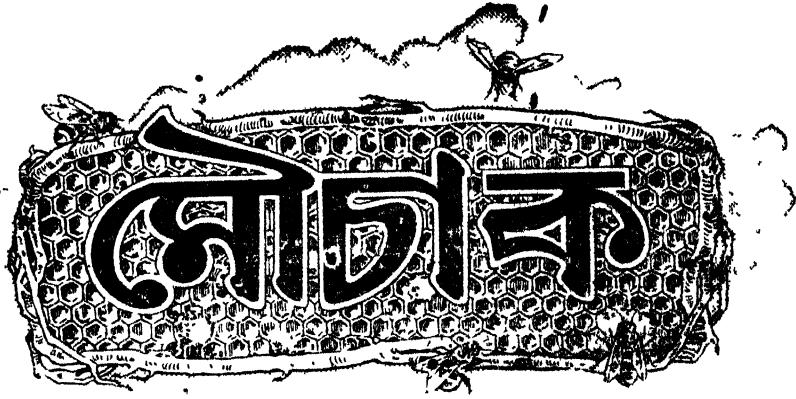
৭ম বর্ষ]   আসাঢ়, ১৩৩৭   [তৃতীয় সংখ্যা

ইয়োরোপের চিঠি

পারি

পারিতে সব চেয়ে আশ্চর্য্যকর কি জিনিষ দেখেছি যদি জিজ্ঞাসা কর, তা হলে আমি বলব, এফেল স্তম্ভ (Eiffel Tower)। এই লোহার স্তম্ভটি দেখে অবাক হতে হয়। আলেকজান্দার এফেল বলে একটি ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার এটি তৈরী করেছেন, তাঁরি নামে স্তম্ভের নাম। তাঁর তৈরী করবার কায়দা ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা সত্যিই অদ্ভুত। টাওয়ারটি ৯৮৪ ফিট উঁচু -- এত উঁচু কোন বাড়ী বা স্তম্ভ পৃথিবীতে নেই। এটি আমাদের কলকাতার মনুমেণ্টের প্রায় ছয়গুণ উচ্চ, দিল্লীর কুতব মিনারের চারিগুণ। ওজনে সাত হাজার টন। তৈরী করতে আড়াই বৎসর লেগেছিল। এতে বার হাজার নানা মাপের ও আকারের লোহার টুকরা, ২৫ লাখ পেরেক ইত্যাদি দিয়ে জোড়া, তাতে সত্তর লাখ ছেঁদা জোড়া হয়েছে। স্তম্ভটি এমন করে গড়া যে ঝড় জল বাতাসে তার কিছুই ক্ষতি হবে না।

টাওয়ারের ওপর উঠিবার জন্যে একটি লিফট্ আছে। টাওয়ারটি চার তালায়

ভাগ করা, পথে দু'বার লিফ্‌ট্‌ বদলি করে উঠতে হয়। বড় বাড়ীর লিফট্‌গুলির মত এ লিফট্‌ খাড়া সোজা উঠে না, এটি বেঁকে কাত হয়ে ওঠে। সব ওপরের তালা হচ্ছে ৯০২ ফিট। সেখানে ৮০০ মানুষ ধরে, সেখানে কয়েকটী ছোট দোকান পোষ্টাফিস আছে। এখান থেকে সুন্দর রৌদ্র উজ্জ্বল দিনে পারির বাট মাইল-দুর পর্য্যন্ত দেখা যায়। এর ওপরও আর একটি তালা আছে, সেখানে সাধারণ লোক যেতে পারে না, সেখানে Wireless বা তারহীন বৈদ্যুতিক বার্ত্তা-বহের এক প্রধান কেন্দ্র। এই টাওয়ারের মাথা থেকে যে গান গাওয়া হয়, বাজানা বাজান হয় বা সংবাদ বলা হয় তা ফ্রান্সের সব জায়গায় তারহীন বৈদ্যুতিক যন্ত্রে ত শোনা যায়, চেষ্টা করলে জগতের যে কোন জায়গা থেকে শোনা যেতে পারে।

এফেল স্তম্ভের সব ওপরে যখন উঠে চারিদিকে চাইলুম, মনে হল যেন মেঘের রাজ্যে এসেছি, তলায় যেন নদী একটি রূপার সুতার মত, সামনে পারির প্রাসাদের সারি, মনে হল যেন একটা উইএর ডিবি অথবা দেশলাইএর বাক্স সাজিয়ে কে একটা ছোট গ্রাম গড়েছে। তলার মানুষগুলি ছোট পোকার মত দেখায়। মাইলের পর মাইল সেই ৭।৮ তালা বড় বড় বড় বাড়ীর সারি, বড় বড় এ্যাভেনিউ, বড় বড় পোল, নোতর দাম, অপেরা, আর্ক দো ত্রোয়াম্প সব একটি ছোট সুন্দর ছবির মত দেখায়।

আমি যখন পারিতে ছিলুম, সে সময় পারিতে এক শিল্প প্রদর্শনী বা এক্‌জিবিসন হচ্ছিল। এফেল টাওয়ার দেখে সেটি দেখতে গেলুম। এই এক্‌জিবিসনে কত দেশ থেকে কত রকম সুন্দর জিনিষ এসেছিল, সে সব কথা লেখা সম্ভব হবে না। তবে এই প্রদর্শনীর সুন্দর বাড়ীগুলির কথা ও আলোর কথা তোমাদের লিখছি।

প্রত্যেক দেশের শিল্পজাত জিনিষ সব দেখাবার জন্যে আলাদা আলাদা বাড়ী তৈরী হয়েছিল। এই প্রদর্শনীটি কি করে সুন্দর বাড়ী, সুন্দর বাগান করা যেতে পারে এবং বাড়ীর ঘর সব কি রকম করে সুন্দর ভাবে সাজান যেতে পারে, তাই সব লোকদের দেখাবার জন্যে হয়েছিল। সুতরাং এর বাড়ীগুলি বড় সুন্দর করে গড়া। সব বাড়ীদের মধ্যে ইতালীর বাড়ীটি আমার বড় ভাল লেগেছিল। পাথরের ওপর সামনেটি সোনার পাতা মোড়া ইট দিয়ে কারুকার্য্যময়, দিনের বেলা

পোলে আলোর ঝরণা

সূর্য্যের আলোয় ঝিকমিক করে। রাতের বেলা নানা রঙীন আলোর ঝলমল করে। সব বাড়ী যে খুব সুন্দর করে গড়া তা নয়, কিন্তু সব বাড়ী এমন নূতন ভাবে তৈরী ও এমন একটি নূতন কায়দা আছে যে দেখলেই বেশ ভাল লাগে। দুঃখের বিষয় ভারতের কোন জিনিষ ও প্রদর্শনীর দেখান হয় নি, ভারতের কোন বাড়ী ছিল না।

প্রদর্শনীতে কতকগুলি খুব সুন্দর ছোট বাগান ছিল। কি করে বাড়ীর সামনে বাগান সাজাতে হয় তারি নমুনাস্বরূপ বাগান করা হয়েছিল; সে বাগানগুলির বর্ণনা করা অসম্ভব।

ফরাসীরা খুব সৌন্দর্য্যপ্রিয় সৌখীন জাতি। কলাবিদ্যায় তারা খুব দক্ষ। ঘর বাড়ী বাগান দোকান সাজাতে তাদের মত বোধ হয় কোন জাতি পারে না। আর পারির সাজসজ্জার ফ্যাসান সমস্ত ইয়োরোপ অনুকরণ করে। বিশেষতঃ মেয়েদের সাজসজ্জা পারিতে খুব সুন্দর হয়। এই প্রদর্শনী দেখে বুঝলুম ফরাসীরা কি সুন্দর ঘর বাড়ী বাগান সাজাতে পারে।

প্রদর্শনীর সব চেয়ে শোভা হচ্ছে রাত্রি বেলা। রাত্রিবেলা শিল্প-প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে মনে হল, এ যেন একটা সাত রংএর স্বপ্নপুরীতে এসেছি। প্রত্যেক বাড়ী নানা রংএর বৈদ্যুতিক আলোর সারিতে সাজান। খানিকটা লাল, খানিকটা হলদে খানিকটা বেগুনি—কত রংএর আলোর মালা চারিদিকে ঝল্‌মল্‌ ঝিক্‌মিক্‌ করছে। কালীপূজার রাতে যখন সব বাড়ী প্রদীপের সারি দিয়ে সাজান হয় তখন কি সুন্দর দেখায় তোমরা সবাই দেখছ। এই প্রদর্শনীর বাড়ী প্রদীপ দিয়ে সাজান নয় সব ইলেক্‌ট্রিক আলো দিয়ে সাজান, আলোর রং সাদা নয়, সব লাল নীল হলদে সবুজ ইত্যাদি নানা রংএর। এখানে সাতরংএর আলোর দেওয়ালি হচ্ছে।

সবচেয়ে সুন্দর দেখায় এফেল-স্তম্ভ। রাতে এই বৃহৎ উন্নত স্তম্ভটি নানা রংএর বৈদ্যুতিক আলোয় সাজান হয়। যখন এই ৬৫৭ হাত উঁচু স্তম্ভটি আলোয় জ্বলজ্বল করে, তখন মনে হয় না এটি কোন মানুষের তৈরী, মনে হয় কোন দেবতা বুঝি হাজার ইন্দ্র ধেনু জড় করে পাকিয়ে একটি আলোর স্তম্ভ গড়েছেন।

প্রদর্শনাতে কযেকটি সুন্দব ফোযারা আছে। সেটা কাঁচেব। এব থাকে থাকে লাল নীল হলদে নানা বংএব ইলেকট্রিক আলোর বাল্‌ব লাগান আছে। জল যখন ফোযাবা দিযে পড়ে তখন আলোর বং জলেব বংএ নানারকম হয, খানিকটা লাল জল কিছুদব পবে নীল হযে গেল, তাবপব সবুজ হল তাবপব বেগুনি হল তাবপব হলদে হযে তলায পড়ল যেন সোনা গলে পড়ছে।

(ন নদ । ’ । পাল

সেন নদাব ডুপাব জুড়ে এই প্রদর্শনা, মাঝখানে একটি সুন্দব পোল ডুই অংশকে যুক্ত কবেছে। এবং পোলটিও আলোয বড সুন্দব সাজান। যখন পোলের সং আলো জ্বালান হয তখন মনে হয যেন একটা গলান হারের ঝর্ণা সেন নদাব ঝবে পড়ছে, তাব মাঝে মাঝে কত লাল মণি কত প্রবাল মুক্তা। সেন-নদা কিন্তু আগুনেব উল্কাব মত জ্বলজ্বল কবছে। সন্ধ্যা রাতে প্রদর্শনীতে অ দেবতাকেও সৌন্দর্য্য দেখেছি তা বড়ই চমৎকাব। মনে হয না, মাটিব পাবিতে হয়, কোন রূপকথাব রাজ্যে কোন আলোব রাজকন্যাব পুরীতে এই দ্ভুত আলোব মালায় সাজান সুন্দব বাড়াগুলি দেখেছি। (ক্রমশ

শ্রীমনীন্দ্রলাল বেলায়

গল্পপ্রতিযোগিতা পুরস্কার

সরিষামর্দ্দন চক্রবর্ত্তী

সেবার ভারি দুর্ব্বৎসর। পৌষের হাড়ভাঙ্গা শীত। লোকের ঘরে নাই শস্য, পেটে নাই অন্ন, গায়ে নাই বস্ত্র। এম্নি দুর্দ্দিনে শিউলি ডাঙ্গার 'কিস্টো' তেলীর ঘানির বলদটা একদিন অসুখ নাই বিসুখ নাই হঠাৎ কোন্ অজানা দেশে ঘানি ঘুরাবার ডাক মাথায় করে সরে পড়ল। কিষ্টো একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে "যা ব্যাটা তুই গো-জন্ম থেকে উদ্ধার পেলি, আমিও এবার ভিটে মাটি বেচে কাশীবাসী হব।"

কিষ্টোর তিনকুলে কেউ ছিল না। সংসারে সে একা। যে দু'চার কলম লেখাপড়া সে জান্ত তারই বলে বাড়াতে সকালবেলা পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা ছোটখাটো পাঠশালা চালাত। একটা রাখাল ছিল, সে বলদটার সেবাযত্ন করত; তার ইচ্ছা হলে কোন দিন ঘানি ঘুরাত কোন দিন বা ঘুরাত না। সন্ধ্যা হলেই কিষ্টো রাজবাড়ীর জমানবিশ বাবুর বাসায় "মুখুজ্যা মহাশয় আছেন?" বলে ডাক দিয়ে হাজির হত আর রাত এগারটা অবধি মুখুজ্যে মশাইয়ের সঙ্গে দাবা খেল্ত। সে লেখাপড়া জান্ত, হাস্যরসিক ছিল এবং এককালে রাজবাড়ীতে সরকারের কাজও করত; সে জন্যে বাড়ীতে তার ঘানি ঘুরলেও ভদ্রলোকের বৈঠকে কষ্টো চিরকাল আসন পেয়ে এসেছে। ছেলে পড়িয়ে, ঘানি ঘুরিয়ে, দাবা খেলে দিনগুলো নির্ব্বিবাদে কেটে যাচ্ছিল কিন্তু বলদটা মরে গিয়ে কিষ্টোর গম্ভীর উপস্থিত হল। সে ঘরবাড়ী বিক্রী করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠ্ল।

ক ছিল ভাল; সে চলে যাবে শুনে অনেকেই দুঃখিত হল। হরি স, "সাউজি চলে গেলে গেরামটাই কাণা হয়ে যাবে।" আর পর পরদিন হুঁকো টান্তে টান্তে কল্কের মাথায় হাত দিয়ে বলে গেল যে "সাউজিই যদি গাঁ ছেড়ে যায় তবে সেই বা আর

জন্যে থাকবে ? সাউজি যেন তাকেও সঙ্গে করে কাশী বৃন্দাবন যেখানে যাবে নিয়ে যায়।"

কিন্তু কাশীবাসের মত অত বড় পুণ্যটা যে কিস্টো এত সহজে লাভ করবে এটা গ্রামের অন্য কলুদের মোটেই মনঃপূত হল না। বেণী সা, ভূপাল সা, যুক্তি করে একদিন কিস্টোকে ধরে বসল যে, তারা এই বয়সে কিস্টোকে কিছুতেই কাশীবাসী হতে দিতে পারবে না। কিস্টো বিয়ে করে বলদ কিনে ঘানি মেরামত করে আবার সংসার পেতে বসুক। টাকা যা লাগে তারা দিতে প্রস্তুত। তারা বেঁচে থাকতে কিনা বুড়ো হওয়ার আগেই সে বিবাগী হয়ে কাশীবাস করবে! আরে রাধেশ্যাম! সেও কি একটা কথা ?

দশচক্রে ভগবান ভূত হয়েছিলেন; সুতরাং এহেন হিতৈষী পরমাত্মীয়দের স্নেহচক্রে পড়ে কেউ যদি কাশী মক্কা না যেতে পারে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কিস্টো তুদিন পরে ঘর ছাইলে ছুতার ডেকে ঘানি মেরামত করালে, তারপর তেলসিঁদুর দিয়ে ঘানি পূজা করে বলদ কিনতে যাওয়ার জন্যে টাকার জোগাড় দেখতে লাগল। দেশে পড়েছে অকাল; মহাজনরা সুদ বাড়িয়েছে চারগুণ। একদিন টাকা ধার করতে গিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসে কিস্টো তামাকের ধোঁয়ায় ক্ষোভ নিবারণের চেস্টা করছিল এমন সময় "কিস্টো বাড়ীতে আছ হে ?" বলে কলুদের কুল পুরোহিত বৃন্দাবন পাঠক ঠাকুর এসে উপস্থিত হল। কিস্টো সাষ্টাঙ্গ প্রাণাম করে ঠাকুরের আসন পেতে দিল। পুরুত ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, —"কিস্টো, তুমি নাকি বিশ্বনাথ দর্শন করতে যাবে শুনছি ?" "আজ্ঞে মনে ত করেছিলাম ঠাকুর, কিন্তু......"

"হুঁ, বুঝেছি। তারপর তুমি নতুন ঘানিগাছ করেছ তাও শুনেছি; কিন্তু পূজা পিতিষ্ঠে করলে না, ব্রাহ্মণের বিদায় দক্ষিণাও কিছু দিলে না। দেবতাকেও ফাঁকি দিলে ব্রাহ্মণকেও ফাঁকি দিলে। এতে ....."

কিস্টো বললে "ঠাকুর হাতে কিছু নাই, সেই জন্যেই"—

"হ্যাঃ। এদিকে কাশী যাবে বৃন্দাবন যাবে তীর্থ করতে, আর আমার বেলায়

হাতে কিছু নাই। আমার পাওনাটা ফাঁকি দিও না কিষ্টো, দিয়ে দাও: নইলে ধম্মে পতিত হবে।" কিষ্টোর মেজাজটা একটু গরম হয়েই ছিল; সে উত্তর দিল 'হাতে হলে আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আস্‌ব ঠাকুর। এখন কিছু দিতে পারব না।" "আচ্ছা বেশ, দেখি ব্রাহ্মণকে বাদ দিয়ে তোমার কি করে চলে? কিন্তু শেষে পস্তিও না যেন! হরি হে মধুসূদন!" বলে পুরুত ঠাকুর চলে গেল। কিস্টো স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বৃন্দাবন পাঠকের চটিজুতার ফট্‌ফট্ শব্দে তার কান দুটো অনেকক্ষণ ধরে আচ্ছন্ন হয়ে রইল। পুরুত যে শিষ্যের জন্যে কি ব্যবস্থা করলেন তা জানতে বেশী দেরী হল না। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কিষ্টোর এক ঘরে হওয়ার সংবাদ খাণ্ডবাগ্নির মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

সন্ধ্যার পর কিস্টো গিয়ে যথা স্থানে ডাক দিল "মুখুজ্যা মহাশয় আছেন?" দাবাবড়ে বগলে জড়িয়ে লণ্ঠন হাতে মুখুজ্যে মশাই বেরিয়ে এলেন কিন্তু খেলা সে রাত্রে বন্ধ রইল। অনেকক্ষণ মন্ত্রণার পর কিস্টোকে এক ঘরে করার প্রতিশোধ কি করে দেওয়া হবে তা ঠিক হল।

শার্টের উপর কোমরে চাদর বেঁধে চটি পায়ে দিয়ে কিষ্টো বলদ কিনতে বেরিয়ে পড়ল

হিরণপুরের গরুর হাট শিউলিডাঙ্গা থেকে সাড়ে পাঁচ ক্রোশ দূর। সেই পথেই পাঠক ঠাকুরদের গ্রাম শিবরামপুর। একদিন কিস্টো খবর পেল যে পাঠক সে রাত্রে অন্য গ্রামে যজমান বাড়ীতে থাক্‌বে এবং পরদিন বাড়ী ফিরবে। তৎক্ষণাৎ টাকা জোগাড় করে শার্টের উপর কোমরে চাদর বেঁধে চটি পায়ে দিয়ে কিস্টো 'দুর্গা' বলে বলদ কিনতে বেরিয়ে পড়ল। সে যখন শিবরামপুর গ্রামে ঢুক্‌ল তখন সন্ধ্যারাত্রি এক প্রহর উৎরে গেছে। পাঠক ঠাকুরের বাড়ীর রকের

উপর তখন দুজন লোক দাবা খেলছে আরও তিন জন বসে খেলা দেখ্‌ছে। সকলেই তন্ময়। কিষ্টো ধীরে ধীরে গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে খেলা দেখ্‌তে লাগল; কথাবার্ত্তা শুনে বুঝ্‌তে পারা গেল বৃন্দাবনের দাদা নারাণ পাঠক আর অন্য একজন এই দুজনে খেলা চল্‌ছে। নারাণ ঠাকুর শাদা ঘরের ঘোড়াটাকে আড়াই পদ এগিয়ে দিয়ে খুব একটা শক্ত চাল দিয়েছে মনে করে বল্‌লে "এ—ই—কিস্তি।"

আসলে কিন্তু চালটা ছিল ভুল। কিষ্টো পাকা দাবাড়ে; সে আর থাক্‌তে না পেরে বলে উঠ্‌ল "আহাহা—ওটা চাল্‌বেন না, মন্ত্রী মারা পড়বে, মন্ত্রী সামলান আগে।" অপরিচিত কণ্ঠস্বরে সকলে একটু চম্‌কে উঠ্‌ল। নারাণ ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলে "কে আপনি মশায়? আপনার বাড়ী?" কিষ্টো বল্‌লে "আজ্ঞে মাপ করবেন; আপনাদের খেলা দেখ্‌বার জন্য দাঁড়িয়েছি। আমার বাড়ী অনেকদূর, বাবুপুর প্রতাপগঞ্জ। আমি যাব হিরণপুরের হাট।"

"আপনারা?"

"আজ্ঞে চক্রবর্ত্তী।"

"আহা তা নীচে দাঁড়িয়ে কেন? উঠে বসুন, উঠে বসুন। কিন্তু রেতের বেলা এ পথে যাওয়া ত ঠিক নয়, চোরচণ্ডালের ভয় আছে। এই নিন তামাক ইচ্ছে করুন। এটাও বেরাহ্মনেরই বাড়ী। আজকের রাতটা যদি চারটি শাকান্ন..."

কিষ্টো এই চাচ্ছিল। সে আর আপত্তি না করে বল্‌লে "আজ্ঞে, আপনার দয়া—এই বিদেশে—রাত্রিকালে আশ্রয় দিলেন। ভগবান মঙ্গল করবেন।" বলাবাহুল্য সে রাত্রে ভোজনটা অতি পরিপাটি হল। কিষ্টোর দাবাখেলা দেখে নারাণ ঠাকুর ত একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল।

আবার প্রত্যূষে উঠে কিষ্টো হাটের পথে বেরিয়ে পড়ল। তার আনন্দ রাখ্‌বার আর জায়গা ছিল না। হাঁ, একঘরে করার প্রতিশোধ বামুনকে দেওয়া হয়েছে বটে! মনের আনন্দে সে চল্লিশের জায়গায় ষাট টাকা দিয়ে বলদ কিনে ফেল্‌ল। গাঁয়ের লোক যারা হাট করতে গেছ্‌ল তাদের সঙ্গে বলদটা পাঠিয়ে দিয়ে, বেলা চারটির

সময় বাড়ী ফিরবার পথে আবার পাঠকদের বাড়ী উপস্থিত হল। রকের উপর বৃন্দাবন পাঠক, নারাণ পাঠক এবং আরও কয়েকজন লোক বসেছিল! কিষ্টো পুরুতকে দেখে মাথাও নোয়ালে না, কথাও বললে না—যেন তাকে চেনেই না। নারাণ ঠাকুর আপ্যায়িত করে বল্‌লে, "এই যে আসুন চক্কোত্তি মশায়। আস্তে আজ্ঞে হোক্। তামাক ইচ্ছে করুন। তারপর, গরু কেনা হল না বুঝি আজকে?" "আর গরুটরু কিন্‌বার যো নেই দাদা! যে দিনকাল পড়েছে" বলে কড়ি বাঁধা হুঁকোটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে বৃন্দাবনের দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে কিষ্টো ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে তামাক খেতে সুরু করে দিলে এবং বল্‌তে লাগ্‌ল যে "দুচার হাট না ঘুরে আজকাল একটা ঘানি টানা কাণা বলদও পাবার যো নেই—গরু পাওয়া ত দুরস্থান!" নারাণ ঠাকুর বল্‌লে "তা বেশ ত এক হাট ছেড়ে দশ হাট ঘুরুন না কেন? পথের উপরই আমরাও রয়েছি। আজকের রাত্রিটাও তাহলে থেকে যান, দুচার বাজি খেলা হোক। তারপর গরীব বেরাম্ভনের বাড়ী চারটি শাকান্ন..."

হুঁকায় একটা সুখটান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কিষ্টো হাত জোড় করে বল্‌লে "আজ্ঞে আজকে মাপ করতে হবে দাদা। বাড়ীতে কাজ আছে। পরের হাটে আস্‌তেই হবে আবার; নিশ্চিন্দি হয়েই খেলা যাবে তখন। আজ তাহলে আসি।" তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করে পথে নেমে পড়ল!

বৃন্দাবনের কাছে ব্যাপারটা আগাগোড়া এম্‌নি অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত ঠেক্‌ল যে সে বেচারা হতভম্ব হয়ে গেল। কিষ্টো চলে গেলে জিজ্ঞেস্ করলে, "দাদা, তুমি ও লোকটিকে জানো?"

"তা আর জানিনে বিন্দেবন? ও হল গে তোমার বাবুপুর প্রতাপগঞ্জের বিখ্যাত দাবাড়ে চক্কোত্তি মশায়। কাল এই পথে হিরণপুর যাচ্ছিল; আমি বলে কয়ে রাত্রে এখানেই রাখলাম, রেতের বেলা খাওয়ালাম। ওঃ! দাবার যা এক একটা মোক্ষম্ চল দেয়, যদি একবার দেখ্‌তিস্ বিন্দেবন! কি আর বল্‌ব?"

"আর বলবার কিছু নেই দাদা। ও আমাদের জাত নষ্ট করে দিয়ে গেল; ও

হচ্ছে শিউলিডাঙ্গার কিষ্টো তেলী ; আমারি এক ঘর যজমান। এই সেদিন ওকে একঘরে করেছিলাম। ওঃ ব্যাটা খুব তার প্রতিশোধ দিলে !"

নারাণ ঠাকুর অবাক হয়ে চোখ দুটো কপালে তুলে খানিকক্ষণ পরে বল্লে "এখন উপায় ?" উপায় যে কি তা বলা সোজা ছিল না। অনেক ভেবে তারা শিউলি ডাঙ্গার রাজবাড়ীতে নালিশ করল। বিচারের ভার পড়ল রাজা পুরোহিত শাস্ত্রী মশাইয়ের উপর।

যথা সময়ে বিচার সভা বসল। বৃন্দাবন পাঠক তার নালিশ জ্ঞাপন করল। শাস্ত্রী মশাই কিষ্টোকে জিজ্ঞাসা করলেন......

"এদের কাছে তুমি ব্রাহ্মণ বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিলে ?"

"আজ্ঞে না ঠাকুর।"

নারাণ পাঠক প্রতিবাদ করে বললে, "মিথ্যা কথা ; ও আমাকে নিজমুখে বলেছে "আমি চক্রবর্ত্তী।"

কিষ্টো হাত জোড় করে স্বীকার করলে, "দোহাই শাস্ত্রী মহারাজ ! 'আমি চক্রবর্ত্তী' একথা আমি বলেছি কিন্তু 'আমি ব্রাহ্মণ' একথা আমি কখনও বলিনি !"

শাস্ত্রী মশাই মাথা নেড়ে বল্‌লেন "উঁহু, চক্রবর্ত্তী বললেই ব্রাহ্মণ বলা হল ; কিন্তু তুমি যখন ব্রাহ্মণ নও"......

কিষ্টো বাধা দিয়ে বল্‌লে "ঠাকুর, আমি ব্রাহ্মণ না হলেও চক্রবর্ত্তী। ঘানিচক্রে অবস্থান করে বলে, কলু জাতটার সকলেই চক্রবর্ত্তী একথা জগতের লোক জানে ; ঘানি গাছের সঙ্গে চক্কর দিয়ে ঘুরে সরষে পীড়ানই আমার জাতব্যবসা, সে জন্যে আমার ভাল নাম শ্রীসরিষামর্দ্দন চক্রবর্ত্তী, রাজবাড়ীর সকলেই তা জানেন। অতএব আমি চক্রবর্ত্তী একথা বলে আমি কোন অপরাধ করিনি। বৃন্দাবন ঠাকুরই আমাকে বিনা দোষে এক ঘরে করেছে, মহারাজ।"

বিচার সভায় একটা হাসির ঢেউ খেলে গেল। শাস্ত্রী মশাই বৃন্দাবন পাঠককে জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি ওকে অন্যায় করে একঘরে করেছ কেন ?"

সে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে "রাগের মাথায় অন্যায় করে ফেলেছিলাম, শাস্ত্রী

মহারাজ। আমি ওকে জাতে তুলে দিচ্ছি। কিন্তু কিষ্টো আমার বাড়ীতে খেয়েছিল বলে দেশের লোক আমাকে একঘরে করে রাখতে চায়। আপনি একটা কিছু...” শাস্ত্রী মশাই মাথা দুলিয়ে হাত নেড়ে বল্লেন “আঁরে না না মূর্খ। অতিথি বাড়ীতে খেয়ে গেলে কি জাত যায় ? অতিথি দেবতা যে—স্বয়ং নারায়ণ!” তোমায় কেউ একঘরে করতে পারবে না—তুমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী যাও; কিন্তু আর অন্যায় অত্যাচার কোরো না।”

বিচার সভা ভঙ্গ হল। লোকের মুখে কিষ্টোর বুদ্ধির প্রশংসা আব ধরে না।

পরদিন শিবরামপুরের শ্রীনাবায়ণচন্দ্র পাঠকেব কাছ থেকে পত্র যোগে নিমন্ত্রণ এল যে, এর পর কিষ্টো যে দিন হাটে যাবে সেদিন যেন সে অতি অবিশ্য অবিশ্য গরীব বেরাস্তনের বাড়ী চারিটি শাকান্ন প্রসাদ পেয়ে যায় এবং দুচার বাজী দাবা খেলে যায়।

চিঠিখানায় শিবোনাম ছিল,—শ্রীসবিষা মর্দ্দন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমীরা চৌধুরী

ভীষণ-স্নেহ

সে বার যখন আমি চিড়িয়াখানায় যাই, তখন ভারী মজা হয়েছিল, শুনবে, শোন তবে—।

চিড়িয়াখানায় গিয়ে সারাদিন তো খুব মজায় আর চেঁচামেচি করে কেটে গেল; বাড়ী ফেরবার কিছু আগে বাঁদরের ঘর দেখতে গেলুম, সেখানে গিয়ে একটী খাঁচায় দেখলুম একটা বাঁদর জাল ধরে দোল খাচ্ছে, ছোট্ট বাঁদরটার রকম দেখে আমার বেজায় হাসি পেল, আমার হাতে একটী লেড্ পেন্সিল ছিল, সেটা দিয়ে তাকে একটা খোঁচা দিলুম, সে তো ভয় পেয়ে অন্য দিকে চলে গেল—কিন্তু সেই আমি ফিরেছি,

অমনি কাপড়ের কোঁচাটা খাঁচায় ঠেকল, আর বাঁদরটা চট্ করে কাপড়টা ধরে মুখে খানিকটা ঠেসে নিয়ে বাকীটা নিয়ে ছিঁড়তে লাগল, আমি ভয়ে প্রাণপ্রণে টানতে লাগলুম।

কোনো রকমে ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলুম ; ভয়ঙ্কর দুঃখ হল, জরি পাড় সাধের ধুতিটা ! তায় আবার বাড়ী গিয়ে বকুনি খেতে হবে, চোখ ফেটে জল আসতে লাগল, সকলে আমায় ঠাট্টা করতে লাগল।

বাড়ী গেলুম, সকলেই একটু একটু বকলেন, ছোটদা গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "সে তোকে নিজের জাত বলে চিনতে পেরেছিল কি না, তাই তোর কাপড় ধরে টেনেছিল।"

আমি বল্লুম, "আহা তাই বুঝি।"

কিন্তু রাত্রে বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে বসে মনে হতে লাগল, ছোটদাদা যা বল্লেন, তাই কি ? এ জন্মে না হোক গত জন্মে। তার পর মনে হল, কি বোকা আমি, ছোড়দা ঠাট্টা করে বল্লেন, অম্নি আমি বিশ্বাস করলাম, হাসি পেতে লাগল, একটু হেসে ঝুঁকে যেই বারান্দার রেলিংএ হাত দিয়েছি, অমনি কার গায়ে হাত ঠেকল, চমকে বল্লাম, "কে" ?

উত্তর হল, "আমি সেই চিড়িয়াখানার বাঁদরের মা"।

বল্লুম, "তুমি এখানে কি করে এলে ?"

"অনেক কষ্টে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।"

"আমার সঙ্গে দেখা করতে, কারন ?"

"তুমি তো জান না, কেন সে তোমার কাপড় টেনে ছিল, তুমি তাকে বা আমাকে চিনলে না, বড্ড দুঃখ।"

"কি আশ্চর্য্য, তোমায় কি করে চিনব, তুমি বানর, আমি মানুষ!"

বাঁদরটা এমনি হোঃ হোঃ করে হাসলে যে আমি অপ্রস্তুত হয়ে গেলুম, তখন সে বল্লে, "হুঁ, তোমার সবে ১০ বছর বয়স, কিইবা বুঝবে, আর কি-ই-বা জানবে।"

আমার বেজায় রাগ হল, বল্লাম, "হ্যাঁঃ, আমি কিছু বুঝি না, উনিই সব বোঝেন, বাঁদুরে বুদ্ধি না হলে এমন হয় ?"

সে বল্লে "তা কি করেই বা বুঝবে, তোমার ভাই অত করে কাপড় ধরে টানাটানি করলে, অত যেতে বল্লে, কিছুই বুঝতে পারলে না।"

আমি বল্লুম, "কি বলছ, কে আমার ভাই, আমার নিজের ভাই তো নেই।"

সে বল্লে, "তবে শোন, তুমি গত জন্মে বাঁদর ছিলে, আর আমারই ছেলে ছিলে, তখন কত লাফিয়ে লাফিয়ে নেচে বেড়াতে যেই আমরা চিড়িয়াখানায় গেলুম, তার তিন দিন পরে তুমি মরে গেলে,—"এই বলে সে খানিকক্ষণ ফুঁপিয়ে বল্লে,—"তারপর কতদিন তোমার জন্যে অপেক্ষা করতাম, এ জন্মে ত মানুষ হয়েছ, তা বেড়াতে আস না কেন ? তারপর আজ তোমায় দেখলাম, মাঝে তোমার ছোট ভাইটী হয়েছে।" বলে সে আমার পিঠে হাত বুলোতে লাগল।

রাগে আমার গা জ্বলে গেল, সজোরে তার হাত সরিয়ে বল্লাম, "গেল জন্মের সম্পর্ক যখন ছিল তখন ছিল, ঢের হয়েছে, আর মিথ্যে কথা বলতে হবে না, তুমি বিদেয় হও এখন।'

সে বল্লে, "আমি তো তোমায় নিয়ে যাব।"
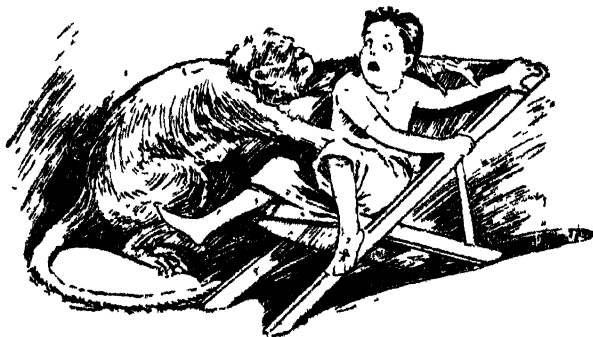
আমি বল্লুম, "না, কিছুতেই যাব না।"

"আমরা ভবিষ্যৎ গুনতে পারি, তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে!" বলে হাত ধরে টানলে—।

রোষে, ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায় আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, "ওঃ ছাড়্—ছাড়্—হতভাগা।" বলে তাকে প্রাণপণ শক্তিতে এক চড় লাগালাম, সে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠলো।

চমকে চেয়ে দেখি যে আমার পায়েব কাছে চাব বছরের খুড়তুত ভাই মনু দাঁড়িয়ে আছে, আব আমার চড় খেয়ে কাঁদছে, সকাল হয়ে গেছে, খুড়িমা ব্যাপার দেখে খুব হাসছেন। সারা রাত বারান্দায় শুয়ে স্বপ্ন দেখেছি। আমি অপ্রস্তুত হয়ে মনুকে লজঞ্চুসেব লোভ দেখিয়ে কোলে করে বাইরে নিয়ে গেলুম। এখন মনে হয়, যদি সত্যি সত্যি যা সপ্ন দেখেছি তাই হ'ত! বাপরে! আহা, কি ভীষণ স্নেহ রে!

কুমারী অশোকা সেন

ব্যাঙাচির গান

মারিয়ে মশা, মারিয়ে মাছি
মারিতে গেলাম ব্যাঙাচি—
টালা—টিলা—টা রা লা—টা রা লা
লা—লা—লা—লাল্ লা লা।
ব্যাঙাচি ভয় পাইয়ে
ঐ গেল পালিয়ে
সাক্‌লা তলার সাঁৎলা তলা দিয়ে
ব্যাঙাচি গেল পালিয়ে॥

পালাতে পালাতে,

ব্যাঙাচির বিঁধল গলাতে

ঐ চিঙড়ি মাছের ল্যাজার কাঁটা

ব্যাঙাচির বিঁধল গলাতে

যখন গেল পালাতে ॥

ব্যাঙাচির গলাতে কাঁটা

ব্যাঙাচি খুঁড়িয়ে চলে

ইঁহারে উঁহারে, তাঁহারে—ডেকে ডেকে বলে

হাত যোড় করি ব্যাঙাচি কেঁদে কেঁদে বলে

"কাঁটা তুলে দাও কাঁটা তুলে দাও"

সবারে ব'লে

কাঁদিতে কাঁদিতে শেষে,

গেল তার পিসেরি দেশে—

ব্যাঙাচির পিসে কোলা ব্যাং

ও তার লম্বা দুটো ঠ্যাং

পিসে তার কাছে এল

কাঁটাটি তু'লে দিল— ॥

আহা—কাঁটাটি গেল সরে,

মনেরি দুঃখে—ব্যাঙাচির হাতটুকু মন—

ব্যাঙাচির একটু খানি মন -

সেই মনেরি দুঃখে ব্যাঙাচি গেল মরে—

আহা তবু খুঁড়িয়ে চলে

ব্যাঙাচির গলাতে কাঁটা, ব্যাঙাচি খুঁড়িয়ে চলে।

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঘের মুখে

য়ে বন্ধুদের সব কথা জানাচ্ছেন ; তাঁর বন্ধুরা
খতে পাচ্ছে না। মাঝে মাঝে জো জোর
কইচেন। এমনি করে আরো খানিকটা এসে
জায়গায় জায়গায় যেন কোন বাড়ীর ভাঙ্গা
দেখে তিনি ত অবাক! এমন জঙ্গল -
ব নামগন্ধ নেই —সেখানে পাকাবাড়ী তৈরী
তার মনে পড়ে গেল। তিনি শুনেছিলেন
মকে গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আগে
ল; শেষে বাঘের উৎপাতে লোকালয় অরণ্য হয়ে
তে জো আরো খানিকটা এগিয়ে এসেছেন; বাঘের
লে গেছে। গাছের ঘেঁষাঘেষি, লতা পাতার জড়াজড়ি
। আর হামাগুড়ি দেবার দরকার নেই দেখে জো দাঁড়িয়ে
নেই দেখলেন অনেক দিনের পুরানো একটা মন্দির! মন্দিরটার
ঙ্গে গেছে। যেটুকু আছে, তা শ্যাওলা রঙের ছাতায় আর
ন্দিরের সবটাই জঙ্গলে ঢাকা, শুধু যেখানে ঠাকুর থাকে সেই
। এদেশে এসে অনেকবার জোর ইচ্ছে হয়েছে একবার হিন্দুর ;
, সেখানে কি থাকে না থাকে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁর সে সখ
বলেন, এই তো সুযোগ—দেখাই যাক্ না, একবার ঢুকে।
ক করলেন তাঁর ভাই সঙ্গে করে সেই ভাঙ্গা মন্দিরে ঢুকবেন। জর্জ্জ
। একটু ডাকাডাকির পর জর্জ্জের সাড়া পেয়ে জো তাঁকে এগিয়ে

ভলভার, আর জর্জ্জ তাঁর বন্দুকটা ভাল করে দেখে নিলেন।
টোটা পরিয়ে নিলেন ;—কি জানি যদিই মন্দিরে বাঘ ভালুক
তৈরী থাকাই ভাল। দুই ভায়ে আস্তে আস্তে মন্দিরে
য়র শব্দে বাদুড় চামচিকে উড়ে বেরিয়ে গেল। মন্দিরটার

নেপাল ... বে
বাঘের জঙ্গল। ...
সন্ধান পেয়ে ...
হাতীতে চড়ে, তবাই ...
গাছের গুঁড়ির দিকে
সাহেবরা দেখলেন—গা
'আপনারা মানবেন কি
মাঝে গাছের গা আঁচড়ে
কথা শুনে হেসেই অস্থির
খটকা লাগল। তিনি সতি
দাগগুলো বেশ করে দেখে,
গাছের গায়ে দাগগুলো কেটে
তা তখনও ভাল করে শুকো

এগিয়ে আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে দের সব কথা জানাচ্ছেন; তাঁর বন্ধুরা খুব দূরে না থাকলেও কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। মাঝে মাঝে জো জোর গলায় ভাই জর্জ্জের সঙ্গেও কথাবার্ত্তা কইচেন। এমনি করে আরো খানিকটা এসে জো দেখ্‌লেন, সেই গহন বনের মধ্যে জায়গায় জায়গায় যেন কোন বাড়ীর ভাঙ্গা গাঁথুনীর অনেক টুকরো পড়ে রয়েচে। দেখে তিনি ত অবাক! এমন জঙ্গল - যার দু'চার কোশের মধ্যে মানুষের নামগন্ধ নেই—সেখানে পাকাবাড়ী তৈরী করেছিল কে? হঠাৎ একটা কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি শুনেছিলেন বাঘের দৌরাত্মে অনেক সময় গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আগে এখানে লোকের বসতি ছিল; শেষে বাঘের উৎপাতে লোকালয় অরণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাবতে ভাবতে জো আরো খানিকটা এগিয়ে এসেছেন; বাঘের কথাও তাঁর মন থেকে চলে গেছে। গাছের ঘেঁষাঘেষি, লতা পাতার জড়াজড়ি যেন একটু কম হয়ে এল। আর হামাগুড়ি দেবার দরকার নেই দেখে জো দাঁড়িয়ে উঠলেন। তিনি সামনেই দেখলেন অনেক দিনের পুরানো একটা মন্দির! মন্দিরটার বেশির ভাগই ভেঙ্গে গেছে। যেটুকু আছে, তা শ্যাওলা রঙের ছাতায় আর আগাছায় ভরা। মন্দিরের সবটাই জঙ্গলে ঢাকা, শুধু যেখানে ঠাকুর থাকে সেই জায়গটা দেখা যাচ্ছে। এদেশে এসে অনেকবার জোর ইচ্ছে হয়েছে একবার হিন্দুর মন্দিরে ঢুকে দেখেন, সেখানে কি থাকে না থাকে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁর সে সখ মেটেনি। জো ভাবলেন, এই তো সুযোগ—দেখাই যাক্ না, একবার ঢুকে। সাত পাঁচ ভেবে ঠিক করলেন তার ভাই সঙ্গে করে সেই ভাঙ্গা মন্দিরে ঢুকবেন। জর্জ্জ কিছু দূরেই ছিলেন। একটু ডাকাডাকির পর জর্জ্জের সাড়া পেয়ে জো তাঁকে এগিয়ে আসতে বললেন।

জো নিজের রিভলভার, আর জর্জ্জ তাঁর বন্দুকটা ভাল করে দেখে নিলেন। দুজনেই নতুন করে টোটা পরিয়ে নিলেন;—কি জানি যদিই মন্দিরে বাঘ ভালুক থাকে; আগে থেকে তৈরী থাকাই ভাল। দুই ভায়ে আস্তে আস্তে মন্দিরে ঢুকলেন তাঁদের পায়ের শব্দে বাদুড় চামচিকে উড়ে বেরিয়ে গেল। মন্দিরটার

"অনেক দিনের পুরনো একটী মন্দির।"

ভেতর ভয়ানক অন্ধকার;—কিছুই চোখে দেখা যায় না। কেমন একটা বিকট গন্ধ তাঁদের নাকে আসতে লাগল। খানিক পরে অন্ধকারে চোখ সয়ে গেলে তাঁদের নজর পড়ল একটা উঁচু বেদী,—তার ওপর ঠাকুর নেই। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে মন্দিরের একটা কোণে বেদীর ওধারে, সবুজ মতন জ্বলজ্বলে কি দুটো জিনিস তাঁদের চোখে পড়ল। তাঁরা কেতাবে পড়েছিলেন, হিন্দুদের মন্দিরে ধন-দৌলত হীরেমানিক লুকান থাকে, ভাবলেন ঐ সবুজ জ্বলজ্বলে জিনিষ দুটো হয় তো কোনো রকম জহরৎ হবে। ও জহরৎ দুটো কত বড়? তাঁরা দেখে আরও আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, সে দুটোর জ্বলজ্বলে ভাব মাঝে মাঝে কমছে বাড়ছে। জো ও তাঁর ভাই জর্জ্জ দুজনে এক দৃষ্টে সেই অদ্ভুত জিনিষের দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ সেই দুটো আরো ঝক্‌ঝক্ করে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে একটা অতি গম্ভীর ঘরঘরে শব্দ। জো চম্‌কে উঠে ভাইকে বললেন,—"জর্জ্জ, এই সেই বাঘ! আমরা যমের মুখে এসে পড়েছি।" চার হাত দূরে বাঘ রয়েছে দেখে তাঁদের মত অতি সাহসী শিকারীও কাঠ হয়ে গেলেন। মন্দিরের একটি মাত্র দরজা। সেখান দিয়ে বেরুতে গেলে বাঘের দিকে পিছন করে পালাতে হয়; তাতে বাঘ হালুম করে পেছন থেকে ঘাড়ে পড়লে বাঁচবার আশা মোটেই নেই। তাঁরা ঠিক করলেন, যা কিছু করতে হবে বাঘের দিকে চোখ রেখে। বাঘটা বেদীর পেছনে এধার ওধার করে বেড়াচ্ছে। ভাব ভাঁটার মত চোখ দুটো জ্বলছে অন্ধকারে সাদা দাঁতগুলো ঝক্‌ঝক্ করে উঠছে, আর আকাশের বুকে গড়িয়ে যাওয়া বাজের শব্দের মত ক্রমাগত ঘরঘর আওয়াজ হচ্ছে। বাঘটারও পালাবার পথ নেই। মানুষ দুটো তাকে দেখে যেমন হতভম্ব হয়েছে, বাঘও বোধ হয় তাদের দেখে তেমনি অবস্থায় পড়েছে। কারও পালাবার যো নেই। জো দেখলেন বাঘকে মারতে না পারলে নিজেদের প্রাণ বাঁচান দায়। জো অসীম সাহসে বুক বেঁধে মরিয়া হয়ে উঠলেন; জর্জ্জকে সাহস দিয়ে বল্লেন,—"জর্জ্জ, বাঘের চোখ থেকে এক লহমাও চোখ ফিরিও না, বন্দুক বাঘের দিকে তাক করে রাখ;—বল্লেই গুলি করবে।" জো তাঁর রিভলবারটা বাগিয়ে ধরে বাঘের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন। বাঘ এধার ওধার করা ছেড়ে দিয়ে

হঠাৎ বসে পড়ল। জো বলে উঠলেন,—“বসে পড় জক্স, বসে পড, বাঘ লাফাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে বেদীর চারিদিকে নজর রাখ।”

সেই অন্ধকারের মধ্যে বাঘ ও মানুষ দুজনে দুজনের প্রাণ নেবার জন্যে সুবিধে খুঁজতে লাগল। এখন কে জেতে যাবে। জো ও জক্স হাটু গেড়ে বসে নিজেদের রিভলভার ও বন্দুক বাঘের দিকে তাক করে ধরেছেন। এক এক

‘[illegible] শব্দ [illegible]’
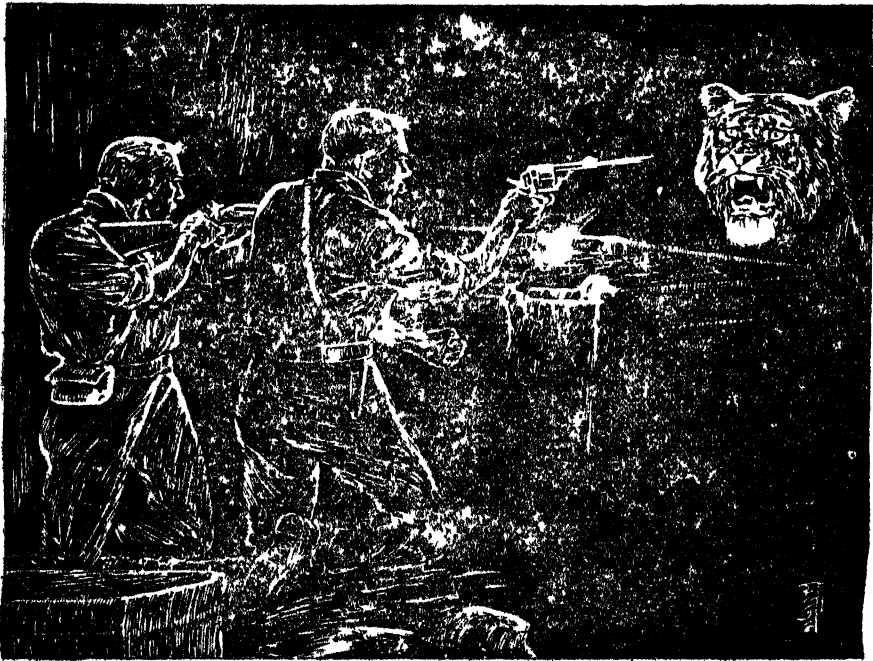
সেকেণ্ড যেন এক একটা ঘণ্টা বলে মনে হচ্চে। চারিদিক নিস্তব্ধ। দুজনের নিঃশ্বাসের শব্দটুকু পর্য্যন্ত শোনা যাচ্চে না। পাথরের মেঝেতে নখ আটকাবার মত কি একটা শব্দ হল। জো-র রিভলভার খট করে উঠল। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মাথা বেদীর উপর দেখা দিলে। “হুসিয়ার, জর্জ্জ” বলেই জো বাঘের সেই

জ্বলন্ত চোখ দুটো লক্ষ্য ক'রে রিভলভারের ঘোড়া টিপলেন। নলের মুখে আগুন জ্বলে উঠল। অন্ধকার মন্দিরে লাল আলো খেলে গেল। "গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম"—বিকট গর্জন ক'রে বাঘ লাফ দিয়ে মন্দিরের বাইরে এসে পড়ল। একবার ফিরে আক্রমণ করবার চেষ্টা করলে, কিন্তু দাঁড়াতে পারলে না, পড়ে গেল আর নড়ল না।

ফুলের চাষ

মৌচাকের পাঠক পাঠিকারা, তোমরা অনেকেই ফুল ভালবাসো,—যা'দের বাড়ীতে জমী আছে, তা'রা সেখানে ফুল গাছ লাগাও, আর যা'দের বাড়ীতে জমী নেই, তা'রা টবে গামলায় বা পুরোনো বালতিতে মাটি দিয়ে দু চারটে বেল, জুঁই, গাঁদা ইত্যাদি ফুল গাছ লাগাও। কিন্তু গাছের সেবা ঠিক-মতন ক'রতে জানো না

ব'লে বোধ হয় অনেকেই ভাল রকম ফুল পাও না। তাই ফুলগাছের সেবা সম্বন্ধে তোমাদের দু'চারটে কথা ব'লবো।

প্রথমেই মনে রাখবে খুব ভিজে স্যাঁৎসেঁতে মাটিতে ফুলগাছ ভাল হয় না। সেই জন্যে, যদি জমীতে ফুলগাছ বসাও, তা'হ'লে এমন জায়গা বেছে নেবে, যে জায়গা নীচু নয়, অর্থাৎ যেখানে বর্ষাকালে জল দাঁড়ায় না; আর যদি টবে গামলায় ইত্যাদিতে ফুলগাছ লাগাও, তা'হ'লে দেখবে যেন তা'দের তলায় ছ্যাঁদা থাকে, অর্থাৎ মাটি যতটা জল শুষে নিতে পারে, তা'র বেশী জলটা যেন ভাল ক'রে বেরিয়ে যেতে পারে। তলায় ছ্যাঁদা না-থাক্‌লে দু'তিনটে ছ্যাঁদা ক'রে নেবে। তারপর জমী কোদাল্‌ দিয়ে খুঁড়ে মাটি ভাল ক'রে গুঁড়িয়ে, যদি ঘাস বা অন্য কোনো আগাছা থাকে, সেগুলো বেছে ফেলে জমীটাকে পরিষ্কার ক'রে ফেল্‌বে। টবে গাছ বসালে, প্রথমে মাটিটাকে গুঁড়িয়ে নেবে। তা'রপর মাটি দিয়ে টবটা ভরবার আগে প্রথমে তা'র তলায় আন্দাজ দু'-আঙ্গুল টিল পাট্‌কেল ইত্যাদি দিয়ে তবে তা'র উপর মাটি দেবে, এতে বেশী জল সহজে বেরিয়ে যাবার সুবিধে হয় এবং তা'তে গাছ ভাল থাকে। টবের কানায়-কানায় মাটি দিয়ে ভ'রো না, কারণ তা'তে জল গড়িয়ে টবের বাইরে চ'লে যায়। কানা থেকে দু'-এক আঙ্গুল ফাঁক রেখে মাটি ভ'রবে। টবে মাটি ভরবার আগে যদি মাটির সঙ্গে কিছু পুরোণো গোবর বা ঘুঁটের গুঁড়ো বা বেড়ী, সরষে ইত্যাদির খোলের গুঁড়ো মিশিয়ে নিতে পারো, দিও, তা'হলে গাছের খুব তেজ হবে।

তারপর মনে রাখ্‌বে ছায়াতে গাছ ভাল হয় না। সেইজন্যে এমন জায়গায় গাছ বসাবে, যেখানটা বেশ ফাঁকা, অর্থাৎ যেখানে বেশ রোদ আসে। টবও ওই রকম জায়গায় রাখবে। আলোয় থাক্‌লে পাতার রং সবুজ হয় এবং গাছও খুব শক্ত হয়।

তোমরা বোধ হয় দেখেছো যে, যখন মালীদের কাছ থেকে তোমরা ফুলগাছ কেনো, তখন গাছের গোড়ায় একটা মাটির ডেলা থাকে। গাছ বসাবার সময় ঐ ডেলাটা একটুও ভেঙ্গো না, তা'হ'লে শেকড় ছিঁড়ে গিয়ে গাছ কাহিল হ'য়ে প'ড়বে।

ঐ ডেলাশুদ্ধ গাছই মাটিতে বসাবে এবং এমন ভাবে বসাবে যেন ঐ ডেলার ওপর প্রায় এক আঙুল পর্য্যন্ত গাছটা মাটির নীচে থাকে। গাছ বসাবার পর দিন দশ-বারো বার রোজ খুব ভাল ক'রে জল দেবে, কারণ ঐ সময় মাটি বেশ ভিজে ও ঠাণ্ডা থাক্‌লে গাছটা খুব শীগ্‌গীর এবং সহজে মাটিতে লেগে যায়। তারপরে মাটি শুখ্‌নো দেখ্‌লে দরকার-মতন জল দেবে। দুপুর বেলা রোদের সময় কখনো গাছে জল দিও না, তা'হলে সর্দ্দি-গর্ম্মি হ'য়ে গাছ ম'রে যেতে পারে। বিকেলে রোদ প'ড়ে গেলেই গাছে জল দেবার সব চেয়ে ভাল সময়। সকালে রোদের তেজ হবার আগেও গাছে জল দিতে পারো। যে সময়ে গাছে ফুল হয় না, সে সময়ে রোজ জল দেবার কোনো দরকার নেই, —দু'-পাঁচ দিন অন্তর কিছু-কিছু জল দিলেই চলে। কিন্তু ফুল ধরার সময়ে গাছে রোজ বেশ ভাল ক'রে জল দেওয়া চাই, এই সময়ে গাছে যত ভাল ক'রে জল দেবে তত বেশী ফুল ফুটবে। বৃষ্টির পর বা দিন-কতক জল দেবার পর দেখ্‌বে যে মাটি চেপে ব'সে গেছে এবং ওপরটা শক্ত হ'য়ে গেছে। একে "সর পড়া" বা "চটা পড়া" বলে। মাটিতে চটা প'ড়লে গাছের ক্ষতি হয়, কারণ মাটির ভেতর হাওয়ার চলাচল হ'লে গাছের তেজ হয়, কিন্তু চটা প'ড়লে মাটির ভেতর হাওয়া ঢুক্‌তে পারে না; তা ছাড়া মাটি যত আল্‌গা থাকে গাছের শেকড় তত সহজে মাটির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং গাছের জোর হয়। সেই জন্যে চটা পড়লে নিড়ানি বা খুন্তি দিয়ে চটা ভেঙ্গে দেবে এবং মাঝে-মাঝে গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়ে বেশ আল্‌গা ক'রে দেবে।

ফুল ধরবার সময় যদি সপ্তাহে একদিন ক'রে গাছে গোবর-গোলা জল দিতে পারো তা'হ'লে গাছে খুব ফুল ফোটে। পাখীর গু ফুলগাছের খুব ভাল সার। যদি তোমাদের বাড়ীতে পায়রা বা অন্য কোনো পাখী থাকে, তাহ'লে তা'দের গু ফেলে দিও না, ঝি চাকরদের ব'লে দিও যেন রোজ ঝাঁটা দিয়ে এক জায়গায় জড়ো ক'রে রেখে দেয়। তারপর অনেকটা যোগাড় হ'লে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় দু'-তিন মুঠো ক'রে দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। তা'হলে তোমাদের ফুল গাছ ফুলে-ফুলে ছেয়ে যাবে।

নির্ম্মল দেব

ফুটবল খেলা

গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ময়দানে ফুটবল খেলা আরম্ভ হয়েছে। ফুটবল দেখবার আকর্ষনটা যেন আমাদের মধ্যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সে দিন মোহনবাগান ক্যালকাটার খেলায় ভীড় দেখে মনে হোল যে এত বড় জনতা আমরা এক সঙ্গে আর কখনও দেখি নাই। খেলা দেখবার জন্য সমস্ত সহরটা ভেঙ্গে পড়েছিল। সমস্ত কাজ নষ্ট করে পুলিসের গুতো খেয়ে, বেলা দুটো আড়াইটা থেকে রোদে পুড়ে গ্যালারীতে ঢোকা যে কঠিন ব্যাপার তা যারা খেলা দেখেছে তারাই জানে।

দর্শকের ভীড় যেমন বেড়ে চলেছে সেই অনুপাতে খেলোয়াড়ের দল তো তেমন বাড়তে দেখা যাচ্ছে না। মোহনবাগান এরিয়ান্স, ইত্যাদি ভাল ভাল বাঙ্গালী টিম যেন দিন দিন খারাপ হয়ে পড়ছে। এই সব টিম আর ভাল ভাল খেলোয়াড় জোগাড় করতে পারছে না। অর্থাৎ ভাল খেলোয়াড় আর তৈরী হচ্ছে না। এরা তাদের পুরোনো খেলোয়াড় নামিয়ে খেলছেন বটে কিন্তু তাতে আর সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। মোহনবাগানের গোষ্ট পাল, কুমার গাঙ্গুলী খুব ভাল পুরোনো খেলোয়াড়—কিন্তু সব খেলোয়াড়দের ভাল খেলাবার একটা সময় আছে—খেলোয়াড়-দের Form বলে একটা জিনিষ আছে—যা ক্রমে ক্রমে পড়ে যায়—সেই সময় এই সব খেলোয়াড়ের স্থানে নূতন খেলোয়াড় আনা বিশেষ দরকার—এখন বাঙ্গালী টিমে ভাল নূতন খেলোয়াড়ের বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে।

কলকাতায় যে লীগের খেলা সুরু হয়েছে তা দেখলে বোঝা যাবে যে বাঙ্গালী ফুটবলের দল ক্রমেই নেমে আসছে। বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের কতকগুলো দোষ আছে যে গুলো না শুধরে নিলে কোন কালেই তারা স্থায়ী জয় লাভ কোরতে পারবে না। অনেক সময় দেখা গেছে যে বাঙ্গালী টিম ভাল খেলেও কিছুতেই গোল দিতে পারে না। মোহনবাগানের খেলা দেখলে এ কথার সত্যতা প্রমান হবে। বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের shoot করবার, বল মারার অব্যর্থ সন্ধান, বল মারার মধ্যে জোর নাই।

গোল দেবার ক্ষমতা তাদের মোটেই নাই। গোলের কাছে বল নিয়ে নানা রকম কায়দা, নানা রকম "পাস", নানা রকম ঘোরাঘুরি বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা দেখাতে পারে। সেই সব দেখে আমরা গ্যালারীতে বসে খুব হাততালি দেই। কিন্তু গোল দিবার সময় মারটা এমন ক্ষীণ হয় যে বলটা হয়তো বিপক্ষের ব্যাকের পায়ের উপর গিয়ে পড়ে কিম্বা গোল কিপারের হাতে আস্তে একে পড়ে বড় জোর গোল পোষ্টের উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। গোলে বল মারার অভ্যাস করা বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এই সব বড় বড় টিমের খেলোয়াড়রা মনে করেন যে তাঁরা সবজান্তা—যখন কলকাতায় ফুটবল Season আরম্ভ হয় তখন তাঁরা একেবারে মাঠে ম্যাচ খেলতে নেমে পড়েন। রোজ শিক্ষার্থীর মত গোল মারা অভ্যাস করা তারা পছন্দ করেন না।

লীগে মোহনবাগান ডেলহাউসির খেলা। মোহনবাগান গোল দিয়েছে

এই জন্যে ইংরেজ খেলোয়াড়দের কাছ থেকে আমাদের অনেক শিক্ষা করবার আছে। ক্যালকাটা টিম মোহনবাগানের চেয়ে তেমন ভাল নয়। কিন্তু তাঁদের খেলায় এমন শৃঙ্খলা ও পদ্ধতি আছে যে তারা প্রায় সব খেলায় জেতেন। তাঁরা সবাই কি কোরে গোল দিতে হয় এটা ভাল কোরে রোজ অভ্যাস করে শিক্ষা কোরেছেন। তাঁরা খেলাটাকে একটা কাজ বলে মনে করে নেন।

বাঙ্গালীরা শিক্ষা কোরলে যে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলোয়াড় হতে পারে সেটা অনেকবার প্রমান হয়ে গিয়েছে। বল ঘোরাবার কায়দা, ক্ষিপ্রতা, যেমন তেমন অবস্থায় বল ঠিক কোরে মারা, আক্রমণ প্রতিহত করা, অদ্ভুত কৌশলে বল কেড়ে নেওয়া,—এ সবই বাঙ্গালীরা জানে। কেবল শিক্ষা ও উৎসাহ চাই। তাহলে বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা আবার আগের মত গৌরব লাভ কোরবে।

যা হোক এবারে বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের খারাপ বৎসর বলতে হবে। এবারের খেলা মনে হচ্ছে ভাল কাপ কিম্বা শিল্ড পাওয়ার আশা তাদের খুবই কম। তারপর দুই দিন বাদে বর্ষা নামছে—বর্ষায় বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা মোটেই খেলতে পারে না। ফুটবলটা বর্ষার খেলা—সাহেবদের সঙ্গে সমানে খেলতে হলে এই বর্ষায় বাঙ্গালীদের বুট পায়ে দিয়ে খেলা উচিত—এ কথা আমরা অনেকবার লিখেছি। কিন্তু কোন সুফল হয় নি। কোন বাঙ্গালী খেলোয়াড় বুট পায় দিয়ে খেলেন না। তার ফল হয়েছে এই যে মেঘ ডাকলেই বাঙ্গালী টিম অতি সামান্য সাহেবের দলের কাছে হেরে যায়।

মেঘদূতের মর্ত্তে আগমন

তেইশ

জয়, জয়, জয়!

বামনদের বাগে আনতে আমাদের বেশী বেগ পেতে হ'ল না। একেই তো তারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিল, তার উপরে তারা অস্ত্র ধরবার সময় পর্য্যন্ত পেলে

না! অস্ত্রগুলো আমরা আগেই কেড়ে নিলুম, তার পর তাদের সবাইকে ভেড়ার পালের মত তাড়িয়ে একটা ঘরের ভিতরে পূরে ফেললুম এবং ইসারায় জানিয়ে দিলুম যে, দুষ্টুমি করলে তারা কেউ প্রাণে বাঁচবে না!

বামনদের দলে লোক ছিল মোট আশী জন। মানুষের তুলনায় তারা এত দুর্ব্বল যে, আমরা ইচ্ছা করলেই তাদের সবাইকে টিপে মেরে ফেলতে পারতুম।

একটা বামন চেঁচিয়ে গোলমাল ক'রে উঠেছিল। কিন্তু কুমার তখনি তাকে খেলার পুতুলের মত মাটি থেকে তুলে মারলে এক আছাড়! তাকে হত্যা করবার ইচ্ছা কুমারের মোটেই ছিল না, কিন্তু সেই এক আছাড়েই বেচারীর ভবের লীলাখেলা সাঙ্গ হয়ে গেল একেবারে! লঘু পাপে গুরু দণ্ড!

আমরা দুঃখিত হলুম, কিন্তু হাতে হাতে এই কঠোর শাস্তি দেখে, অন্যান্য বামনরা দস্তুরমত ঢিট্ হয়ে গেল —সবাই বোবার মত চুপ ক'রে রইল।

বিমল বললে, "বিনয়বাবু, এইবারে এদের ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকে রসদ-টসদ যা আছে, লুটপাট ক'রে নেওয়া যাক্!"

আমি বললুম, "না, এইবারে আবার পৃথিবীর দিকে যাত্রা করা যাক্!"

বিমল, কুমার ও কমল একসঙ্গে ব'লে উঠল —"পৃথিবীর দিকে যাত্রা!"

রামহরি এত আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল যে, প্রকাণ্ড হা ক'রে আমার মুখের পানে স্বধু তাকিয়ে রইল—একটা কথা পর্য্যন্ত কইতে পারলে না!

আমি বললুম, "হ্যাঁ, এইবারে আমাদের পৃথিবীতে ফিরতে হবে, নইলে শীঘ্র আর ফেরবার সময় পাওয়া যাবে না, কারণ এখনো মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর কাছেই রয়েচে—যত দেরি করব, ততই সে দূরে চ'লে যাবে!"

কমল বললে, "কিন্তু যাব কি ক'রে, আমাদের তো ডানা নেই!"

আমি বললুম, "যেমন ক'রে এসেচি, তেম্নি ক'রেই যাব,—অর্থাৎ এই উড়োজাহাজে চ'ড়ে!"

বিমল বললে, "বিনয়বাবু, আপনি বোধ হয় মনের খুসিতে ভুলে গেছেন যে, আমরা কেউই এ উড়োজাহাজ চালাতে জানি না!"

আমি বললুম, "না, আমি কিছুই ভুলি নি! উড়োজাহাজখানা দেখেই আমার মাথায় এই নতুন ফন্দি জুটেচে! আমরা পৃথিবীতেই যাব আর এই উড়োজাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে ঐ বামনরাই!"

বিমল সানন্দে এক লম্ফ ত্যাগ ক'রে বললে "ঠিক, ঠিক! এতক্ষণে আমি বুঝেচি! বামনদের আমরা জোর করে আমাদের সারথি করব—কেমন, এই তো?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ। বামনরা এখন দলে হাল্‌কা হয়ে পড়েচে, সেপাইরা সব সহরে আছে। এই হচ্চে শুভ-মুহূর্ত্ত, প্রাণের ভয়ে ওরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রস্তাবে রাজি হবে!"

বিমল আনন্দে অধীর হয়ে বললে, "জয়, বিনয়বাবুর বুদ্ধির জয়!"

কুমার আমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে গদ গদ স্বরে বললে, "বিনয়বাবু, বিনয়বাবু, তাহ'লে আবার আমরা পৃথিবীতে ফিরতে পারব?"

কমল আর রামহরি পরস্পরের হাত ধ'রে অপূর্ব্ব এক নৃত্য সুরু ক'রে দিলে! তাদের দেখাদেখি বাঘারও ফুর্ত্তি বেড়ে উঠল, সেও লাফিয়ে লাফিয়ে হরেক-রকম নাচের কায়দা দেখাতে লাগল, আর এত জোরে ল্যাজ নাড়তে লাগল যে আমার মনে হ'ল, ল্যাজটা বুঝি এখনি ছিঁড়ে ঠিক্‌রে পড়্‌বে!

অন্যান্য সকলেও নানা ভাবে ও নানা ভঙ্গীতে আপন আপন মনের আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

আমি বল্‌লুম, "এখনি এতটা আহ্লাদ ক'রে কোন লাভ নেই! আগে দেখ, আমরা সত্যিই পৃথিবীতে গিয়ে পৌঁছতে পারি কিনা! তার উপরে বামনরা উড়োজাহাজ চালাতে রাজি হবে কিনা, এখনো তাও আমরা জানিনা!"

বিমল চোখ পাকিয়ে বললে, "কী! রাজি হবে না? তাহ'লে ওদের কারুকেই আমি আর আস্ত রাখ্‌ব না!"—ব'লেই বন্দুক বাগিয়ে সে বামনদের দিকে অগ্রসর হ'ল। আমরাও সদলবলে তার পিছনে পিছনে চল্‌লুম।

যে কয়জন বামন উড়োজাহাজের কল-ঘরে থাকত, পৃথিবী থেকে আসবার সময়ে আমরা তাদের অনেকবার দেখেছিলুম। তাদের পোষাক সেপাইদের

পোষাকের মতন নয়। সেই পোষাক দেখেই বিমল তাদের একে একে দল থেকে টেনে বার করলে। তারা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

উড়োজাহাজের কল-ঘর আমরা আগে থাকতেই জানতুম। বিমল ইঙ্গিতে তাদের সেইদিকে অগ্রসর হ'তে বললে। তারা সুড় সুড় ক'রে বিমলের আগে আগে চলতে লাগল।

কুমার ও আরো জনপনেরো লোককে বাকি বামনদের কাছে পাহারায় নিযুক্ত রেখে আমিও কল-ঘরের দিকে চললুম। উড়োজাহাজের প্রধান দরজা অনেকক্ষণ আগেই বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল।

সবাই কলঘরে গিয়ে ঢুকলুম। মস্ত ঘর। চারিদিকে নানান-রকম যন্ত্র রয়েছে—ছোট, বড়, মাঝারি। সমস্ত যন্ত্রই পাকা সোনায় তৈরি!

কমল বললে, "বিনয়বাবু, এই উড়োজাহাজে এত সোনা আছে যে, আমরা সবাই বড়লোক হয়ে যেতে পারি!"

আমি বললুম, "রও, আগে প্রাণে বেঁচে মানে মানে পৃথিবীতে ফিরে যাই, তারপর সোনাদানার কথা ভাবা যাবে অখন! এখন এ সোনার কোনই দাম নেই!"

বিমল কলের দিকে আঙুল দেখিয়ে, ইসারায় বামনদের কল চালাতে বললে। বিমলের ইসারা ও উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বামনদের মুখ শুকিয়ে গেল। তারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল!

বিমল ক্রুদ্ধভাবে আবার ইসারা করলে।

কিন্তু বামনরা তবুও যন্ত্রের দিকে এগুল না।

বিমল তখন বন্দুকটা তুলে বামনদের দিকে এগিয়ে গেল।

বন্দুক দেখেই তারা আৎকে উঠল, তারপর তীরের মত ছুটে গেল,—যন্ত্রগুলির দিকে! আর কারুকে কিছুই বলতে হ'ল না! এম্নি বন্দুকের মহিমা!

... ...

উড়োজাহাজ উপরে উঠতে লাগল—ধীরে, ধীরে, ধীরে!

বিপুল পুলকে আমিও আর চুপ ক'রে থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলুম,

"জয়, পৃথিবীর জয়!"—আমার জয়নাদে অন্য সকলেও যোগ দিলে। সে যে কি আনন্দ, লিখে তা জানানো যায় না!

উড়োজাহাজ আরো উপরে উঠল—আরো,—আরো উপরে!

স্বচ্ছ কক্ষতল দিয়ে দেখতে পেলুম, নীচে সহরের চারিদিকে বড় বড় আলো জ্ব'লে উঠেছে! নিশ্চয়ই উড়োজাহাজের শব্দে সহরের সকলের ঘুম ভেঙে গেছে! হয়তো এখনি শত শত উড়োজাহাজ আমাদের আক্রমণ করতে আসবে!

বিমল ইসারায় বাবংরার শাসিয়ে বলতে লাগল, উড়োজাহাজের গতি বাড়াবার জন্যে!... ... ...বামনরা কল টিপে উড়োজাহাজখানাকে ঠিক উল্কার মত বেগে চালিয়ে দিলে, দেখতে দেখতে সহরের আলোগুলো ঝাপ্‌সা হয়ে এল! আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম। কারণ সহরের উড়োজাহাজগুলো প্রস্তুত হবার আগেই আমরা বোধ হয় নাগালের বাইরে চ'লে যেতে পারব! বিশেষ, আমাদের উড়োজাহাজের আকার যে রকম বিশাল, তাতে এর সঙ্গে আর কোন উড়োজাহাজ পাল্লা দিতে পারবে ব'লে মনে তো হয় না!

সহরের খুব-অস্পষ্ট আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে আমি বললুম—বিদায় মঙ্গল-গ্রহ, তোমার কাছ থেকে চির-বিদায়! তোমার রক্ত-মরুভূমির কাছ থেকে, তোমার যুগল-চন্দ্রের কাছ থেকে, তোমার অপূর্ব্ব জীব-রাজ্যের কাছ থেকে আজ আমরা চির-বিদায় গ্রহণ করলুম! তোমার অনেক রহস্যই হয়তো জানা হ'ল না, কিন্তু যেটুকু দেখবার সুযোগ পেয়েছি, এ-জীবনের পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট, তোমাকে ভালো ক'রে জানবার জন্যে আর আমার কোনই আগ্রহ নেই! পৃথিবীর ডাক আমাদের কাণে এসে পৌঁচচ্ছে—বিদায় মঙ্গল-গ্রহ, চির-বিদায়!

চব্বিশ

আবার পৃথিবীতে

সব কথা আর খুঁটিয়ে না বললেও ক্ষতি নেই। কারণ আস্‌বার মুখে আজ-পর্য্যন্ত আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে-নি।

বামনদের উপরে আমরা পালা ক'রে দিন-রাত পাহারা দিয়েছি, কাজেই তারাও বাধ্য হয়ে বরাবর উড়োজাহাজ চালিয়ে এসেছে !

সোনার পৃথিবী এখন আমাদের চোখের উপরে ছবির মতন ভাস্‌ছে ! দেখতে দেখতে আমাদের চোখ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে !

আমরা পৃথিবীর কোন্ দেশে গিয়ে নাম্‌ব, তা জানি না ! কিন্তু যেখানেই নামি, আমাদের ইতিহাস নিয়ে যে সারা-পৃথিবীতে একটা মহা আন্দোলনের সূত্রপাত হবে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই ! আমাদের মুখের কথায় নিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাস করত না, কিন্তু এই অদ্ভুত উড়োজাহাজ আর বামনদের স্বচক্ষে দেখলে আর কেউ সন্দেহ করবার ওজরটুকু পর্য্যন্ত তুল্‌তে পারবে না !

বামনরা এসেছিল পৃথিবী থেকে নমুনা জোগাড় করতে। আমরাও আজ মঙ্গল থেকে অনেক বিচিত্র নমুনা নিয়ে ফিরে আসছি। স্তধু নমুনা সংগ্রহ নয়,—আমরা ফিরছি মঙ্গলকে জয় ক'রে ! মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব যে মঙ্গলে নেই, আমরা তা প্রমাণিত করেছি !

.. ..

কিন্তু, এ কি মুস্কিল ! শেষটা কি ঘাটে এসে নৌকা ডুববে ?

আমরা যখন পৃথিবীর খুব কাছে, আমাদের সকলেরই মুখে যখন নিশ্চিন্ত হাসির লীলা, চোখে যখন নির্ভয় শান্তির আভাস, তখন চারিদিক আঁধার ক'রে আচম্বিতে ঝড়ের এক ভৈরব মূর্ত্তি জেগে উঠল !

তেমন ঝড় আমি জীবনে কখনো দেখি-নি ! আমাদের এমন যে প্রকাণ্ড উড়োজাহাজ, ঠিক যেন ছেঁড়া পাতার টুক্‌রোর মতন ঝোড়ো হাওয়ার মুখে ঘুরতে ঘুরতে উড়ে চল্‌ল ! কোন্ রকমেই সে বাগ্ মানলে না! প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যু যেন আমাদের চোখের উপরে নৃত্য করতে লাগল !... ... ...

প্রায় চার ঘণ্টা ধ'রে আমাদের উড়োজাহাজ নিয়ে দিকে দিকে ছোঁড়াছুঁড়ি ক'রে ঝড়ের সখ যেন মিট্‌ল ! ধীরে ধীরে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস থেমে আসতে লাগল,

কিন্তু চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার তখনো একটুও কম্‌ল না! এ অন্ধকারে পৃথিবীতে নামাও নিরাপদ নয়!

অথচ আমরা নামতে না চাইলেও, উড়োজাহাজ যে ধীরে ধীরে নীচে নামচে, সেটা বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারলুম! বামনরা চেষ্টা ক'রেও তাকে আর উপরে তুলতে পারছে না,—নিশ্চয়ই ঝড়ের দাপটে কোন কল-কব্জা বিগ্‌ড়ে গেছে!

তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে, উড়োজাহাজ-খানা আস্তে আস্তে নামছে! নইলে পৃথিবীর উপরে আছড়ে প'ড়ে সে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত, আমাদেরও আর কিছু আশা-ভরসা থাক্‌ত না!

কিন্তু কোথায় আমরা নামছি—জলে, না স্থলে? অন্ধকারে কিছুই বুঝবার যো নেই!

যেখানেই নামি, এ যে আমাদের নিজেদের পৃথিবী, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই! এ একটা মস্ত সান্ত্বনা! মা-পৃথিবীর সবুজ বুক স্পর্শ করবার জন্যে প্রাণ আমার আনচান করতে লাগল!

হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে উড়োজাহাজ স্থির হয়ে দাঁড়াল!

আমরা আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছি!

আমরা সকলে মিলে জয়ধ্বনি ক'রে উঠলুম এবং তাই শুনে বামনরা যেন আরো মুষ্‌ড়ে পড়ল!

উড়োজাহাজের দরজা খুলে আমি বাইরের দিকে তাকালুম। একে রাত্রি, তায় আকাশ মেঘে ঢাকা! কাজেই দেখলুম খালি অন্ধকার আর অন্ধকার আর অন্ধকার!

রাত না পোয়ালে কিছুই দেখবার উপায় নেই। আমরা সাগ্রহে প্রভাতের অপেক্ষায় ব'সে রইলুম। খোলা দরজা দিয়ে মাঝে মাঝে দম্‌কা বাতাস এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে যাচ্ছিল। এ বাতাসকে আমি চিনি। এ আমাদের পৃথিবীর বাতাস! তাকে কি ভোলা যায়?... ... ...

ঐ ফুটে উঠছে ভোরের আলো,—পূর্ব্ব-আকাশের তলায় আশার একটি সাদা রেখার মত! আকাশের বুকে তখনও রাতের কালো ছায়া ঘুমিয়ে আছে এবং

সামনের দৃশ্য তখনো অন্ধকারের আস্তরণে ঢাকা। তবে, অন্ধকার এখন অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে বটে!

মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, পৃথিবীর সমস্তই আবছায়ার মতন,—এখনো গাছপালার সবুজ রং চোখের উপরে ভেসে ওঠে-নি!

বিমল, কুমার, কমল ও রামহরি আর থাকতে পারলে না, তারা তখনি উড়ো-জাহাজ ছেড়ে নেমে পড়ল। আমিও নীচে নামলুম—বাঘাও আমাদের সঙ্গ ছাড়লে না।

চলন্ত পাহাড়ের কালো ছায়া।

আঃ, কি আরাম! এত কাল পরে পৃথিবীর প্রথম স্পর্শ, সে যে কি মিষ্টি! মাটিতে পা দিয়েই টের পেলুম, আমরা স্বদেশে ফিরে এসেছি!

কমল তড়াক ক'রে এক লাফ মেরে বললে, "হ্যাঁ এ পৃথিবীই বটে! এক লাফে আমি আর তিন তালার সমান উঁচু হ'তে পারলুম না তো!"

খানিক তফাতে হঠাৎ কি একটা শব্দ হ'ল—দুড়ুম, দুড়ুম, দুড়ুম্! যেন ভীষণ ভারি পায়ের শব্দ!

আমরা সচমকে সামনের দিকে তাকালুম। অন্ধকারের আবরণ তখনো স'রে

যায়-নি, তবে একটু দূরে, প্রকাণ্ড একটা চলন্ত পাহাড়ের কালো ছায়ার মত কি-যেন চ'লে যাচ্ছে ব'লে মনে হ'ল।

বাঘা ভয়ানক জোরে ডেকে উঠল, আমরা সবাই স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলুম!

নিজেদের চোখকে যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহ'লে বলতে পারি, আমাদের সুমুখ দিয়ে যে জীবটা চ'লে যাচ্ছে, সেটা তালগাছের চেয়ে কম উঁচু হবে না! তার পায়ের তালে দেহের ভারে পৃথিবীর বুক ঘন ঘন কেঁপে উঠছে! ... .

মহাকায় জীবটা কোথায় মিলিয়ে গেল, কিন্তু তার চলার শব্দ তখনো শোনা যেতে লাগল—ছুড়ুম্, ছুড়ুম্, ছুড়ুম্!

বিমল শুষ্ক স্বরে বললে, "বিনয়বাবু!"

—"অ্যাঁ?"

—"ওটা কি?"

—"অন্ধকারে তো কিছুই দেখতে পেলুম না!"

—"কিন্তু যেটুকু দেখলুম, তাইই কি ভয়ানক নয়? এ আমরা কোথায় এলুম?"

—"পৃথিবীতে।"

—"কিন্তু এইমাত্র যাকে দেখলুম, সে কি পৃথিবীর জীব?"

আমিও অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম। ওদিকে আকাশের কোলে শুয়ে উষার চোখ ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মঙ্গলগ্রহের প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ হ'ল। এর পরে বিনয়বাবুর ডায়েরিতে যে কাহিনী আছে, তা আরো অপূর্ব্ব, আরো রহস্যময়! কিন্তু সে হ'চ্ছে নূতন একটি বিস্ময়কর গল্প,—পড়লে গা একেবারে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে! আসছে মাসের "মৌচাকে" তার প্রথম অংশ প্রকাশিত হবে।—মৌচাক-সম্পাদক।

আধ খানি চাঁদ

আধ খানি চাঁদ আধ খানি চাঁদ
কোথায় চল ভেসে !—
মেঘের আড়াল দিয়ে দিয়ে
কোন স্বপনের দেশে !
বাঁশ বনটার মথায় সে দিন
এক ফালি ত ছিলে
আর দু'ফালি এনে কে আজ
সঙ্গে জুড়ে দিলে !
নীল আকাশে ঝিকি মিকি
হাজার হাজার তারা
বনের পথে ঝিল্লীরা সব
ঢাল্‌ছে সুরের ধারা ।
গ্রামটী ঘুমোয় অকাতরে
খোকন মায়ের কোলে
আপন মনে আধ খানি চাঁদ
পড়ছ হেসে ঢলে ।
তোমার সাথে হাস্‌ব এমন
পরাণ খোলা হাসি
তোমার পাছে মেঘের দেশে
চল্‌ব আমি ভাসি

গাছের পাতায় কিরণ নাচে—
হাজার খেলার ছলে
হাজার চাঁদে নেচে বেড়ায়
অগাই পাথার জলে।
খাঁচায় ডাকে ময়না শালিক
ডাক্‌ছে বনে টিয়া
দম্‌কা বাতাস চল্‌ল ছুটে
ফুলের গন্ধ নিয়া।
আঁধার বনে জোনাকিরা
উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে
আধ খানি চাঁদ হেসে ভেসে
বেড়ায় মেঘের ফাঁকে।
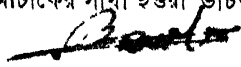
শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চিঠিপত্র

বৈশাখের মৌচাক পড়ে যে কত খুসী হয়েছি বল্‌তে পারি না। এবার দুটো রঙীন্ ছবি দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে, মৌচাক যে বাংলার শিশু মাসিকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তার পরিচয় সে জন্মের পর থেকেই দিয়ে এসেছে। ভাল ভাল লেখায় আর পাতার সংখ্যাও এ পর্য্যন্ত কেউ মৌচাকের সমকক্ষ হতে পারেনি। আমি প্রায় সব শিশু মাসিকগুলিই পড়ি। সমস্ত মৌচাকটা আমি দুবার, তিনবার, চারবার এমন কি তার চেয়েও বেশী বার করে পড়ি। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে গেলে অন্যান্য মাসিকগুলির অধিকাংশগুলিই আবার একবারের বেশী পড়তে ইচ্ছা করে না। কোন কোন গুলি আমি একেবারেই পড়ি না। এর কারণ অন্য সব মাসিকের গল্পগুলি নেহাৎ ছেলেমানুষি।...কাগজ ছাপা, মৌচাকের চেয়ে একটু ভাল হলেও লেখায়, পাতার সংখ্যায় সে মৌচাকের কাছে দাঁড়াতে পারে না। বৈশাখের

মৌচাকের পৃষ্ঠা হচ্ছে ৫২। প্রত্যেক মাসেই যদি এমনি করে থাকে তবে মৌচাক বছরে ৬০০ পৃষ্ঠায় গিয়ে দাঁড়াবে। অবিশ্যি এক মাসে বেশী অন্য মাসে কম হতে পারে। মৌচাক শিশু মাসিকগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে সব বাঙ্গালী ছেলেরা যে কোন শিশুমাসিক পড়েন তাদের সকলেরই মৌচাকের সাথী হওয়া উচিত।

শ্রীবানিকান্ত গুহ।

ভারতে প্রথম

এই সম্বন্ধে অনেক গ্রাহক গ্রাহিকারা নানা রকম খবর পাঠিয়েছেন। কিন্তু বেশীর ভাগই ভুল সংবাদ। অনেকে আমাদের কথা বুঝতে পারেন নি। অনেকেই বাংলার মধ্যে প্রথম বাঙ্গালীর নাম লিখে পাঠিয়েছেন। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে যে বিষয়ে বাঙ্গালী প্রথম হয়েছে তারই সংবাদ পাঠাতে হবে।

শ্রীমনোভিরাম বরুয়া—

ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম বাঙ্গালী এরোপ্লেনে চড়ে যুদ্ধ করেন—শ্রীইন্দ্রলাল রায়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন—

শ্রীমধুসুদন গুপ্ত সর্ব্বপ্রথমে মেডিক্যাল কলেজে মৃতদেহে অস্ত্রোপচার করেন।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি।

রাজা রামমোহন রায় প্রথম বিলাত যাত্রী।

প্রতিযোগিতা পুরস্কার

গল্প প্রতিযোগিতার পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমীরা চৌধুরী (কোটালপুকুর)। গল্পটী এ মাসে ছাপা হোল। শ্রীঅশোকা সেন লিখিত গল্পটীও ভাল হয়েছে। সেটাও এ মাসে ছাপা হোল।

নূতন প্রতিযোগিতা

আগামী মাসে আমরা ফটো প্রতিযোগিতার পুরস্কার দেব ঠিক করেছি। এ প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র মৌচাকের গ্রাহকগ্রাহিকাই ছবি পাঠাতে পারবেন

এবং ছবিগুলি তাঁদের নিজের তোলা হওয়া চাই। একজনে যতগুলি ইচ্ছা ছবি পাঠাতে পারেন। দুইটী পুরস্কার দেওয়া হবে। ১ম—১০ টাকা; ২য়—৫ টাকা। ছবিগুলি ২৫এ আষাঢ়ের মধ্যে আমাদের কাছে আসা চাই

নূতন ধাঁধাঁ

এই ছবিতে যতগুলি জিনিস আছে সব ‘ক’’ দিয়ে আরম্ভ। জিনিসগুলোর নাম কর তো!
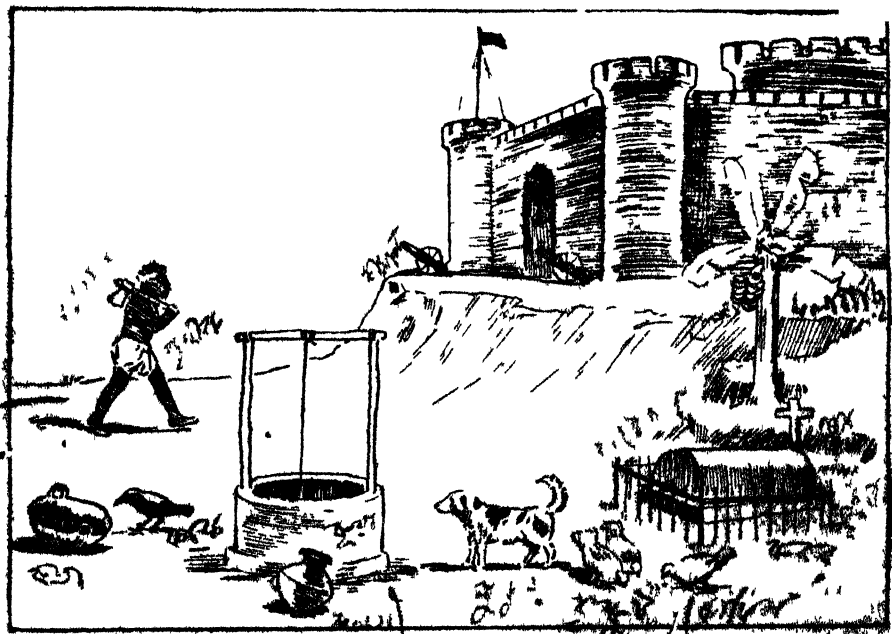
কলিকাতা—২১, কালিদাস সিংহের লেন, ফিনিক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅতীন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

শ্রাবণ, ১৩৩৩ । চতুর্থ সংখ্যা

শ্রাবণ-ধারা

কোথা কোন্
সাগর-তলে
গভীর জলে
সাঁতরে সারা বেলা

অগণন
মেঘ মাতালে
হাওয়ার পাছে
ভাসিয়ে এলো ভেলা ।

ঢেউয়েরা
ফেনার ফুলে
ওদের চুলে
পরিয়ে দেছে তাজ,

কে ওরা
যায স্বপনে
আপন মনে
নিরুদ্দেশে আজ!

পরণে
রক্ত চেলী
নয়ন মেলি
চায়না ফিরে কেউ

চরণে
নৃত্য দোলে
লহর তোলে
কোন্ সাগরের ঢেউ!

অনুদিন
আঁধার ঘরে
অলস ভরে
সূর্য্য আছে একা

জ্যোতিহীন
জলদ-জালে,
সাঁঝ সকালে
ক্ষণেক মেলে দেখা!

গড়ায়ে

চল্লরে মেঘ—

মনের আবেগ

নে যায় কতদূর

ছড়ায়ে

আকাশ ঢাকা

উদাস ফাঁকা

সঙ্গী-হারা সুর !

বারে বার

তড়িৎ ভুলে

ঘোমটা খুলে

চম্‌কে হেসে চায়

ওরে তার

আঁখির আলো

সকল কালো

ঝল্‌সে দিয়ে যায় !

হানে বাজ,

বিদ্যুতের এ

রঙ্গ হেরে

গর্জ্জে উঠে মেঘ

ছোটে আজ

আকাশ পারে

হুহুঙ্কারে

অসংযত বেগ !

যাচে কার
মিলন যেন
চাতক হেন
ফিরছে ঘন ডাকি
ব্যথা তার
গভীর রাতে
পূব্ হাওয়াতে
রাখতে নারে ঢাকি !
কাকে চায়
নীল বুরুজে—
পায়না খুঁজে,
কাজ্‌লা আঁখি পাতে,
ঝরে হায়
অশ্রু-ঝারা
শ্রাবণ-ধারা
বাদলা দিনে রাতে !

শ্রীনরেন্দ্র দেব

ইয়োরোপের চিঠি

পারি

পারিতে সব চেয়ে সুন্দর কি জিনিষ দেখেছি, যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহ'লে আমি বলব, লুভার মিউজিয়াম ! অনেকে বলেন, পৃথিবীতে এমন সুন্দর ছবি ও পাথরের মূর্ত্তির মিউজিয়াম আর নাই। সত্যই লুভার মিউজিয়াম যেমন সুন্দর তেমনি আশ্চর্য্যকর। এক সঙ্গে এতগুলি সুন্দর ছবি দেখা ভাগ্যের কথা। তা ছাড়া সুন্দর সুন্দর পাথরের মূর্ত্তি, নানা প্রকার কারুকার্য্যময় শিল্পদৃশ্য আছে।

লুভার বাড়ীটি প্রকাণ্ড, ৪০ একর জমি জুড়ে। তার একদিকে নিশ্চল শান্ত

সেন-নদী আর এক দিকে রু ছ্যো রিভোলি বলে একটি প্রসিদ্ধ রাস্তা। বাড়ীটি খুব জমকাল রকমের, তবে বাইরে থেকে দেখে মনে হয় না ভেতরে এমন সব সুন্দর জিনিষ আছে।

বাড়ীটি খুব পুরাতন। প্রায় সাতশ বছর আগে ফ্রান্সের এক রাজা এখানে একটি ছোট দুর্গ মতন গড়েন। তারপর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ফ্রান্সের নানা রাজা সেই বাড়ী বাড়িয়ে ভেঙে গড়ে এসেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে কার্ডিনাল রিচলিউ বলে ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী এই প্রাসাদ অনেক বাড়ান। এখন পৃথিবীর মধ্যে এটি একটি শ্রেষ্ঠ ও প্রকাণ্ড প্রাসাদ ও মিউজিয়াম।

এখানে ইয়োরোপের নানা দেশের নানা সময়ের অনেক বিখ্যাত চিত্রকরদের সুন্দর ছবি থাকে। লুভারে ঢুকে তার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘরে সুন্দর প্রকাণ্ড ছবি দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়।

মাতৃমূর্ত্তি

লুভারের একতলায় প্রায় সব ঘরে সুন্দর পাথরের মূর্ত্তি। নানা গ্রীক দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে, প্রাচীন ভাস্করদের খোদা। এদের মধ্যে ভেনস্ ছ্যো মিলো Venus de Millo র মূর্ত্তিটি হচ্ছে পৃথিবী বিখ্যাত। ভেনাস হচ্ছেন প্রেমের দেবী; এই মূর্ত্তিটি ১৮২০ খৃঃ অব্দে মেলো Melos বলে একটি দ্বীপে পাওয়া যায়। পাথরে গড়া এরূপ সুন্দর নিখুঁত নারী মূর্ত্তি পৃথিবীতে বড় নাই। মূর্ত্তিটির দুটি হাত ভাঙ্গা দেখছ, এইরূপ হাত ভাঙ্গা অবস্থায় মূর্ত্তিটি পাওয়া যায়। কোন অজানা শিল্পী কত বছর আগে এই মূর্ত্তিটি গড়েছিল আ কেউ জানে না। সে যখন

গড়েছিল, তখন সে স্বপ্নেও ভাবিনি তার গড়া এই প্রেমদেবী মূর্ত্তি একদিন জগৎ প্রসিদ্ধ হবে, দেশবিদেশের লোক তা দেখে অবাক হবে। অনেকের মত যে, খৃঃ জন্মের দু'শবছর আগে এই মূর্ত্তিটি গড়া। দুহাজার বছরের ওপর পুরাতন সেই সুন্দর মূর্ত্তিটি যতদিন পৃথিবীতে থাকবে ততদিন মানুষের মনে পরম সৌন্দর্য্য ও বিস্ময়ের ভাব জাগাবে।

লুভারের দোতোলা ও তেতোলা জুড়ে হাজার হাজার ছবি। তার মধ্যে কতক-গুলি ভাল ভাল ছবির কথা তোমাদের বলি।

ইয়োরোপের মধ্যে ইতালী দেশেই সর্ব্ব প্রথমে ভাল ছবি আঁকা সুরু হয়। ইতালীর চিত্রকরেরাই ছবি আকা সম্বন্ধে ইয়োরোপের আর সব দেশের চিত্রকর-দের গুরু বলতে পারা যায়। ইতালীর চিত্রকরদের মধ্যে রাফেল হচ্ছেন একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী। (১৪৮৩-১৫২০) তাঁর মাদোনা বা মাতৃমূর্ত্তির ছবি পৃথিবী প্রসিদ্ধ। লুভারে তাঁর যে ভার্জ্জিন Virgin বলে যে ছবিখানি আছে সেটিও সুন্দর। ছবিটি ১৫৯৬ খৃঃ অব্দে আঁকা। ভার্জ্জিনের মুখে কি স্নিগ্ধ কোমল স্নেহ ও প্রেমের ভাব।

মোনা লিসা

রাফেলের সময়ে ইতালীতে লিওনার্ড দ্যো ভিঞ্চি Leonard de Vinci বলে এক প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ছিলেন। তাঁর মোনা লিসা Mona Lisa বলে অতি সুন্দর একখানি ছবি লুভারে আছে। এ ছবি খানি জগৎ বিখ্যাত। এ ছবিখানির বিষয় ও অর্থ নিয়ে এত তর্কবিতর্ক লেখা-লেখি হয়েছে যে পৃথিবীর অন্য কোন ছবি নিয়ে তা বোধ হয় হয়নি। ছবিতে

গড়েছিল, তখন সে স্বপ্নেও ভাবিনি সে জগৎ প্রসিদ্ধ হবে, দেশবিদেশের লোক যে, খৃঃ জন্মের দু'শবছর আগে এই মূর্ত্তিটি সেই সুন্দর মূর্ত্তিটি যতদিন পৃথিবীতে থাকবে ও বিস্ময়ের ভাব জাগাবে।

লুভারের দোতোলা ও তেতোলা জুড়ে হাজার গুলি ভাল ভাল ছবির কথা তোমাদের বলি।

ইয়োরোপের মধ্যে ইতালী দেশেই সর্ব্ব ইতালীর চিত্রকরেরাই ছবি আঁকা সম্বন্ধে ইয়ো দের গুরু বলতে পারা যায়। ইতালীর চিত্রকর প্রসিদ্ধ শিল্পী। (১৪৮৩-১৫২০) তাঁর মা প্রসিদ্ধ। লুভারে তাঁর যে ভার্জ্জিন Virgin ব ছবিটি ১৪৯৬ খৃঃ অব্দে আঁকা। ভার্জ্জিনের মুখে কি স্নিগ্ধ কোমল স্নেহ ও প্রেমের ভাব।

রাফেলের সময়ে ইতালীতে লিওনার্ড দো ভিঞ্চি Leonard de Vinci বলে এক প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ছিলেন। তাঁর মোনা লিসা Mona Lisa বলে অতি সুন্দর একখানি ছবি লুভারে আছে। এ ছবি খানি জগৎ বিখ্যাত। এ ছবিখানির বিষয় ও অর্থ নিয়ে এত তর্কবিতর্ক লেখা-লেখি হয়েছে যে পৃথিবীর অন্য কো ছবি নিয়ে তা বোধ হয় হয়নি। ছবি

আর একটি সুন্দর ছবির কথা বলে ...let) নামক এক প্রসিদ্ধ ফরাসী চিত্রকরের আঁকা এক কৃষক দম্পতীর সন্ধ্যা-কালে প্রার্থনার ছবি। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, চারিদিক শান্ত স্তব্ধ—দূরে গির্জ্জায় ঘণ্টা বাজছে। একটি চাষা ও তার স্ত্রী সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে মাথা নত করে ভগবানকে প্রণাম করছে। তাদের প্রণত মূর্ত্তি বড় সুন্দর আঁকা। ছবিখানি দেখলে মনে হয় যেন রং এ রেখায় আঁকা

আছে, সব ভাল ছবির কথা বলতে তোমরা যখন বড় হবে, লুভার সম্বন্ধে অনেক বুঝতে পারবে!

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

নাহি হবার
ভাই দেখি,
কাছে আবার
দেবে ফাঁকি?

শোন্‌রে কেলো, জোটে, ভুলো,
চিংড়ি, রাণি, হাবল্‌
শেফা, হুলো, ননী. গুলো,
আন্‌ তো তোরা সাবল !
গর্ত্ত খুঁড়ে ঠ্যাংটা ধরে
আনরে কোলা ব্যাং
মুখটা চিরে, চিম্‌টে করে
টান্‌তো ঘ্যাঙ্গোর ঘ্যাং !
শুখনো মাঠে জলের ছিটে—
দিয়ে সবুর কর্‌।
যদি বটে গন্ধ উঠে—
বর্ষা এল ঘর !
চাতক ধরে, মেঘের স্তরে
যত মেয়ের দল
দেরে ছেড়ে ; ঘুরে ফিরে
হাঁকুক্‌ ফটিক্‌ জল।
কাগজ কেটে, দেরে এঁটে—
ব্যাঙের ছাতা করে,
ডেয়েব ঠোঁটে ডিম্‌টা সেঁটে
দেরে তারে ছেড়ে !
ঘুচিয়ে গরম, ঘাসটা নরম
ঘাসে শ্যাওলা কর
হুড়্‌ম্‌ হাড়াম্‌, দুড়ুম, দড়াম্‌
পা পিছ্‌লে পড়্‌!

ওপর দিকে আকাশ ঢেকে
কাল কালী ঢাল
কালর ফাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে
ছাড়রে বকের পাল !

হেঁকে ডেকে, মাঠে ঢেকে
একটি হাতে মাথা ;
ছোটরে দেখে আকাশ দিকে,—
আর এক হাতে জুতা !

হান্‌ল সজোর, ডাক্‌ল রে জোর
ছাতা কোথা পাই ?
গিজ্‌তা গিজোড়, গিজ্‌তা গিজোড়
বন্যা এল ভাই !

—বুড়ো ছেলে
বয়স উনষাট মাত্র

কপালের লেখা

(গল্প)

এক রাজা। ছেলের মতই প্রজাদের ভালোবাসেন। রাজ্যে কার কি দুঃখ নিজের চোখে দেখে বেড়ান, দূতের মুখে খপরটুকু নিয়েই নিশ্চিন্ত থাকেন না। ছদ্মবেশে পায়ে হেঁটে পথে-ঘাটে ঘুরে সকলের খোঁজ-খপর নেন। তাঁর দেশে খুঁজেই দুঃখ বড় একটা কারো নেই !

এমনি ঘুরতে ঘুরতে একদিন রাজ্যের সীমানায় এক নদীর তীরে এসে রাজা দেখেন, মস্ত বাড়ী—বাড়ীতে চাকর-বাকর লোকজন, গাড়ী-ঘোড়া গজ্ গজ্ করে

একেবারে। বাড়ীর মালিকের অগাধ টাকা, কোনো দুঃখ নেই, মনের আরামে কাল কাটাচ্ছে। আর এই বাড়ীর ঠিক পাশেই এক গরিবের কুঁড়ে। সব। দেওয়ালের মাটী খসে ঝরে পড়ছে, গোলপাতার চালে হাজার ফুটো, সেই ফুটো দিয়ে গ্রীষ্মের মাটীকাটা তপ্ত রোদ যেমন ঢোকে, বর্ষার বৃষ্টিও তেমনি তোড়ে ঝরে ঝরে পড়ে আর শীতের হিমেরও সেই ফুটোয তেমনি আনাগোনা চলে! পাশাপাশি এতখানি অবস্থার তফাৎ দেখে রাজা পরিচয় নিলেন।

পরিচয় নিয়ে জানলেন, এরা দু'ভাই। বড়টি বড়লোক, ছোটটি গরিব। বড়র ধন-দৌলত যেমন উপচে পড়ছে, ছোটর তেমনি অভাব। বড় নিত্য দু'বেলা রাজভোগ খাচ্ছে, ছোটর পেট ভরে দু বেলা আহার জোটে না! রাজার ভারী রাগ হলো। বড়কে গিয়ে বললেন,—কেমন লোক তুমি! মার পেটের ভাই, তার পানে চেয়েও ছাখো না! তুমি এমন আরামে সুখে আছ, আর ও বেচারার দিন চলে না! ছি!

বড় রাজার ছদ্মবেশ দেখে তাঁকে চিনতে পারেনি। বড় বললে,—ওকে ঢের সাহায্য করেছি,—টাকা দিয়েছি...আহার দিয়েছি...তবু ওর অভাব ঘোচেনি। ভগবান ওর বরাতে শূন্য লিখেচেন, মানুষ কি করবে?

রাজা বললেন,—এ'ও আবার কথা! মানুষকে মানুষই দেয়। ভগবান হাত-পা গড়ে ছেড়ে দেছেন। মানুষ হাতে রোজগার করবে, গরিবকে দান করবে, কারো আর দুঃখ থাকবে না! এর মধ্যে ভগবানকে এনে নিজের দোষ ঢাকতে চাও, বাপু!...

বড় বললে,—আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, ওকেই নয় ডেকে জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা বললেন,—বেশ, দু'ভাইয়ে এক বাড়াতেও থাকতে পারো তো···

বড় বললে,—ও রাজী নয়। ও বলে, মাথার উপর ঘরের কড়িকাঠ দেখলে ওর আতঙ্ক হয়—বড় বাড়ার বড় থাম দেখলে ওর ভয় লাগে, পাছে থাম ভেঙ্গে মাথায় পড়ে। ও কুঁড়ে ঘরে থাকতে ভালোবাসে! আমি কি করবো, বলুন?

রাজা ভাবলেন, এ তো ভারী মজার মানুষ! বড় বাড়াতে থাকতে ভয় হয় অথচ ঐ ভাঙ্গা চাল ফুটো কুঁড়েয় ওর এত আরাম! দেখতে হলো!

রাজা ছোটর কুঁড়েয় গেলেন—গিয়ে ছোটকে ডেকে বললেন,—তুমি বাপু তোমার দাদার সঙ্গে এক সঙ্গে থাকো না কেন? তোমার দাদার অত টাকাকড়ি, তা থাকতেও তুমি এত কষ্ট সইচো কি দুঃখে?

ছোট বললে,—ও লোকজনের ভিড়ে আমার হাঁফ ধরে!

রাজা বললেন,—বেশ, তার কাছ থেকে টাকাকড়ি তো নিতে পারো!

ছোট বললে—ভিক্ষে করবো কিসের জন্যে! নিজের হাত-পা রয়েছে...

রাজা বললেন,—ভিক্ষে আবার কি! নিজের ভাই, মার পেটের ভাই, বড় ভাই ..

ছোট বললে—তা হোক্—নিজের রোজগারের কাছে কিছু নয়...

রাজা বললেন,—এ কথা ঠিক! পর-প্রত্যাশী হওয়া ভালো নয়। মনের জোর থাকলে তবে মানুষ এমন কথা বলতে পারে। কিন্তু তুমি তো নিজেও কিছু রোজগার করতে পারো না...

ছোট বললে—কি করবো? বরাত! ভগবান যদি না দেন, আমি কি করতে পারি?

রাজা ভাবলেন, এতো ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার! ভগবান আবার দিতে আসবেন কি! মানুষকে তিনি বুদ্ধি দিয়েছেন, হাত-পা দিয়েছেন, তারি জোরে সে নিজে রোজগার করবে এর মধ্যে বরাতই বা কি, আর ভগবানকেই বা আনা কেন!

ছোট বললে,—ভগবান যার কপালে যা লিখবেন—তার আর নড়চড় হবার জো নেই!

রাজা বললেন,—আচ্ছা দেখি, মানুষ মানুষকে দিতে পারে কি না!

এই কথা বলে রাজা এলেন বড়র বাড়ীতে। বড় তখন বৈঠকখানায় বসে মস্ত গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছে।

রাজা বললেন,—হ্যাঁ, দেখে এলুম তোমার ভাইকে! তোমার দোষ নেই—ও যে গরিব হয়ে আছে, এ ওর নিজের দোষেই। দেখি, ওর কিছু করা যায় কি না!

রাজা বাড়ী ফিরে এলেন। ফিরে মন্ত্রীকে বললেন—আচ্ছা মন্ত্রী, টাকাকড়ি মানুষের বরাতে, না, নিজের শক্তিতে?

মন্ত্রী বলিলেন,—বরাত, মহারাজ !

রাজা বললেন,—তাও না কি হয় ! বরাত আবার কি ! মানুষের শক্তিই সব।

মন্ত্রী বললেন,—আমি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, মহারাজ ! বলে' মন্ত্রী গল্প বললেন,—এই রাজ্যে দুই বন্ধু ছিল—দুই বন্ধুই ছিল গরীবের ছেলে। একজনের নাম ধনদাস, আর একজন হলো জ্ঞানদাস। লেখাপড়ায় জ্ঞানদাস দিগ্‌গজ পণ্ডিত হলো, ধনদাসটা ছিল ফাজিল, গোঁয়ার ! সবাই বললে, জ্ঞানদাস খুব রোজগেরে হবে, এত বিদ্যে শিখছে, আর ধনদাসকে জ্ঞানদাসের দোরে দরোয়ানী করতে হবে !...বছর দশেক পরে দেখা গেল, জ্ঞানদাস ছোট একটি পাঠশালা স্কুলে ছেলে পড়াচ্ছে, রোজগার সামান্যই হয়।

রাজা বললেন—আর ধনদাস ?

মন্ত্রী বললেন,—ধনদাস বড় হয়ে অর্থকষ্ট সইতে না পেরে একদিন দুত্তোর বলে কোথায় চলে গেল। কোনো উদ্দেশ রইলো—তার লোকে ভাবলে, না খেতে পেয়ে ধনদাস মারা গেছে নিশ্চয়। শেষে দশ বছর পরে ধনদাস দেশে ফিরলো বড় বড় নৌকোয় নানা ঐশ্বর্য্য ভরে। ব্যাপার কি ? ধনদাস বললে,—বিদেশে গিয়ে সে চালানি ব্যবসা সুরু করে দশ বছরে ক্রোরপতি হয়ে উঠেছে ! কাজেই দেখছেন মহারাজ, বিদ্যাবুদ্ধিই সব নয়। ধনদাসের চেয়ে জ্ঞানদাসের বিদ্যাবুদ্ধি ঢের বেশী, অথচ টাকা করলে ধনদাস ! রাজা বললেন,—ধনদাসের বিদ্যা না থাকতে পারে, বুদ্ধি আছে—আর জ্ঞানদাসের বিদ্যেই আছে, বুদ্ধিশূন্য।

মন্ত্রী বললে,—কি করে তা বলি, মহারাজ ! জ্ঞানদাস পাড়ার লোককে নানা বিপদে বুদ্ধি জোগায় !

রাজা কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলেন।

সন্ধ্যার দিকে রাজা চুপি চুপি একটি থলেয় পাঁচশো মোহর ভরে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছোটর কুঁড়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ছোটকে ডেকে বললেন,—এই নাও থলে ; এর মধ্যে পাঁচশো মোহর আছে। এই নিয়ে বরাত ফেরাও [illegible] ! বলে থলিটি তাকে দিয়ে রাজা চলে এলেন।

ছোট তো অবাক ! কে এক অজানা লোক তার দোরে এসে যেচে [illegible]

পাঁচশো মোহর দিয়ে গেল! সত্যি? না, এ স্বপ্ন! ছোট থলি খুলে দেখে, সত্যিই মোহর বটে! একটি একটি গুণে দেখে, পাঁচশোও ঠিক! সে ভাবলে, এই পাঁচশো মোহর নিয়ে একটা দিন-ক্ষণ দেখে খুব লাভের ব্যবসা করবে, করে সেও এই কুঁড়ে ঘর ঐশ্বর্য্যতে ভরিয়ে তুলবে! কিন্তু এখন এ পাঁচশো মোহর কোথায় রাখা যায়? ঘরে? উঁহু যদি চুরি যায়? অনেক ভেবে সে মোহরের থলি নিয়ে চললো বরাবর নদীর ধার দিয়ে উত্তর মুখে! অন্ধকারে চারিদিক ভরে আসছিল। অন্ধকারে গা ঢেকে ছোট এসে দেখে, নদীর ধারে মস্ত এক বটগাছ—ইয়া

সত্যিই মোহর বটে!

ডালপালা, ঝাঁকড়া পাতায় 'আড়াল তুলে রয়েছে। ছোট সেই গাছে উঠে একটা ডালে থলিটা গামছা দিয়ে বেশ করে বেঁধে ভাবলে, মোহরগুলো বেশ নিরাপদে রইলো! এই ভেবে আরামের নিশ্বাস ফেলে সে বাড়ী ফিরে এলো। এসে বৌকে মোহরের কোনো কথাই বললে না, চুপচাপ রইলো!

* * *

তিন দিন পরের কথা। এ তিন দিন ছোট পাঁজি খুলে সারাক্ষণ শুভক্ষণ খুঁজছে ব্যবসার জন্য—পাঁজির পাতায় কেবলি দেখে লেখা আছে, যাত্রচন্দ্র, নব তের স্পর্শ, না, তো মঘা আর অশ্লেষা! সন্ধ্যার সময় ছোটর এক স্যাঙাত এসে হাজির, [illegible] কাপড়, হাত-পা-ছড়া ব্যাপার কি?

স্যাঙাৎ বললে,- আরে ভাই, সন্ধ্যার সময় খুব ঝড় উঠলো না! ঝড় দেখে আমি বটগাছের উপর চড়ে বসেছিলুম!

বটগাছ! ছোট বললে, –কোন্ বটগাছ?

স্যাঙাত বললে,—ঐ যে নদীর ধারে মস্ত ঝাঁকড়া গাছটা ..বড় বড় জট নেমেছে।

ছোট বললে,—ঐ যার একটা ডাল নুয়ে জলে গিয়ে ঠেকেছে!

স্যাঙাৎ বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

ছোট বললে—তার পর?

স্যাঙাৎ বললে—তা কি ঝড়; অমন যে মোটা বটের ডাল, তা ভেঙ্গে একেবারে জলে গিয়ে পড়লুম।

ছোটর তো দুই চক্ষু ছানাবড়া হয়ে উঠলো। সর্ব্বনাশ! সেই ডালেই যে তার মোহরগুলি থলিশুদ্ধ সে বেঁধে রেখে এসেছে! সে খাড়া দাঁড়িয়ে উঠলো।

স্যাঙাৎ বললে—ঝপাৎ করে জলে পড়ে ভাসতে ভাসতে কত দূর যে গিয়ে পড়লুম...

আর পড়া! ছোটর কানে সে কথা পৌঁছুলোও না! সে তো দে ছুট—সেই বটগাছের উদ্দেশে!

এসে দেখে, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। সে ডালের চিহ্নও নেই, তা তার মোহরের থলি! দু হাতে কপাল চাপড়ে ছোট তো সেইখানে মাটীতে মুখ থুবড়ে পড়লো। মাথার উপর দিয়ে সোঁ-সো করে ঝড় বিপুল গর্জ্জনে বয়ে চলেছে......

* * * * *

পরের দিন সকালে নদীতে স্নান করতে গিয়ে বড়র পায়ে কি একটা ঠেকলো! তুলে বড় দেখে, একটা থলি! খুলে দেখে, থলিটা মোহরে ভরা! ঘাটে উঠে থলি খুলে বড় গুণে দেখে, পাঁচশো মোহর...একেবারে সদ্য টেঁকশাল থেকে বেরিয়েছে —ঝক্‌ঝক্ করছে! বড় মহানন্দে মোহরের থলি নিয়ে ঘরে এলো!...

সাতদিন পরে রাজা এলেন খপর নিতে। ছোটকে জিজ্ঞাসা করলেন,—মোহরের খপর কি হে?

ছোট হাউ-হাউ করে কেঁদে সব কথা খুলে বললে। রাজা চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে বড়র বাড়ী এলেন। বড় সেদিন লোকজনদের খুব ধূমধামে ভোজ দিচ্ছে! রাজা বললেন,—হঠাৎ এ ভোজের কারণ?

বড় বললে,—ঘাটে সেদিন নাইতে গিয়ে একটা মোহরের থলি কুড়িয়ে পেয়েছি —পাঁচ-শো মোহর!

রাজা চমকে উঠলেন, বললেন,—থলিটা দেখি।

বড় থলি আনলে রাজা দেখেন, থলির কোণে তাঁর নামের হরফ লাল রেশমী সুতোয় বোনা রয়েছে! তাঁর আর সন্দেহ রইলো না, যে, এই মোহরের থলিই তিনি সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ছোটকে দিয়ে গিয়েছিলেন। ..রাজা আর কি বলবেন একটা নিশ্বাস ফেলে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

দু'দিন পরে রাজা আবার এসে দাঁড়ালেন বড়র দোরে, হাতে আর একটি মোহরের থলি!

রাজা বড়কে ডেকে বললেন,—এই থলির মধ্যে মোহর আছে—ছোটকে আমি দিতে চাই। তবে এমনি খোলাখুলি ভাবে না দিয়ে একটু অন্য ভাবে দেবো। পরখ করতেও চাই যে, বরাতের কোনো হাত আছে কি না!

বড় বললে, - বলুন! কি করতে চান!

রাজা বললেন,—এমনি আরো ন'টা থলি জোগাড় করে দাও। একটিতে ভর খোলামকুচি, একটিতে ভাঙ্গা পেরেক, ইট-পাটকেল, একটিতে ময়দা, একটিতে চাল, একটিতে আনাজ-তরকারী, এমনি সব নানান্ জিনিষ! তার পর ছোটকে ডেকে এর মধ্যে থেকে একটি বেছে নিতে বলবে। সে যদি মোহরের থলি নেয় তো তারই মোহর হবে, আর যদি মোহরের থলি ফেলে অন্য থলি নেয় তো মোহরের থলিটা তুমি পাবে!

বড় বললে—বেশ, আমি এখনি বন্দোবস্ত করছি।

বড় বড়মানুষ, তার কত লোকজন,—তখনি হুকুম করতে ঐ মাপে আরো নটা থলি এলো, তার কোনোটায় ময়দা, কোনোটায় চাল, কোনোটায় বা আনাজ-তরকারী

ভরে বড় ভাঁড়ারে রাখলে; রেখে ছোটকে ডেকে পাঠিয়ে বললে—এই সব থলের মধ্যে কোনোটায় চাল, কোনোটায় ডাল, কোনোটায় মোহর কোনোটায় ভুজিলাখর আছে, যেটা খুশী একটা থলি তুমি নাও।

ছোট ভাবলে, এবারে বেশ হুঁশিয়ার হয়ে থলি নিতে হবে! মোহরগুলো লোকসান হয়ে গেছে, যদি উশুল হয় এই থেকে! সে বাজিয়ে বাজিয়ে থলি ধরে যেটা বেশ বাজলো সেইটে নিয়ে ঘরে গেল। সে চলে গেলে রাজা তার সঙ্গে গেলেন,—গিয়ে দেখেন, ছোট থলি খুলেছে—থলির মধ্যে রাজ্যের যত নুড়ি, পাথরকুচি আর ইট-পাটকেল! ছোট রেগে কেঁদে একেবারে পাগল হযে উঠলো!

রাজা বললেন—এই থলিটি নিলে কেন বাপু! বাজিয়েই যখন নিলে,...

ছোট বললে,—ভারী দেখলুম তাই এটা নিলুম...

রাজা বললেন—নাঃ, তোমার সঙ্গে পারা গেল না দেখছি!...বলে রাজা বড়র বাড়ীতে এলেন। বড় বললে,—আপনার থলে এইটে। ভগবান আমার বরাতে টাকা লিখেচেন, টাকা আসবেই আমার কাছে!

রাজা বললেন—আচ্ছা, আর একবার দেখবো!

* * * * *

আবার এক হপ্তা পরে রাজা এসে ছোটর দোরে দাঁড়ালেন। ছোট তাঁকে দেখেই বলে উঠলো, —আবার কি মনে করে হে?, বেশ আছি, কেন আর টাকার লোভ দেখাও!

রাজা বললেন, —টাকাকড়ির লোভ দেখাতে আসিনি বন্ধু! রাজবাড়ীর বাগানে বড় বড় কুমড়ো হয়েছে, খাসা কুমড়ো। সেই কুমড়ো ওরা বিলুচ্ছে! একটা আনো না—বুঝে আনতে পার যদি তো বরাত ফিরে যাবে!

ছোট বললে,—চল! চালডাল তো মেলে না পয়সা না ফেললে! তা'র চেয়ে একটা কুমড়ো নিয়ে আসি, তাতে দু'-চার দিন পেটটা চলে যেতে পারে!

ছোটকে নিয়ে রাজা বাগানে এলেন! বাগানে সত্যি অঢেল কুমড়ো গাদা হয়ে আছে—যে সে এসে একটা একটা নিয়ে চলে যাচ্ছে, কারো মানা নেই।

রাজা ছোটকে এনে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে নিজে মালীর ঘরে গেলেন, গিয়ে একটা কুমড়ো ফাঁসিয়ে তার মধ্যে পাঁচশো টাকার একখানি নোট রেখে কুমড়োটাকে জোড়াতালি দিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধলেন, বেঁধে ছোটর হাতে দিয়ে বললেন: আমি নিজে বেছে দিলুম—এই নাও কুমড়ো। এতে তোমার বরাত ফিরতে পারে!

নিজে বেছে নিতে পারলে না বলে ছোটর মেজাজ একটু বেঁকে ছিল। তার উপর এই ফাটা দড়ি-বাঁধা কুমড়ো! তবু কোন কথা না বলে সে রাজার দেওয়া কুমড়ো মাথায় করে কুঁড়েয় ফিরে এলো এসে বৌকে বললে—এই নে কুমড়ো! রেখে দে—ক'দিন খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না।

কুমড়োটা বৌকে দিয়ে ছোট গেল স্নান করতে। বৌ সেদিন কুমড়ো বিলির খপর পেয়ে আগেই গিয়ে একটা কুমড়ো এনে ছিল বেশ মস্ত ডাগর একটি কুমড়ো। সে ভাবলে, যে কুমড়ো এনেছি তা এখন হেসে খেলে চার-পাঁচ দিন চলবে এটাকে ঘরে রেখে পচাই কেন! তার চেয়ে বেচে দি, তবু কিছু পয়সা হাতে হবে। সে পয়সায় তেলটা নুনটাও কেনা যাবে। এই ভেবে ছোটর আনা কুমড়োটা নিয়ে সে বড়র বাড়ী ছুটলো। এসে বড়র বৌকে ডেকে বললে,—দিদি, আমাদের ঘরে কুমড়ো বেশী আছে, তা একটা তুমি নিয়ে যদি দাম দাও, তাই এনেছি। আমার পয়সার কিছু দরকার।

ছোট জা...পয়সার কষ্ট ওদের—আচ্ছা! বড়র বৌ কুমড়োটা নিয়ে ছোট বৌয়ের হাতে একটি টাকা দিলে! ছোট বৌ খুশী হয়ে তেল-নুন কিনে কুঁড়েয় ফিরলো।

তেল নুন দেখে ছোট বললে,—এ কেনবার পয়সা পেলি কোথায়?

ছোট বললে,—আমি একটা কুমড়ো এনেছিলুম—বেশ ডাগর পুরুষ্টু কুমড়ো! তা এটা মিছে পচে কেন, তাই বেচে একটা টাকা পেয়েছি!

ছোট বললে—বেশ করেছিস্!

সন্ধ্যার দিকে রাজা এসে হাজির। ছোটকে বললেন,—কুমড়ো খেলে?

ছোট বললে,—খেয়েছি!

রাজা বললেন – কিছু পেলে ?

ছোট বললে—কি আর পাবো ! সেটা বেচে এক টাকা নগদ ! ধন্যবাদ, বন্ধু !

রাজা ধমকে উঠলেন। সর্ব্বনাশ—সে কুমড়োর মধ্যে পাঁচশো টাকার নোট গোঁজা ছিল যে। রাজা বললেন, – কোথায় বেচলে ? কাকে বেচলে ?

ছোট বললে —বড়র বৌয়ের কাছে।

রাজা বললেন, –বেশ করেছ। তার মধ্যে পাঁচশো টাকার নোট ছিল যে রে হতভাগা !

পাঁচশো টাকার নোট। ছোট ককিয়ে কেঁদে উঠলো !

রাজা বললেন,—না বাপু তোমায় পয়সা দিয়ে খুশী করা মানুষের কর্ম্ম নয় সত্যই ! তোমার বরাতে পয়সা লেখা নেই। বলে রাজা বড়র বাড়ী এলেন। সেখানে আবার ভোজের ভারী ধূম।

বড় বললে– এসো বন্ধু, আজ এখানে খেয়ে যাও। একটা কুমড়ো কিনেছিল বৌ আজ। তার মধ্যে থেকে পাঁচশো টাকার নোট বেরিয়েছে। তা নিজেই ভোগ করবো ! লোকজনকে খাইয়ে আমোদ করচি ভাই !

রাজা বললেন —তোমার কথাই দেখচি ঠিক ! টাকা ভগবানই দেন মানুষকে,— মানুষ দিতে পারে না !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কাজ-কম্ম

ঢলঢলে তার কাচ্‌কোঁচাটা, হলহলে তার জামা
ভেঁপু বাজায় রাঙ্গা-মাসি তার, ঢাক পেটে তার মামা।
সিঙ্গাড়া খায় ছোট পিসি তার, সেজদা খায় ঘোল
বৌদিদি তার বাবার টাকে কেবল ঘসে ওল।

ন'পিসে তার ঘোরায় চাকা, বড়্দা বাজায় ভুঁড়ি
ন'জেঠিমা চিলের ছাতে কেবল ওড়ায় ঘুড়ি।
ন'মেসো তাব চালিয়ে ঘানি বাহির করে তেল
ছোট-কাকা তার ডিগ্‌বাজি খায় কামড়ে কাঁচা বেল।
বড-পিসে তার দাড়িব উকুন চিমটি কেটে মারে
ন'মামা তাব গোঁফ কটিকে সাজায় সাবে সাবে।
হ্যাংলা-হোচাং ভাইপোটা তার বেড়ায কি সব দেখে
বৌদিদি তার ঘোমটা টানে মোষেব ছাযা দেখে।
হ্যাং-হ্যাংলা ভাইঝিটা তার পেট ফুলিয়ে কাঁদে
ক্যাবলা-ক্যাচাং বোনপোটা তাব সুড্‌সুড়ি ছ্যায চাঁদে।
মেজ্-কাকা তার নাকে পালক হ্যাচ্চো হ্যাঁচাং হাঁচে
হরিখুড়ো তাব ঘচ্চা-ঘচাং বাঁশ বাখাবি চাঁচে।

. . ... .

কাজেব সময হঠাৎ কেন খোকন-মণি জাগে ?
কাজকম্ম সবই দেখি ঘুমেব দেশে ভাগে!
তারপবেতে খোকন সোণা খিল্‌খিলিযে হাসে —
কচি-মুক্তা দাঁতেব পাঁতি চাঁদেব আলোয় ভাসে॥

শ্রীহেমন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

ন'পিসে তার ঘোরায় চাকা, ব

ন'জেঠিমা চিলের ছাতে কেবল

ন'মেসো তার চালিয়ে ঘানি ব।

ছোট-কাকা তার ডিগ্‌বাজি খায় ক

বড়-পিসে তার দাড়ির উকুন চিমটি

ন'মামা তার গোঁফ কটিকে সাজায় সা

হ্যাংলা-হোচাং ভাইপোটা তার বেড়ায় ফি

বৌদিদি তার ঘোমটা টানে মোষের ছায়া

হ্যাং-হ্যাংলা ভাইঝিটা তার পেট ফুলিয়ে কাঁ।

ক্যাব্‌লা-ক্যাচাং বোন্‌পোটা তার সুড়্‌সুড়ি খা

মেজ্‌-কাকা তার নাকে পালক হ্যাচ্চো হ্যাচাং হ

হরিখুড়ো তার ঘচ্চা-ঘচাং বাঁশ বাখারি চাঁচে।

পরও এই টাকা তাঁর জামার পকেটে

লোভে চৌধুরী মহাশয়কে খুন করত, তা

তারা এক সপ্তাহ কালীগ্রামে বসে

ধান প্রজাদের মধ্যে দান করবার

কথা তিনি কারুর কাছে প্রকাশ

লোক জানতে পারে যে,

নেক টাকা থাকে। এই

খুন করবার পরে তারা

ও আশপাশের গ্রামে

পড়্‌ল না। শেষ

.. ..

কাজের সময় হঠাৎ কেন খোকন-মণি জাগে?

কাজকম্ম সবই দেখি ঘুমের দেশে ভাগে!

তারপরেতে খোকন সোণা খিল্‌খিলিয়ে হাসে —

কচি মুক্তা দাঁতের পাঁতি চাঁদের আলোয় ভাসে॥

শ্রীহেমন্ত কুমার চট্টোপা

প্রথমে অতি সামান্য

সামান্য কয়েকঘর

খাওয়া-পরা চল্‌ত।

তাঁদের একমাত্র

হাঁর ভক্ত ছিল

এমন সময়

তাঁর ঝগড়া

ড়া কোরে

।

স কাজে

কালী

দ কিছুই

পেলে না তখন টাকা কোথায় আছে তা দেখিয়ে দেবার জন্য কালীনারায়ণ ও তাঁর স্ত্রীর ওপর অত্যাচার সুরু করলে। সে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কালীনারায়ণের স্ত্রী তখুনি মারা গেলেন। কালীনারায়ণ কয়েকদিন শয্যাশায়ী থেকে আবার বেঁচে উঠলেন।

গ্রামের মধ্যে এত বড় বড় লোক থাকতে সবার কালীনারায়ণের বাড়ীতে কেন যে ডাকাতি হোলো তার কারণ বুঝতে কারুর বাকী থাকল না। কিন্তু এত অত্যাচারে কোরেও জমিদারের আক্রোশ মিটল না। কালীনারায়ণের কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল জমিদারেরা ছল কোরে সেটুকুও কেড়ে নিলে।

এই রকমে নানাদিক দিয়ে বিপদের ওপর বিপদে ব্রাহ্মণ ব্যতিব্যস্ত হোয়ে একদিন দুর্গোর বলে তিনি তাঁর একমাত্র ছেলে দুর্গানারায়ণের হাত ধরে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

কালীনারায়ণ ছেলেটার হাত ধরে চলেছেন। কোথায় যাবেন কিছু ঠিক নেই; রাত্রে কোনো গ্রামে কারো বাড়ীতে অতিথি হন। তখন তো আজকালের মতন দিন কাল পড়ে-নি ব্রাহ্মণ ঘরে এলে সকলে আদর কোরে রাখত। একরাত্রির বেশী কোথাও তিনি থাকেন না সকাল হোলেই আবার চলতে আরম্ভ করেন। এই রকম প্রায় তিন মাস চলার পর একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি এক গ্রামের ধারে একটা বটগাছের তলায় আশ্রয় নিলেন। গ্রামখানিতে ভদ্রলোকের বাস একেবারে ছিল না। যারা থাকত তারা জাতে খুবই নীচু ছিল বটে কিন্তু প্রাণ ছিল তাদের দরাজ আর ছিল তারা বলিষ্ঠ ও সাহসী। ব্রাহ্মণ গাছতলায় শুয়ে আছেন দেখে তারা কালীনারায়ণকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গ্রামের মধ্যে আশ্রয় দিলে।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে বাংলা দেশ ভয়ানক অরাজক ছিল। চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা যার যা খুসী তাই করত। জোর যার মুল্লুক তার এই ছিল তখন দেশের অবস্থা।

কালীনারায়ণ কিছুদিন এই গ্রামে বাস করতেই সেখানকার সমস্ত লোকই তাঁর অত্যন্ত

অনুগত হোয়ে পড়ল। শেষকালে তিনি সেখানকার লোকদের নিয়ে একটি ডাকাতের দল গঠন কোরে বাংলা দেশের নানা জায়গায় ডাকাতি করতে সুরু করলেন।

সেই ধীর স্থির, পূজারী ব্রাহ্মণ কেমন কোরে যে ডাকাতে পরিণত হোলো তার ইতিহাস কেউ বলতে পারে না। কালীনারায়ণ ডাকাতের দল গঠন কোরে প্রথমেই গেল তার নিজের গ্রামে। তারপরে যে জমিদারের অত্যাচারে সে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল হঠাৎ একদিন সেই বাড়ী আক্রমণ কোরে তাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন কোরে নিয়ে চলে গেল।

কয়েক বছরের মধ্যেই কালী ডাকাতের নাম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। ডাকাতি করতে যাবার আগে সে টাকা চেয়ে চিঠি পাঠাত। ভালয় ভালয় টাকা না পাঠালে পরে আর রক্ষা ছিল না।

এই রকমে ডাকাতি কোরে কালীনারায়ণ বিস্তর টাকা উপায় করলে আর সেই টাকায় বড় বড় জমিদারী কিনতে লাগল। কালীনারায়ণের অনুগত সর্দ্দাররাও ক্রমে বেশ অর্থশালী হোয়ে উঠল। কালীনারায়ণ এত ধনী ও প্রতাপশালী লোক হোলো

সর্দ্দারেরা বল্লে ব্যবসা বন্ধ দাও
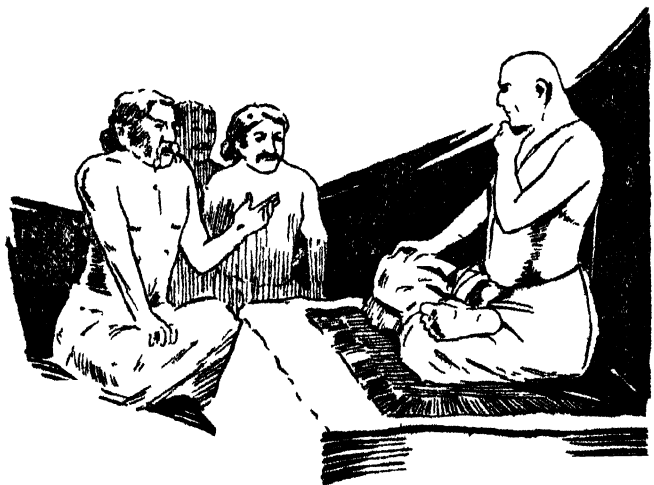
বটে কিন্তু তার অনুগত লোকদের মাঝে সেই ছোট্ট কুটীরখানি সে ছাড়তে পারছিল না। শেষকালে তার দলের জনকয়েক সর্দ্দাররা এসে তাকে জানালে যে ইংরেজরা এখন ডাকাত ধরবার দিকে মনোযোগ দিয়েছে ; হয় এই বেলা এখান থেকে সরে পড়ে অন্যত্র গিয়ে বাস করতে হয়. আর না হয় ডাকাতি ছাড়্তে হয়।

কালীনারায়ণ অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলে এখান থেকে সরে পড়াই মঙ্গল। কারণ এখানে চিরকালের জন্য বসবাস করতে হোলে কুটীরে থাক্‌লে চল্‌বে না। অথচ যেখানে সে আত্মগোপন কোরে অতি গরীবের মতন থাক্‌ত হঠাৎ সেখানে বড় বাড়ী ফাঁদ্‌লে লোকের মনে সন্দেহ হোতে পারে! এই ভেবে খুব নির্জ্জন অথচ সুবিধা মতন থাকবার জায়গা ঠিক করবার জন্য দেশে-দেশে তার চর পাঠিয়ে দিলে।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

নক্ষত্রের কথা

রাত্রিবেলা আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় কে যেন একখানা চুম্‌কি-কাটা নীল ওড়্না আমাদের মাথার ওপর বিছিয়ে দিয়েছে। 'নক্ষত্রগুলোকে এত ছোট দ্যাখায়। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, বাস্তবিক তারা কি তাই? আমরা বোলে উঠ্‌ব— না, তা নয়। ওরা খু-ব দূরে আছে বোলে ওদেরকে অত ছোট দ্যাখায়। প্রকৃত পক্ষে এক একটা নক্ষত্র এক একটা প্রকাণ্ড জগৎ। আমাদের পৃথিবীর চাইতে শত শত-গুণ-বড়, এমন কি সূর্য্যের অপেক্ষাও পাঁচ, সাত, দশ, বিশ, একশ গুণ বড়। তাই যদি হয়, তা হ'লে সমস্ত বিশ্ব জগতের মধ্যে সব চাইতে কোন নক্ষত্রটা বড়, আর সেটা কেমন বড় এটা জানতে সকলকারই একটা কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। সেই কথাটাই আজ আমি বোলতে চাই।

আমরা জানি যে, সূর্য্য এই পৃথিবীতে অনেক বছর—সে অমন কোটী কোটী বছর ধরে আলো, উত্তাপ সব দিয়ে আসছে। এই সারা বিশ্বের মধ্যে সূর্য্যটাকেই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা বড়, আর একটা হোমরা-চোমরা গোছের কিছু বলে মেনে নিই। কিন্তু প্রকৃত কথা বোলতে গেলে সূর্য্যের অপেক্ষাও অমন অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নক্ষত্র আছে, আর সেগুলো আমাদের কাছ থেকে এত দূরে অবস্থান কোরছে যে বেশ ক্ষমতাপন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাও তাদের কোন তল্লাসই আমরা কোরতে পারি না। তাদের সঙ্গে তুলনায় আমাদের সূর্য্যটাকে একটা সামান্য আগুনের স্ফুলিঙ্গ বোলে মনে হয়।

সূর্য্যটা যে কেমন ছোট তা এই উদাহরণ থেকেই বুঝতে পারা যাবে। মনে কর, তোমার মটর গাড়ী চড়ে তুমি অনন্তকাল ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছ। এই ভাবে যদি তুমি ঘণ্টায় ৩০ ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করো, তা হলে ১৭ দিন ৮ ঘণ্টায় পৃথিবীর বিষুব রেখাটীকে, আর ৫ বছরের একটু অল্প সময়ের পূর্ব্বেই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ কোরে আসতে পারবে। কিন্তু য়্যাণ্টারিসকে (Anteres), যেটাকে আমরা এখনকার সময়ে সব চাইতে বড় নক্ষত্র বোলে জানতে পেরেছি, ঘুরে আসতে হ'লে তোমার সর্ব্বাপেক্ষা বেগবান মটরে কত সময় লাগবে জান? প্রায় ১৩৭০ বছর! একবার বুঝে ছ্যাখ কি ব্যাপার! উপমাটা এখন বুঝলে ত? আবার তার ব্যাসের পরিমাপও পাওয়া গ্যাছে সেটা ১৩৬৫০০০০০ ক্রোশ। সূর্য্যের ব্যাসের তিনশগুণের চাইতেও বড়। এইত য়্যাণ্টারিস্। এটা আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নক্ষত্রদের অন্যতম। কলেনগুইজ্ এবং আল্‌ফাহার কিউলিস্ এরাও য়্যাণ্টারিসের যমজ ভাই আর কি! তারা এক একটা কত-বড় জান? সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ কোরে আসতে—পৃথিবী যে সুবৃহৎ বৃত্তটী ঘোরেন তার মধ্যে তাদের একটীরও স্থানের সঙ্কুলান হওয়া সম্ভবপর নয়। পৃথিবীর কক্ষ (orbit) ৯'০০০০০০ ক্রোশ; য়্যাণ্টারিসের ব্যাস ১৩৬৫০০০০০ ক্রোশ।

এই সব আগুনের গোলার কথা মনে কোরতে গেলে আমাদের কল্পনার দৌড়কে হার মানতে হয়। এদের কথা ভাবতে ভাবতে স্বতঃই আমাদের মনে হয় —

গুলোর আয়তনের কি কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে? যদিই বা কিছু থাকে, তাহ'লে একটা নক্ষত্র আয়তনে কত বড় পর্য্যন্ত হ'তে পারে?

এ সব প্রশ্নের উত্তরগুলো এ,. এস, এডিংটন্ নামক একজন বিলাতী বৈজ্ঞানিক বেশ বিচক্ষণ ভাবেই দিয়েছেন।

এডিংটন সাহেব বলেন যে মাস্ (mass) হিসাবে যে নক্ষত্রটা সূর্য্যের অপেক্ষা ৫০ গুণ বড় সেইটেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় নক্ষত্র। তার চাইতে বড় নক্ষত্র আর হ'তে পারে না। যদি হয়, তাহলে সেটা ফেটে চূরমার হ'য়ে যাবে। কেন না তাদের ভেতরকার চাপের (Pressure from within) সঙ্গে আবর্ত্তনের দরুণ কেন্দ্রাপসারী শক্তির (centrifugal form) যোগ হ'য়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটার—যার বলে তারা পরস্পরকে আকর্ষণ কোরে রেখেছে—সঙ্গিত ভাব সাম্যের বিঘ্ন উপস্থিত কোরবে।

এ থেকে আমরা বেশ বুঝতে পারছি যে নক্ষত্রের 'মাস্' (mass) ইহার সংগঠিত উপাদানের ওপর নির্ভর কোরছে, আয়তনের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নাই। আমাদের 'বন্ধু' য়্যাণ্টারিস্ সূর্য্যের অপেক্ষায় শতগুণ বড় হ'লেও এর (mass) সূর্য্যের (mass) ৫০ গুণের মধ্যে—তার চাইতে বেশী নয়।

আধুনিক কালের খুব সূক্ষ্ম পরিমাপ যন্ত্রের (Michelson's interferometer, spectrometer and improved photographic apparatus.) সাহায্যে এডিংটন্, নক্ষত্রের আলোক বিকীরণ (Light radiation) এবং তার কারণ সম্বন্ধে গবেষণা কোরতে কোরতে এই চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন। তিনি জানতে পারেন যে আমাদের সূর্য্যের অপেক্ষা যে নক্ষত্র দেড়গুণ বড় তার মধ্যস্থলের তাপ ইংরাজি তাপমান যন্ত্রের ৮৫৫০০০০ ডিগ্রী। আর মধ্যস্থলের প্রতিবর্গ ইঞ্চির চাপ ৩০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড বা ২১০০০০০০ য়্যাটমস্ফিয়ার।

এইত গেল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নক্ষত্রের কথা। এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের বিষয় কি? এডিংটন্ সে বিষয়েও বোলেছেন। তিনি জান্তে পেরেছেন, যেমন নক্ষত্রের বড় হবার একটা সীমা আছে, তেমনি তাদের ক্ষুদ্রত্বের দিক দিয়েও একটা সীমা

আছে। তিনি আবিষ্কার কোরেছেন যে, যে নক্ষত্র আমাদের সূর্য্যের এক সপ্তাংশের অপেক্ষাও ছোট সে আর কিরণ দেবে না। কারণ তার উপরিভাগের উত্তাপ ৫৪০০ ডিগ্রীর বেশী নয়। আর এর অপেক্ষা কম উত্তাপযুক্ত নক্ষত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই রকম কত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র আছে তাদের সংখ্যা আমাদের গণনার অসাধ্য। তার কারণ সব চাইতে ক্ষমতাপন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাও তারা দৃষ্টিগোচর হয় না। আল্‌ফা সেণ্টারীর (Alpha Centauri) অদূরে যে নক্ষত্রটা আছে সেইটাই এখনকার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট নক্ষত্র বোলে জানতে পারা গেছে। সেটা আমাদের সূর্য্যের ৬০০০০০ অংশের একাংশ আলো দিয়ে থাকে। এদের ব্যাস ৭৭৫০০ হ'তে-২৯০০০০ ক্রোশের মধ্যে। কাজেই সূর্য্যের চাইতে কত যে ছোট তাহা সহজেই অনুমেয়। সূর্য্যের ব্যাস ৪৩২৬৭৫ ক্রোশ।

আধুনিক নানা রকম নূতন নূতন যন্ত্রের সাহায্যে ঘটনাচক্রে আমাদের সূর্য্যের সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলদ্দীপক ঘটনা জানতে পারা গেছে। যেমন, এডিংটন্ গণনা কোরে জান্‌তে পেরেছেন, যে এক সময়ে সূর্য্যের উপরিভাগের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উত্তাপ ছিল ইংরাজি তাপমান যন্ত্রের ১৬২০০ ডিগ্রী, আর এখন ১০৮০০ ডিগ্রী হয়েছে। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে যে আমাদের সূর্য্যটা একটা নক্ষত্র মাত্র, আর সেটাও আবার ক্রমশ নিষ্প্রভ হ'য়ে আস্‌ছে।

এতে কিন্তু ভয় পাবার আমাদের কোন কারণ নেই। কারণ সূর্য্য ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হ'য়ে এলেও, আমাদের কোন ক্ষতি কোরতে পারবে না। আর আমাদের ক্ষতি করবার মত নিষ্প্রভ হ'য়ে আস্‌তে গেলে, তার সে কত লক্ষ কোটী বছর সময় লাগবে তার ইয়ত্তা নেই।

এক বিষয়ে সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হ'তে পারে, যে সূর্য্য এত তাপ পাচ্ছে কোথা থেকে। এ বিষয়েও জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত কোরে গ্যাছেন। আমরা যেমন কয়লা পুড়িয়ে তাপ পাই সূর্য্য সে রকম কোন উপায়ে তাপ পাচ্ছে না। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতদের অনুমান, সে সূর্য্যের মধ্যেকার দ্রব্য-সমূহ সজোরে

ফেটে গিয়ে এর সংগঠিত উপাদানের অনু পরমাণুতে পরিণত হওয়ার দরুণ অত উত্তাপ বেড়ে চলেছে।

এই সব কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সূর্য্যের শক্তির ভাণ্ডার অফুরন্ত। সূর্য্য তার আস্ পাশের গ্রহ উপগ্রহগুলোকে অনন্তকাল ধরে উত্তাপ যুগিয়ে আস্‌ছে এবং এখনও আশা করা যায়, যে যুগযুগান্তর ধরে যুগিয়ে চল্‌বে।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

ময়নামতীর মায়াকানন*

এক

অপূর্ব্ব পৃথিবী

ঊষার চোখ ক্রমেই ফুটে উঠছে!.........কিন্তু পৃথিবী তখনও আপনার বুকের উপর থেকে আবছায়ার চাদরখানি খুলে রেখে দেয়-নি!

যেদিকে সেই মহাকায় জীবটা চ'লে গেল, সেই দিকে হতভম্বের মতন তাকিয়ে আমরা কয়জনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি!

আচম্বিতে আর এক পরিচিত শব্দে আমরা সকলেই চম্‌কে উঠলুম! যেন হাজার হাজার শ্লেটের উপরে কারো হাজার হাজার পেন্সিল টানছে আর টানছে!

এক লহমায় আমাদের আড়ষ্ট ভাব ঘুচে গেল!

কুমার সর্ব্বাগ্রে চেঁচিয়ে উঠল "বামনদের উড়োজাহাজ!"

---

* বিমলবাবুর ডায়ারিতে এখান থেকে এক নূতন উপন্যাস আরম্ভ হ'ল। গোড়াতেই ব'লে রাখা ভালো, এ উপন্যাসেও বৈজ্ঞানিক সত্যকে যথাসম্ভব মেনে চলা হবে। এর-মধ্যে পাঠকরা আমাদের এই প্রাচীনা পৃথিবীর এক নূতন ছবি দেখতে পাবেন। মৌচাক-সম্পাদক

বিমল বললে, "সে কি কথা! উড়োজাহাজ তো বিকল হয়ে পৃথিবীতে এসে নেমেচে, মেরামত না করলে তো আর উড়তে পারবে না!"

রামহরি আকাশের দিকে হাত তুলে বললে, "ঐ দেখ খোকাবাবু!"

আমাদের চোখের সামনে দিয়ে বিপুল একটা কালো ছায়া ঠিক বিদ্যুতের মতন বেগে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে!—হাঁ, এতো মঙ্গলগ্রহের উড়োজাহাজই বটে!

কুমার বললে, "কি সর্ব্বনাশ! অনেক মানুষ যে ওর মধ্যে আছে!"

কমল তাড়াতাড়ি বললে, "কুমারবাবু, বন্দুক ছুঁড়ুন বন্দুক ছুঁড়ুন!" বিমল হতাশভাবে বললে, "আর মিছে চেষ্টা! বামনরা আমাদের চোখে ধুলো দিয়েচে, উড়োজাহাজ বন্দুকের বাহিরে চলে গেছে!"

এরি-মধ্যে উড়োজাহাজখানা আকাশের গায়ে প্রায় মিলিয়ে যাবার মতন হ'য়েছে —না জানি কতই বেগেই সেখানে উড়ে চলেছে!

ভোরের আলো তখন মাটির বুকেও নেমে এসেছে এবং অন্ধকার স'রে যাচ্ছে বন-জঙ্গলের ভিতর দিকে!

আমি বললুম, "বামনরা যে কি ক'রে চম্পট দিলে, কিছুই তো বুঝতে পারচি না, অতগুলো লোককে আমরা তো তাদের উপরে পাহারায় রেখে এসেছি!"

বিমল বললে—"বোধ হয় বন্দুক নিয়ে আমরা চলে আসাতেই বামনদের সাহস বেড়েচে, তারা মানুষদের আক্রমণ করেচে!"

সম্ভব। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই, চল, যেখানে উড়োজাহাজ এসে নেমেছিল, সেখানটা একবার দেখে আসি!"

জায়গা বেশী দূরে নিশ্চয়ই নয়! আমরা যেদিক থেকে এসেছিলুম আবার সেইদিকেই চললুম।

তখন চারিদিক দিব্য ফরসা হয়ে এসেচে। কিন্তু চোখের সুমুখে যে সব দৃশ্য দেখছি তা একেবারে অপূর্ব্ব!

পশ্চিমদিকে পাহাড়ের পর পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ভোরের আলোতে স্নান করছে! পাহাড়গুলোর উপরে উদ্ভিদের চিহ্ন নেই, কিন্তু তলাতেই নীল অরণ্য!

পূর্ব্বদিকে মস্ত-একটা প্রান্তর ধূ ধূ করছে—মাঝে মাঝে এক-একটা গাছের কুঞ্জ। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, অত-বড় মাঠের কোথাও একগাছা ঘাসের নামগন্ধও নেই। মাঠের একপাশ দিয়ে একটা চিক্‌চিকে রেখা এঁকে বেঁকে কোথায় চ'লে গেছে—নিশ্চয়ই নদী।

উত্তরদিকেও বন জঙ্গল আর গাছপালা। অধিকাংশ গাছই ছোট ছোট; তাদের আকার এমন অদ্ভুত যে, পৃথিবীর কোন গাছের সঙ্গেই মেলে না!

দক্ষিণদিকে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে, অনেক দূরে জলের উপরে সূর্য্য কিরণের ঝিকিমিকি! জলের নীল রং দেখে আন্দাজ করলুম, সমুদ্র।

আমাদের পায়ের তলাতে যে জমি রয়েছে তা অত্যন্ত কঠিন, প্রায় পাথর বললেই চলে—সেখানেও ঘাসের চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে এক-একটা ঝোপের ভিতরে অজানা নানারকম আশ্চর্য্য ফুল ফুটে আছে, যে-সব ফুলের কোনটাই আকারে ছোট নয়, আর তাদের সকলেরই বোঁটায় বড় বড় কাঁটা!

বিমল কৌতুহলী চোখে চারিদিকে চাইতে চাইতে বললে, "কি আশ্চর্য্য বিনয়বাবু, এ আমরা কোন দেশে এলুম? এমন ভোরের বেলা, একটা পাখী পর্য্যন্ত ডাকচে না!"

কুমার বললে, "এমন বন জঙ্গল, অথচ একটা ফড়িং কি প্রজাপতি পর্য্যন্ত উড়চে না!"

বাস্তবিক, এ বড় অসম্ভব ব্যাপার! চারিদিকে কোথায় কোন জীবের সাড়া বা চিহ্ন নেই!

আমি বললুম "এ যেন ময়নামতীর মায়াকানন।"

কমল বললে, "সে আবার কি?"

"প্রাচীনকালে বাংলা দেশে মাণিকচন্দ্র ব'লে এক রাজা ছিলেন। ময়নামতী তাঁর রাণী। প্রবাদ আছে, ময়নামতী ডাকিনী-বিদ্যা শিখে গুরুর বরে অমর হ'য়েচে। এখানে এসে আমার মনে হচ্চে, এ যেন সেই ময়নামতীর মায়াপুরী কীটপতঙ্গ পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত ভয়ে এখানে দেখা দেয় না!"

রামহরি এতক্ষণ সকলের আগে আগে পথ চল্‌ছিল, আমার কথা শুনেই সে মুখ শুকিয়ে সকলের পিছনে এসে দাঁড়াল!

আমি হেসে বললুম, "কি হ'ল হে রামহরি, হঠাৎ পিছিয়ে পড়লে কেন ?"

—"আজ্ঞে, আপনার কথা শুনে।"

"কেন, কি কথা ?"

—ঐ যে বললেন এ বন হচ্চে ময়নামতীর মায়াকানন। বুড়ী ময়নার গল্প আমিও জানি বাবু! সে বনকে সহর করত, সহরকে বন করত, ভেড়াকে মানুষ আবার মানুষ ভেড়া বানাত! যত ভূত-প্রেত আর ডাকিনী-যোগিনী তার কথায় উঠত-বসত।"

—"রামহরি, অতি সহজে তুমি ভয় পাও কেন ? আমি যা বললুম তা' কথার কথা মাত্র!"

—"ভয় পাই কি সাধে ? যে বিপদ থেকে সবে পার পেয়েচি, আমি তার কিছুই অসম্ভব মনে করি না! কে জানে এ আবার কোন মুল্লুকে এলুম—পৃথিবীর সঙ্গে এর তো কিছুই মিলচে না! যেখানে পাখী নেই, প্রজাপতি নেই, ফড়িং নেই, সে কি পৃথিবী ? এই শেষ রাতে চোখের সামনে দিয়ে পাহাড়ের মতন কি একটা চ'লে গেল, পৃথিবীতে কি সেই রকম কোন জীব থাকে ?

আমি আর কোন জবাব দিলুম না।

বিমল বললে, "বিনয়বাবু, আমাদের উড়োজাহাজ কোথায় এসে নেমেছিল, আমরা বোধ হয় তা আর ঠিক করতে পারব না।"

আমি বললুম, "আমারও তাই মনে হ'চ্চে। অন্ধকারে আমরা কোথায় নেমেছিলুম, এখন তা বোঝা শক্ত।"

রামহরি দরদ-ভরা গলায় বললে "আহা, উড়োজাহাজের ভেতরে যে মানুষগুলো ছিল, তাদের দশা কি হবে ?"

কমল বললে, "যার অদৃষ্টে যা আছে! তাদের আবার মঙ্গল গ্রহে ফিরে যেতে হবে,—আর কি!"

কুমার বললে, "এখন ও-সব বাজে কথা রেখে নিজেদের কথা ভাবো। আমাদের অদৃষ্টও খুব ভালো ব'লে মনে হচ্চে না! কিন্তু ও কি! বিমল, বিমল!"
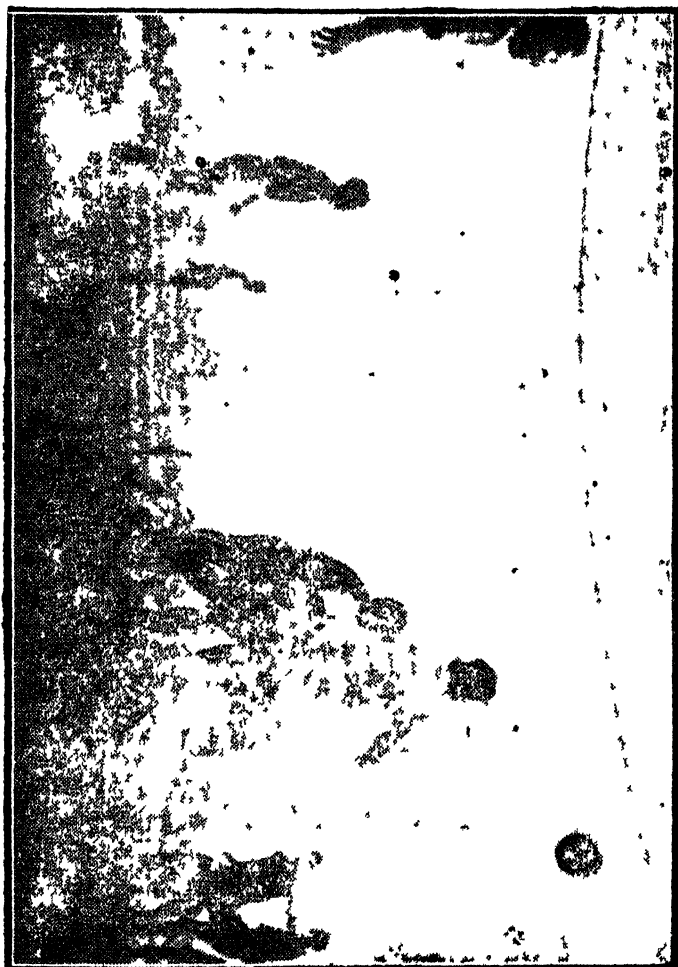
কি হবে। তাই একজন ইংরেজ লিখেছে 'What will happen if the day ever dawns — as it surely must — when the Indians learn to score with the same facility that they have learnt to dribble

মাঠে শিল্ড খেলা আরম্ভ হয়েছে। এক মোহনবাগান ছাড়া অন্যান্য বাঙালী দল সবই হেরে গিয়েছে। প্রথম খেলায় মোহনবাগান প্রিন্স অফ ওয়েলস ভলান-টিয়ারসকে ছয় গোলে আর উইল্টশায়ারকে দুই গোলে হারিয়েছে। আশা করা যায় এবার শিল্ডে মোহনবাগান খুব ভাল খেল্‌বে।

চিঠিপত্র

মাস্তবর সম্পাদক মহাশয়,—

পূর্ব্ব হইতে শিশু মাসিক পত্রিকা মৌচাক ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর হইতেছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। স্বভাবতঃই কোন পদার্থের উন্নতিলাভ দেখিলে হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয়। সেই জন্যই আমাদিগের সাত বৎসর বয়স্ক শিশু মৌচাকের ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়া ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি। ঈশ্বর দিন দিন ইহাকে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া আমাদিগকে প্রতি বৎসর প্রতি মাসে দান করিয়া আনন্দিত করুন ইহাই প্রার্থনা।

আজ কয়েকটি বিষয় আপনাদিগকে জানাইতে ও জানিতে চাই ?

(১) মৌচাকে যেরূপ ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহা দ্বারা কোমলমতি বালক বালিকা, যাহাদিগের চিত্তের বিকাশ হয় নাই তাহাদিগের কোনও রূপ উপকার সাধিত হইবে কি ?

অবশ্য প্রবন্ধ বা গল্প যাহা উহাতে সন্নিবেশিত করা হয় তাহা সকলই যে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় লিখিত হইবে ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। তথাপি লেখক যেরূপ ভাষায় তাহার গল্প বা প্রবন্ধ মুদ্রণের নিমিত্ত প্রেরণ করেন সেই ভাষাই মুদ্রিত দেখিতে ইচ্ছা হওয়াই তাহাদিগের স্বাভাবিক। আমি জানি যে একটি বালিকা প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধ বা গল্প লিখিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিল কিন্তু তাহার মুদ্রিত প্রবন্ধ বা গল্পের ভাষা এরূপ ভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে তাহার নকল যাহা সে রাখিয়াছিল তাহা পড়িলে আর অপরটি পড়িবার ইচ্ছা একেবারেই হয় না। সুতরাং লেখক বা লেখিকা যেরূপ ভাষায় প্রবন্ধ প্রভৃতি পাঠাইয়া থাকেন সেই ভাষাই মুদ্রিত হয় ইহাই আমাদিগের ইচ্ছা। যদি কোনও প্রবন্ধের কোন স্থানে ভাষার লালিত্যের হানি হয় তবে (অভিধান সম্মত) শুদ্ধ করিলে আপত্তির কোন কারণ নাই।

ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেকটি মাসিক পত্রই আমাদিগের সাহিত্য আলোচনার এক একটি ক্ষেত্র। ইহার মধ্য দিয়াই সামাজিক, নৈতিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি সকল প্রকার আলোচনা করা হয়। প্রধানতঃ শিশু মাসিক পত্রিকা দ্বারাই শিশুগণ সাহিত্যের সহিত পরিচিত হয়। সুতরাং ইহার মধ্যে দিয়া তাহাদিগের ভাষার লালিত্য ও চিন্তাশক্তির বিকাশ হয় ইহাই আমাদিগের কাম্য এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই মাসিকের এই উপকার স্মরণ করিয়া শিশুদিগকে উহা পড়িতে দেন।

(২) মৌচাকে, ভ্রমণবৃত্তান্ত, ঐতিহাসিক ঘটনা, বিজ্ঞান, শিশুদিগকে অল্পপরিমাণে

প্রাঞ্জল ভাষায় জানাইলে তাহাদিগের যে মহৎ উপকার সাধন হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। প্রশ্নোত্তর, প্রাকৃতিক আশ্চর্য্য ঘটনা প্রভৃতিও কিছু কিছু থাকিলে ভাল হয়। তবে এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় এত প্রকার বিষয়ের স্থান সঙ্কুলান হইবে না, ইহাই আশঙ্কা।

গত বৈশাখ মাস ব্যতীত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় প্রত্যেক মাসের মৌচাক পচিশটি পাতার সমষ্টি, তাহার মধ্যে জ্যৈষ্ঠে তিন পাতা বিজ্ঞাপন ও প্রথম পাতায় ছবি, আষাঢ়ে ৪ পাতা বিজ্ঞাপন ও প্রথম পাতায় ছবি। ২০।২১ পাতা বাকী থাকে। তন্মধ্যে ৮ পাতা গল্প থাকিলেই যথেষ্ট, অবশ্য বাজে গল্প নয়। যেমন, "মেঘদূতের মর্ত্ত্যে আগমন" "কর্ত্তার বাড়ীর যাত্রা" "ভীষণ স্নেহ," সবিনা মদন চক্রবর্ত্তী, "প্রতিজ্ঞা পালন" ইত্যাদি এরূপ ধরণের থাকে ইহাই ইচ্ছা। যদি কোন গল্প বৃহৎ হয় তবে একবারে শেষ না করিয়া কয়েকবারে শেষ করিলেই অন্যান্য প্রবন্ধের স্থান হইতে পারে।

চিত্রের বিষয় আর একটি বক্তব্য আছে প্রথম পৃষ্ঠায় যে ছবি থাকে সাধারণতঃ প্রত্যেক শিশু মাসিকেই তাহা বহুবর্ণের। কিন্তু মৌচাকে তাহার অভাব; গত বৈশাখে দুইটি বহুবর্ণের চিত্র ছিল, সেইরূপ কোনও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বহুবর্ণের চিত্র থাকিলে ভাল বোধ হয়।

আশা করি আমাদিগের এই প্রস্তাবনাতে আপনাদিগের কোন আপত্তি থাকিবে না, যদি কোন আপত্তি থাকে তাহা হইতে তাহা কিসের নিমিত্ত জানাইলে সুখী হইব অন্য গ্রাহক ও গ্রাহিকাদিগেরও এ বিষয়ে কি মত জানা প্রয়োজন।

সংযুক্তা দেবী

(উত্তর)

মৌচাকের ভাষা, বাংলা ভাষা। এই ভাষাতেই আমরা কথা বলি ও এই ভাষা বুঝতে পারি। কথা বলার ভাষা ও লেখার ভাষা আলাদা হওয়া উচিত নয়। শুধু শিশু কেন, সমস্ত বাংলা সাহিত্যই এই ভাষাতেই লেখবার চেষ্টা হচ্ছে, হবে এবং হওয়া উচিত।

দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কিছুই লেখা বাঞ্ছনীয় নয়। সকলে যাতে বুঝতে পারে এমন ভাষাতে প্রবন্ধ অথবা গল্প রচিত হওয়া প্রয়োজন। পত্র লেখিকা যে বালিকাটীর প্রবন্ধ বা গল্পের কথা উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে আমরা সে গল্প বা প্রবন্ধকে কোনো রকমে বিকৃত করি-নি। পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন বোধেই হয়ত তা করা হয়ে থাকবে এবং আমাদের বিশ্বাস যে সে পরিবর্ত্তনের দ্বারা গল্প বা প্রবন্ধের উন্নতিই হয়েছে। লেখিকা বলেছেন যে সে গল্প বা প্রবন্ধটী প্রকাশ হওয়ার পর আর সেটি পড়তেই ইচ্ছা করে না। আমরা তাঁকে অনুরোধ করছি যে তিনি আরও কিছুদিন সাহিত্য-সাধনা করুন তখন বুঝতে পারবেন যে সেই পরিবর্ত্তনের কতখানি প্রয়োজন ছিল।

মৌচাকে প্রতিমাসে অন্ততঃ চল্লিশ পৃষ্ঠা পড়বার বিষয় থাকে। এর থেকে কেটে বিজ্ঞাপন বাড়ান হয় না।

বহুবর্ণের চিত্র প্রতিমাসে প্রকাশ করবার মত অবস্থা মৌচাকের এখনও হয়-নি, তবুও

৭ম বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৩৩ [পঞ্চম সংখ্যা

বর্ষা বিক্রম

বর্ষা কি আসে ঐ কাল মেঘ উড়িয়ে ?
চট্‌পট্‌ ছুটে চল্‌ বাড়ী পানে এগিয়ে ;
থাক্‌ আজ খেলাধূলো গোলা-গুলি-ডাণ্ডা,
গরম খিচুরী খেয়ে মন করো ঠাণ্ডা ;
ভিজে জামা খুলে ফেলে খিল্‌ কর্‌ বন্ধ,
চুপচাপ্‌ বসে থাক কপাল যে মন্দ !
আঁখি মেলে চেয়ে দেখ জানালার বাহিরে,
পুলকের ভঙ্গীতে তাল-বন দোলেরে ;
আঙ্গিনায় যুঁই ফুল ভরপুর সুবাসে,
ভিজে মাটি গন্ধ উচ্ছ্বল বাতাসে ;
প্রলয়ের হুঙ্কারে এ ভুবন স্তব্ধ
হরদম্‌ দমাদম্‌ কিসের এ শব্দ !

দৈত্যের সাথে আজ ইন্দ্রের ঝগড়া,
স্বরগের ঘরে তাই কোলাহল হররা ;
সাজ সাজ রব ওঠে যেতে হবে সমরে.
রাজা হয়ে সাজা একি প্রাণ বুঝি যায় রে !
বার বার এ বিবাদ দেবতা ও দৈত্যে
আদিকাল হতে জানা স্বরগে ও মর্ত্যে ;
কি বিষম লোভ ওরে মুকুটের কারণে,
যেতে হবে শেষকালে যমরাজ সদনে ;
দৈত্যটা আসে ঐ ঝুঁটি নেড়ে লাফিয়ে,
ইন্দ্রের মাথাটাকে দেবে আজ ফাটিয়ে ;
তেত্রিশ কোটি দেব কাঁপে আজ তরাসে,
অবিরাম ঝুটোপুটি কুলোয় না সাহসে ;
ঐ শোনো গুরু গুরু অস্ত্রের ঘর্ষণ,
মারামারি কাটাকাটি রক্তের বর্ষণ ;
কলিকালে লাল রং কার শাপে ভাল হয় ?
ভেল্কি ম্যাজিক নাকি ? তাতে কিছু ভুল নয় !
দৈত্যের রাঙা আঁখি বিদ্যুৎ ঝলকে,
বিশ্বটা যায় বুঝি চক্ষের পলকে ;
মুখ বুজে বসে থাক গোলমাল আর না ;
ওরে খোকা, জল মোছ্ চুপ কর কান্না ;
নয় হার জিত হবে ঘাব্ড়োনা মান্‌কে,
আজ যদি নাই হয়, হবে তাহা কাল্‌কে ;
ঐ দেখ ঝরঝর বর্ষণ মন্দ,
গুরু গুরু গর্জ্জন হয়ে আসে বন্ধ ;
কালো কালো মেঘগুলো দৈত্যের ছায়া ঐ

ভয়ে ভয়ে কোথা গেল খুঁজে আর পাই কৈ ?
ইন্দ্র কি বজ্র হেনেছিল বুকে তার ?
একেবারে কুপোকাৎ দানবের সর্দ্দার !
জিত কার ? দেবতার ! জয়ের আনন্দ,
স্বরগেতে বাজে আজ উল্লাস বাদ্য ;
থেমে গেছে বারি ধারা, গম্ভীর মন্দ্র,
পদানত রাক্ষস, নির্ভয় ইন্দ্র ;
খুলেদেরে দোরখান্ রাখিস না ভেজিয়ে,
ত্রিভুবন দেখ আজি আঁখি মেলে চাহিয়ে ;
আকাশ বাতাস আজ সুন্দর নির্ম্মল,
ইন্দ্রের ধনু ঐ সাতরঙা উজ্জ্বল ;
গাছপালা মাঠ ঘাট সবুজেতে একাকার,
কেতকীর সৌরভ হরে মন্ সবাকার ;
সাদা আলো ঝল্‌মল্ ভরে গেছে সৃষ্টি,
দেবতার হাসি একি অপরূপ মিষ্টি !

শ্রীপ্রমীলা মিত্র

ডাকটিকিটের জন্মকথা

আজকাল যেমন খামের গায়ে ডাক টিকিট মেরে ডাকবাক্সে ফেলে দিলে পৃথিবীর এক কোন থেকে আর এক কোনে চিঠি চলে যায়, আগে তেমন ছিল না। সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য আগে পৃথিবীর নানা দেশে নানা রকম উপায় চল্‌তি ছিল। এবারে আমাদের ভারতবর্ষে ডাক টিকিটের জন্মকথা সম্বন্ধে কিছু বল্‌ব।

অনেক দিন আগে হিন্দু রাজাদের আমলে দূর দেশে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল অন্য রকমের। এ সম্বন্ধে সরকারী কোনো ব্যবস্থা ছিল না বল্লেই চলে।

ধর, তোমার ঠাকুরমা কাশীতে তীর্থ করতে গিয়েছেন, দু-বছর তাঁর কোনো খবরই পাচ্ছ না। এ ক্ষেত্রে, তাঁর সংবাদ জানতে গেলে তোমাকেই সব রকমের ব্যবস্থা করতে হবে। তোমার যদি নিজের নৌকো থাকে ভাল, না হয় তোমায় পরের নৌকো ভাড়া করতে হবে। নৌকো আবার নানা রকমের ছিল। চার দাঁড়ি, ছ দাঁড়ি থেকে বাইশ চব্বিশ কি তার চেয়েও বেশী। দাঁড়ি যত বেশী হবে নৌকো যাবেও তত শীগ্‌গীর আর সংবাদও আসবে তত তাড়াতাড়ি। এই নৌকোয় চড়ে লোক যাবে, সেখানে গিয়ে তোমার ঠাকুরমাকে খুঁজে বার কোরে তবে তাঁর সংবাদ আন্‌তে হবে। যে দেশে নৌকোয় যাবার উপায় নেই সে দেশে হাঁটাপথেই চল্‌তে হোতো। অথবা নৌকো পাঠাবার মতন খরচ যে দিতে পারত না তাকে হাঁটাপথেই লোক পাঠাতে হোতো। তবে হাঁটাপথে অনেক বিপদ ছিল। বাঘ, ভাল্লুক, রোগ ইত্যাদি আক্রমণের ভয় তো ছিলই, তা ছাড়া চোর ডাকাতের ভয়ও কম ছিল না।

মুসলমানদের রাজত্বের আমলে পথ-ঘাট যখন আরও একটু উন্নত হোলো, লম্বা লম্বা রাস্তা হোলো, তখন ঘোড়ার ডাক সুরু হোলো। কিন্তু এ ডাকও সাধারণ লোকদের জন্য নয়, এ সব ছিল সরকারী ডাক। অন্য লোকদের সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য নিজের খরচে ঘোড়ার ডাক বসাতে হোতো। এ ছাড়া নৌকো অথবা পায়ে হেঁটে ডাক তো ছিলই। বাংলা দেশে মুসলমানদের রাজত্বের শেষাশেষি সময়ে এক শ্রেণীর লোক ছিল যারা এই ডাক চালাচালির কারবার করত। এদের সামান্য কিছু দিলেই এরা এক স্থানের চিঠি অন্য স্থানে পৌঁছিয়ে দিত। এদের নাম ছিল কাসিদ। এই সময় কোনো কোনো জায়গায় ঘোড়ার গাড়াতে ডাক নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও হয়েছিল। সবার আগে মীরাট থেকে দিল্লী পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ীতে ডাক নিয়ে যাবার ব্যবস্থা প্রচলন হয়।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ক্লাইবের আমলে এ দেশে ডাক পাঠাবার কিসে সুবিধা হয় তা নিয়ে ইংরেজেরা মাথা ঘামাতে সুরু করে এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে প্রথমে ডাক টিকিটের প্রচলন হয় বলে শুনতে পাওয়া যায়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের পর

কলকাতার টাঁকশালে এক রকম ডাক টিকিট তৈরী হয়। এই ডাক টিকিটে ছবি ছিল সিংহ আর তাল গাছ, এর দাম ছিল দু-আনা। কর্ণেল ফরবেস নামে এক জন লোক এই টিকিটের নক্সা তৈরি করেছিলেন। পরে বিলেত থেকে টিকিট তৈরি হোয়ে আসতে আরম্ভ করে। এই সময় দু-পয়সার টিকিটের রং ছিল নীল, এক আনার লাল এবং বার আনার লাল ও নীল। এই সময় থেকেই ভারতের সর্ব্বত্র সস্তায় চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা হয়।

বৃটিশ ভারত থেকে বাইরে ডাকের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় বোধ হয় ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই থেকে মসলিপটমে। এই সময় বোম্বাই থেকে ডাকের মাশুল ছিল, যথা—পুনা ২৲, ফজিলপুর ৩৲৫পাই, হয়দ্রাবাদ ৫৲৮ পাই, মসুলিপটম্ ৪৲১২ পাই, মাদ্রাজ ৬৲২ পাই, গঞ্জাম ৮/৪ পাই, কলিকাতা ৫/৯ পাই। চিঠি ডাকে দেবার সময়ে এই মাশুল দিতে হোতো।

এ দেশ থেকে বিলেতে প্রথমে ডাক যায় ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী। তখন প্রতি মাসের ১লা তারিখে একবার কোরে ডাক যেত। তখন ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়ার চেয়ে বড় খাম পাঠান নিষিদ্ধ ছিল। মাশুলের হার ছিল সিকি তোলা দশটাকা, আধ তোলা পনেরো টাকা, এক তোলা কুড়ি টাকা। এই টাকা চিঠি বিলি করবার সময় আদায় করা হোতো।

সে সময়ে বিলিতি চিঠির মাশুলের তুলনায় এ দেশের চিঠির মাশুল ঢের কম ছিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এখানকার ডাক বিভাগের কর্ত্তারা যে হারে এ দেশের ডাকের মাশুল ঠিক করেন তা এই—বেনারস ।⁄০, পাটনা ।/০, ব্যারাকপুর /০, রাজমহল ⁄০, মুঙ্গের ।০, চট্টগ্রাম ।৵০, মাদ্রাজ ১৵১০, হযদ্রাবাদ ৸০, পুনা ১।০, বোম্বাই ১॥/০, ঢাকা ⁄০, ডায়মণ্ড পয়েণ্ট ৵০, কক্সদ্বীপ ।০, বক্সার ।৵০, কটক ⁄০, সুখসাগর ৵০, চন্দননগর /০, মুরশিদাবাদ ৵০, শীলেট ।/০ ইত্যাদি।

সেকালের তুলনায় আজকাল ডাক চলাচলের কতখানি সুব্যবস্থা আর ডাক পাঠাবার খরচ কত সস্তা হয়েছে তা একবার হিসাব কোরে দেখ। অবিশ্যি বর্ত্তমানে অন্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে ডাকের খরচ অনেক বেশী।

গোলাপের চাষ

সব ফুলের মধ্যে গোলাপ যে সকলের সেরা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমন সুন্দর রং এমন গন্ধ ও আকারে এত বড়,—এতগুলো গুণ এক সঙ্গে আর কোনো ফুলের মধ্যে নেই। অগ্রহায়ণ মাস থেকে মাঘ মাস পর্য্যন্ত—অর্থাৎ ভরা শীতের সময়েই—গোলাপ সব চেয়ে বেশী ফোটে! কিন্তু ঠিক মতন সেবা করতে পারলে গোলাপ সারা বছরই অল্প-বিস্তর ফোটে! কেমন ক'রে গোলাপ-গাছের সেবা করতে হয়, আজ সেই বিষয়ে মৌচাকের পাঠক-পাঠিকাদের কিছু বলবো।

বেশ খোলা ফাঁকা জায়গা—যেখানে অনেক আলো ও হাওয়া পাবে, এমন জায়গাতেই গোলাপ-গাছ ভালো হয়। গাছের তলায় বা দেওয়ালের পাশে যেখানে ছায়া হয়, এমন জায়গায় গোলাপ-গাছ বসিও না। তিন-চার হাত তফাতে-তফাতে গোলাপ-গাছ লাগাবে, বেশী কাছাকাছি লাগালে গাছ ওপর দিকে লম্বা হয়ে যায় বেশ ঝাড়ালো হতে পারে না। লম্বা গাছের চেয়ে ঝাড়ালো গাছেই ফুল ঢের বেশী ফোটে! ভিজে স্যাঁতসেঁতে জায়গায় গোলাপে ফুল ফোটে না, সেই জন্য একটু ঢালু বা উঁচু জায়গা, অর্থাৎ যেখানে বর্ষাকালে জল দাঁড়াতে পারে না, এমন জায়গাই গোলাপের পক্ষে সব চেয়ে ভালো। হাল্কা দোঁয়াশ মাটিতেই গোলাপ ভালো হয়, এঁটেল মাটিতে গোলাপের ফুল বেশী হয় না। এই রকম মাটিতে কিছু চূণ দিলে গোলাপ গাছ বসানো যেতে পারে।

আষাঢ় মাসে গোলাপ-গাছ লাগানো যায়, কিন্তু কার্ত্তিক মাসই গোলাপ লাগানোর সব চেয়ে ভালো সময়। গোলাপ গাছ লাগানোর এক মাস বা দেড় মাস আগে জমীতে আন্দাজ এক হাত চওড়া ও এক হাত গভীর ক'রে কোদাল দিয়ে মাটি তুলে ফেল্‌বে; তার পরে অন্য জায়গার দোঁয়াশ মাটি, পুরোণো গোবর, কিছু পাতা পচা এবং কাঠ-কয়লার গুঁড়ো মিশিয়ে গর্ত্তটা ভরে দেবে। এক মাস, দেড় মাস পরে এইগুলো ভালো ক'রে পচে মাটি হয়ে গেলে তার ওপর গাছ বসাবে। তোমরা যখন মালীদের কাছ থেকে কোনো গাছ কেনো, তখন নিশ্চয়ই দেখেছো

গাছের তলায় একটা মাটির ডেলা থাকে। গোলাপ-গাছেরও তলায় ওই রকম ডেলা থাকে। ওই ডেলাটা একটুও ভেঙো না, তা হলে শেকড় ছিঁড়ে গিয়ে গাছ কাহিল হয়ে পড়বে। ওই ডেলা সমেত গাছই বসাবে এবং এমন ভাবে বসাবে যেন ডেলাটার ওপরে আন্দাজ দু' আঙুল মাটি চাপা পড়ে। বসাবার সময় ডেলাটা খুব শুখনো থাক্‌লে সেটাকে জলে খানিকক্ষণ ডুবিয়ে রেখে একটু নরম করে নিয়ে তারপর বসাবে। গাছ বসিয়ে বেশ ভালো ক'রে জল দেবে। দিন দশ-বারোর মধ্যে গাছ মাটিতে বসে যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে গোলাপ-গাছে অল্প ফুল ফোটে, তৃতীয় বৎসর থেকে খুব বেশী ফুল ফুট্‌তে আরম্ভ করে। ভালো ক'রে সেবা করলে গোলাপ-গাছে আট-দশ বছর পর্য্যন্ত প্রচুর ফুল ফোটে, তারপর গাছ বুড়ো হয়ে গেলে ফুলেব পরিমাণও কমে আসে এবং ফুলের আকারও ছোট হয়ে আসে। তখন সেই সব বুড়ো অকর্ম্মণ্য গাছগুলোকে তুলে ফেলে দিয়ে নতুন গাছ বসানোই ভালো।

গোলাপের চাষে সব চেয়ে দরকারী কাজ হচ্ছে—গাছের ডাল ছাঁটা ও গাছের শেকড়কে হিম খাওয়ানো। আশ্বিন মাসের শেষে বা কার্ত্তিক মাসের প্রথমে হিম পড়তে সুরু হ'লে গোলাপ-গাছের পুরানো ডাল-পালাগুলো ছেঁটে দিতে হয়। গোলাপ ফুল অনেক জাতের আছে, সব জাতে ছাঁটবার একই নিয়ম নয়। "মার্শল নে", "গ্লোয়ের্ ডি ডিজন্" প্রভৃতি চা-গন্ধ জাতীয় গোলাপ (ইংরেজীতে যাদের Tea-scented Rose বলে) বেশী ছাঁট্‌তে হয় না, পুরোণো ডালগুলো ওপর-ওপর একটু-আধটু ছেঁটে দিলেই চলে। কিন্তু 'পল্ নিরো", "মণ্ট ক্রিস্টো", "ব্ল্যাক্ প্রিন্স্" প্রভৃতি দোঁয়াশ্‌লা বিলিতী গোলাপ (ইংরিজীতে যাদের নাম Hybrid Perpetual) খুব মুড়িয়ে না ছাঁট্‌লে ভাল ফুল হয় না। এই জাতের গোলাপের পুরোণো ডালে গোটা তিন-চার চোখ রেখে ছাঁট্‌লেই যথেষ্ট। এই রকম করে ডাল ছেঁটে সব গোলাপ গাছের তলা আস্তে-আস্তে খুঁড়ে গোড়ার মাটি স'রিয়ে ফেলতে হয়। গোড়া খোঁড়বার সময় একটু সাবধান হতে হয় যেন শেকড় না ছিঁড়ে যায়। গোড়ার মাটি সরিয়ে শেকড় বার করে দিন দশ-বারো এই রকম

খোলা অবস্থায় রেখে দিতে হয়। এই ক'দিনে গাছের শেকড়ে হিম লেগে গাছ খুব তাজা হয়ে ওঠে। তারপর আগেকার মতন দোঁয়াশ মাটী পুরোণো গোবর, কিছু পাতা-পচা, কাঠ-কয়লার গুড়ো ইত্যাদি মিশিয়ে গাছের গোড়ার গর্ত্ত বুজিয়ে ফেলে বেশ ভালো করে জল দিতে হয়। ওই মাটির সঙ্গে কিছু হাড়ের গুঁড়ো বা পচা মাছ বা পায়রা বা অন্য কোনো পাখীর গু মিশিয়ে দিতে পারলে ফুল খুব বড় হয় এবং অনেক ফোটে। নতুন মাটি চাপা দিয়ে ভালো ক'রে জল দিলে দিন বারো-চৌদ্দর মধ্যে সারা গাছে নতুন ডাল গজাতে সুরু করে এবং সেই সব ডাল ফুলের কুঁড়িতে ছেয়ে যায়। গাছে ফুল ফুটতে ফুটতে গাছের তেজ কমে আসে। যাতে তেজ না কমে যায় সেই জন্যে ফুল ফুটতে আরম্ভ হ'লে সারা শীতকাল সপ্তাহে একবার ক'রে গাছের গোড়ায় গোবর-গোলা জল দিতে হয়। খানিকটা টাটকা গোবর একটা বাল্‌তিতে রেখে জল ঢেলে, একটা ডাণ্ডা দিয়ে খানিকক্ষণ খুব নাড়বে। এই রকম ক'রে নেড়ে জলটা লালচে রংএর হ'লে ছেড়ে দেবে। কিছুক্ষণ পরে গোবরের ছিবড়েগুলো বাল্‌তির তলায় জমবে। তখন জলটা আস্তে আস্তে অন্য একটা বাল্‌তিতে ঢেলে দিয়ে সেই জল গাছে দেবে। এই রকম ক'রে সপ্তাহে একবার ক'রে গোবর-গোলা জল দিলে গাছের তেজ কমে যেতে পারে না এবং ফুলের পর ফুল ফুটতে থাকে। সপ্তাহের অন্যদিন রোজ সন্ধ্যা-বেলা ভালো ক'রে জল দেবে। দিনের-বেলা রোদের সময় কখনো জল দিও না তা হ'লে গাছের সর্দ্দিগর্ম্মি হয়; বিকেলে রোদ পড়ে গেলেই গাছে জল দেবার সব চেয়ে ভালো সময়। ফুল তোল্‌বার সময় টেনে ফুল ছিঁড়ে নিও না, তাতে গাছের ডালের ছাল ছিঁড়ে গিয়ে গাছ কাহিল হয়ে পড়তে পারে।

টবে গোলাপ গাছ লাগালেও ঠিক এই রকম ক'রেই সেবা করতে হয়।

গোলাপের কলম কেমন ক'রে করতে হয় এবং কি-কি পোকায় গোলাপের ক্ষতি করে ও তাদের মারবার উপায় পরে তোমাদের বলবো।

শ্রীনির্ম্মল দেব

জলার পেত্নী

অনেক দিন পরে কালীনারায়ণের এক বিশ্বাসী অনুচর এসে তাকে খবর দিলে—হুজুর জায়গা ঠিক হয়েছে, দেখে আসবেন চলুন।

কালীনারায়ণ এতদিন জায়গা দেখে-দেখে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কিন্তু কোনো জায়গাই তার মনের মতন হচ্ছিল না। ওদিকে সরকারী ডিটেকটিভেরা রোজই ডাকাত ধরতে আরম্ভ করেছে। ডাকাতদের কারুর ফাঁসী কারুর বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, কারুর বা জেল এই রকম সাজা হোতে লাগল দেখে সে দস্তুরমত চিন্তিত হোয়ে পড়ল। এমন সময় ভাল জায়গা পাওয়ার খবর আসায় সে সেই দিনই রওনা হোলো।

তখনকার দিনে এখনকার মতন রেলগাড়ী তৈরি হয়-নি যে, টিকিট কেটে কোনো রকমে একবার গাড়ীতে চড়তে পারলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঠিকানায় গিয়ে পৌছনো যাবে। কালীনারায়ণ জনকয়েক লোক সঙ্গে নিয়ে জায়গা দেখতে চল্লো। তারপর কখনো নৌকোয়, কখনো ঘোড়ায় এমনি কোরে প্রায় মাসখানেক পরে সেখানে গিয়ে পৌছলো। জায়গাটা দেখে কালীনারায়ণের ভারী পছন্দ হওয়ায় সে আর বাক্যব্যয় না কোরে জায়গাটা কিনে ফিরে এল।

কালীনারায়ণ যে জায়গাটা কিনলে সেখানকার সঙ্গে আমাদের একটু পরিচয় হওয়া দরকার। জায়গাটা হচ্ছে ময়মনসিং জেলায়, সেই বাংলা দেশের এক কোনে—গারো পাহাড়ের একবারে নীচে বল্লেই হয়। দূরে উঁচু-উঁচু পাহাড় একেবারে মেঘ ফুঁড়ে উঠেছে, তার নীচে একটা প্রকাণ্ড জলা—জল থৈ থৈ করছে, তার আর এপার-ওপার দেখা যায় না, মনে হয় যেন জল গিয়ে মিশেছে একেবারে সেই পাহাড়ের গা অবধি। এই জলার মাঝে-মাঝে এক একটা পাথরের ঢিপি উঁচু হোয়ে আছে—যেন বড় বড় কচ্ছপ জল থেকে উঠে রোদে পিঠ শুকোচ্ছে! জলার মাঝে মাঝে শুকনো ডাঙা-জমি আছে বটে কিন্তু সেখানে যাবার উপায় নেই, কারণ এই সব শুকনো জায়গার চারদিক চোরাবালিতে ভর্ত্তি। কত লোক আর

কত জানোয়ার যে সেই চোরাবালিতে ডুবে মারা গিয়েছে তার আর ঠিকানা নেই। সে সব জায়গায় যাবার সরু-সরু রাস্তা আছে, সে রাস্তা একমাত্র বুনোরা জানে। তারা মাঝে-মাঝে পাখী শীকার করতে এসে কখনো সেই জমিগুলোতে তাঁবু খাটিয়ে দিন কয়েক বাস কোরে আবার চলে যায়। জলার সামনে উঁচু অনেকখানি সমতল জমি।

জায়গাটা দেখে কালীনারায়ণের ভারী পছন্দ হোলো। সে সেই জলা সমেত কিনে সেই উঁচু জায়গায় প্রকাণ্ড এক বাড়ী তৈরি করলে। সে জায়গায় জন মানবের বসতি ছিল না। কালীনারায়ণ একে-একে তার অনুচরদের নিয়ে এসে তার বাড়ীর আশপাশে বসাতে লাগ্‌ল। কালীনারায়ণের বিশাল জমিদারী ছিল, কিন্তু জমিদারীর হিসাব ইত্যাদি রাখবার জন্য লেখাপড়া জানা লোকের দরকার। কিন্তু কে সেই জনশূন্য জায়গায় চাকরী করতে যাবে! এখন যেমন সামান্য একটা চাকরী খালি হোলে লোক চাইবার আগেই হাজারখানা দরখাস্ত এসে হাজির হয় তখন তো আর তেমন ছিল না। বিদেশে যেতে লোকে চাইত-ই না, বিশেষ প্রলোভন না থাকলে। কালীনারায়ণ জায়গা জমি দিয়ে নিজের দপ্তরের জন্য কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে তার দেশে নিয়ে গেল। কয়েক বছরের মধ্যেই সেই জনশূন্য জলার চারিদিকে বেশ একটি গ্রাম হোয়ে দাঁড়াল। কালীনারায়ণ নিজের নামকে স্মরণীয় কোরে রাখবার জন্য এই জায়গার নাম রাখলে কালীগ্রাম।

কালীগ্রামে বসে কালীনারায়ণ বেশ সমারোহের সঙ্গে জমিদারী চালাচ্ছিল কিন্তু টাকার নেশা এমন যে, এ জিনিষ যার যত আছে তার তত বেশী পাবার ইচ্ছা হয়। কালীগ্রামে আসার কয়েক বছর পরে আবার সে পুরোনো দলবল জুটিয়ে ডাকাতি করতে আরম্ভ কোরে দিলে।

ডাকাতি ছাড়া এবার কালীনারায়ণ রোজগারের আর একটি নতুন পথ আবিষ্কার করলে। সে বড়-বড় জমিদার, রাজা ইত্যাদির ছেলে চুরি কোরে এনে লুকিয়ে রেখে সেখানে চিঠি লিখে পাঠাত যে, অমুক তারিখে অমুক নির্জ্জন জায়গায় রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় একটি দশ-হাজার টাকার তোড়া রেখে এলে পর ছেলেকে ফিরিয়ে

দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জানিয়ে দেওয়া হোতো যে, যদি তার লোককে ধরবার জন্য কোনো রকমের চেষ্টা করা হয় তখুনি সেই জমিদার পুত্রকে মেরে ফেলা হবে।

যাদের ছেলে চুরি যেত তারা ছেলেকে ফিরিয়ে পাবার আশায় কোনো গোল না কোরে লুকিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিত, তারপরে কিছুদিন বাদে ছেলেও বাড়ীতে ফিরে আস্‌ত কিন্তু এতদিন যে সে কোথায় ছিল তা বল্‌তে পারত না। কারণ কালানারায়ণের লোকেরা তার চোখ বেঁধে নিয়ে এসে জলার মাঝে-মাঝে যে পাহাড় ছিল তারই গুহার মধ্যে লুকিযে রেখে দিত।

এমনি কোরে কালানারায়ণেব সিন্ধুকে টাকার বোঝা যত বাড়তে লাগ্‌ল তার মন থেকে দয়া-মায়া ততই লোপ পেয়ে যেতে লাগ্‌ল। শেষকালে একবার এক জায়গায় ডাকাতি কোরে ফেরবার সময়ে পথে আর এক ডাকাতের দলের সঙ্গে কালীনারায়ণের দলের লড়াই বেধে গেল।

তখনকার দিনে প্রায়ই এই রকম ডাকাতে-ডাকাতে লড়াই হোতো। একদল ডাকাত হয়ত কারুর বাড়ী লুটপাট কোরে টাকা নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ফির্‌ছে, হঠাৎ অতর্কিতে আর একদল ডাকাত পেছন থেকে আক্রমণ কোরে লুণ্ঠিত জিনিষ-পত্র ছিনিয়ে নিত।

সেবার কালীনারায়ণের দলের সঙ্গে সে নিজেও ছিল। তারা কোথায় একটা বড় রকমের ডাকাতি কোরে অনেক টাকা ও হীরে জহরত লুট কোরে নৌকো চড়ে ফিরছিল এমন সময় হঠাৎ আর একদল ডাকাত তাদের নৌকো আক্রমণ করলে। কালীনারায়ণের দলে লোক অনেক বেশী ছিল, আর তারা লাঠি, সড়্‌কি, তলোয়ার চালানোতে অন্য দলের চেয়ে ঢের বেশী ওস্তাদ। আক্রমণকারীরা আক্রমণ কোরেই বুঝলে যে, এরা বড় সহজ লোক নয়। একটু লড়েই তারা সরে পড়্‌ল। কিন্তু সেই মারপিটের সময় কালীনারায়ণের মাথায় একটা লাঠি পড়ায় সে অজ্ঞান হোয়ে পড়্‌ল।

দু-দিন বাদে কালীনারায়ণকে বাড়ীতে নিয়ে আসা হোলো। তার চিকিৎসার জন্য চারিদিক থেকে বদ্যি এল, কিন্তু সেই যে সে অজ্ঞান হোয়ে পড়েছিল তার

আর জ্ঞান হোলো না। দিন তিনেক সেই ভাবে থেকে কালীনারায়ণ মারা গেল।

কালীনারায়ণের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির মালিক হোলো তার একমাত্র ছেলে দুর্গানারায়ণ। দুর্গানারায়ণ তার বাপের ডাকাতি ব্যবসা ছেড়ে দিলে বটে কিন্তু সে তার প্রজাদের ওপর ভয়ানক অত্যাচার করতে সুরু করলে। কালীনারায়ণ ডাকাতি করত বটে কিন্তু সে ছিল গরীব প্রজাদের মা-বাপ। তাদের মধ্যে কেউ সাহস কোরে তার কাছে গিয়ে নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা জানালে সে তখুনি তাকে সাহায্য করত; তার প্রজার ওপর কেউ অত্যাচার করলে তার আর নিস্তার ছিল না। দুর্গানারায়ণ ঠিক তার উল্টো হোলো। ডাকাতি করবার সাহস তার ছিল না কিন্তু বাপের নিষ্ঠুর প্রকৃতির যতখানি সে পেয়েছিল ততখানি সে তার প্রজাদের উপর খাটাত। শেষকালে সে জগৎ সর্দ্দার নামে তার বাপের একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে কি একটা সামান্য কারণে খুন করে। জগৎ ছিল সাতপুরুষে ডাকাত, তার ছেলেরা দুর্গানারায়ণকে সহজে নিষ্কৃতি দিলে না। প্রথমে তারা তার নামে আদালতে নালিশ করলে কিন্তু সেখানে দুর্গানারায়ণের অপরাধ প্রমাণ না হওয়ায় সে ছাড়া পেলে। এরই কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময় দুর্গানারায়ণ জলার ধারে একটা রাস্তায় পায়চারী করছিল এমন সময় জগতের ছেলেরা এসে তাকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিলে।

দুর্গানারায়ণের ছেলে শিবনারায়ণ, সে বাপ ও ঠাকুর্দ্দার দুজনের গুণই পেলে। একদিকে যেমন সে দুর্দ্দান্ত জমিদার হোয়ে উঠ্‌ল অন্য দিকে সে লুকিয়ে আবার ঠাকুর্দ্দার ডাকাতি ব্যবসা আরম্ভ করলে। শিবনারায়ণের দুই ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। বড়র নাম হরিনারায়ণ আর ছোটর নাম জয়নারায়ণ। আমরা যে সময়ের কথা বলছি সে সময় হরিনারায়ণের বিয়ে হয়েছে এবং সে জমিদারী দপ্তরের খাতাপত্র দেখায় পাকা হোয়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডাকাতের বংশে জন্মগ্রহণ কোরেও হরিনারায়ণের মতিগতি হোলো বিভিন্ন রকমের। কোনো প্রজা বিপদে পড়লে অথবা কেউ খাজনা দিতে অপারগ হোলে তারা লুকিয়ে এসে হরিকে ধরে বলত—দাদাবাবু, রক্ষে করুন! হরিনারায়ণের স্বভাব-কোমল হৃদয় এই সব

গরীবদের দুঃখে গলে যেত, সে তখুনি তাদের সেই বিপদ থেকে উদ্ধার কোরে দিত। একবার তাদের একজন প্রজা খাজনা দিতে না পারায় শিবনারায়ণ তাকে ধরে নিয়ে এসে অন্ধকার ঘরে আটক কোরে রেখেছিল ; হরিনারায়ণ এ খবর জানত না। গরীব প্রজাটীর স্ত্রী এসে তার কাছে আবেদন করায় সে তাকে মুক্তি দিয়ে দিলে। এই নিয়ে বাপে-ছেলেতে তুমুল ঝগড়া বেধে গেল। শেষকালে হরিনারায়ণ বাপের উপর রাগ কোরে তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে পশ্চিমে এক জায়গায় সামান্য একটা চাকরী নিয়ে দিন কাটাতে লাগল। সেই থেকে বাপেতে আর ছেলেতে মুখ দেখাদেখি হয়-নি। এমন কি শিবনারায়ণ জানতেও পারলে না যে, হরিনারায়ণ কোথায় আছে। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত সে তার ছেলের কোনো সন্ধান পেলে না।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী
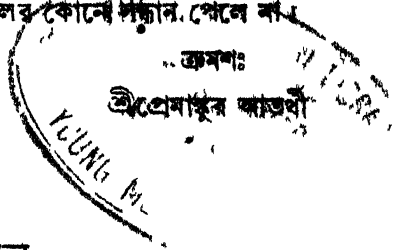
কাঠের পুতুল

আমি একটী কাঠের পুতুল। তোমরা বলবে কাঠের পুতুলের আবার সুখ দুঃখ কি? কিন্তু শোন, তোমরা জানো না আমারো মনে সুখ-দুঃখে আছে, মুখে বলতে পারি না তাই তোমরা বুঝতে পারো না, একটী ছোট সুন্দর বেল ফুলের মত মুখ আমার বুকটা জুড়ে আছে, যদি দেখাবার হোত, তা হলে দেখাতাম, সে আমার কতখানি ছিল।

ঐ ঘোসেদের পুকুর পাড়ের আম গাছেতে আমার জন্ম ; যখন গাছের গায়ে লেগে ছিলাম তখন মার কোলে থাকার মত কত আনন্দেই ছিলাম। কত রকমের পাখি আমার গায়ে বসত, বাতাস এসে আমার পাতা দুলায়ে যেত, ভোরের আলো ও চাঁদের জ্যোৎস্না আমার গায়ে পড়ে আদর করত তখন ; আমার সে আনন্দ কি আর বলিব। হায়, সে দিন আমার কোথায় গেল। তার পর কাল-

বৈশাখীর প্রবল ঝড়ে গাছের ডালটা ভেঙ্গে পড়ল, কিন্তু তারা ত আমার মর্ম্ম বেদনা বুঝতে পারবে না, সে যে আমার কত বড় কষ্ট। সে আর তোমাদের কি বলিব; সে রকম অবস্থায় কতদিন পড়ে রইলাম, মাথার উপর দিয়ে কত রোদ, জল, ঝড় চলে গেল, কানের কাছে পাখীর আহা বলে চলে গেল, বাতাস এসে দুঃখ জানালে, আমি অজ্ঞানের মত পড়ে রইলাম। একদিন একটা বড় আঘাত পেয়ে চেয়ে দেখি আমাদের পাড়ার রামকুমার ছুতোর আমাকে কেটে কেটে খণ্ড খণ্ড করছে; যাতনায় আমি কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলাম, তবুও সে আমাকে টুকরো-টুকরো করে কাটলে, পরে সে আটি বেঁধে আমাকে নিয়ে চলল। আমি ভাবলাম যে আমাকে বুঝি সে উনুনে জ্বালানি কাঠ করে পোড়াবে, কিন্তু সে তা করল না। তার কাজ ছিল কাঠের পুতুল গড়ে হাটে বিক্রি করা—তার ঘরে আর কেউ ছিল না; বুড়ো বুড়ি দুই স্বামিস্ত্রীতে তারা থাকতো; রোজ এরা গল্প করিত, তাদের একটি মেয়ের কথা, আর মেয়ের যে একটী সুন্দর খোকা হয়ে ছিল তার বিষয়। শুনে শুনে আমার মনে হোত আহা সেই মেয়েটী কেমন আর তার খোকাটীই বা কেমন কত সুন্দর। আমার যদি মানুষের মত পা থাকত তা হলে দেখে আসতাম। একদিন সেখানে আমার অনুভব শক্তি—আমার প্রাণ—ছুতার সেখানটী করাত দিয়ে চিরতে বসল। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম. কতক্ষণ জানি না জ্ঞান হয়ে চেয়ে দেখি যে আমাকে একটি সুন্দর কাঠের পুতুল করে আমায় রঙ দিয়ে চোখ মুখ গড়ছে। ছুতোর-গিন্নি আমায় দেখে বললে এ পুতুল তুমি বিক্রি কোরো না, এটা আমাদের খোকার; ও মাসে আমাদের লক্ষ্মী আসবে সেই সময় খোকা এটী নিয়ে খেলবে। ছুতোর খুসি হয়ে আচ্ছা বলে রং-চং করে গিন্নির হাতে দিলেন, গিন্নি যত্ন করে আমায় তাকে তুলে রাখলেন। শুনে আমার মনে খুব আনন্দ হোল; এতদিন আমি যে খোকাকে দেখতে চেয়ে ছিলাম, সেই খোকাকে দেখতে পাবো তার মাকেও দেখতে পাবো। রোজই পথ পানে চেয়ে থাকতাম; তোমাদের মত আমার অঙ্ক জানা ছিল না তো যে গুনতে পারবো, তার পর কত দিন পরে জানি না একদিন যথার্থই জগৎ জননী লক্ষ্মী বাপের বাড়ী এল। কোলে তার ফুটন্ত গোলাপের মত দু-তিন বছরের একটী

খোকা। বুড়ো-বুড়ী অনেকদিন পরে মেয়ে পেয়ে ত অস্থির, কোথায় রাখবে, কি করিবে, কি খাওয়াবে ভেবেই পায় না। খোকা একবার দাদা .একবার তার দিদিমার কোলে ঘুরে বেড়াতে লাগল, তার দাদা আমাকে তার হাতে দিল, আমাকে পেয়ে খোকার কি আনন্দ সে আর কি বলিব সে তখনি আমাকে কোলে করে ঘুম পাড়াতে বসে গেল। তার কচি হাতের'পরশ পেয়ে আমার মনে যে সুখের আবেশ জেগে উঠে ছিল তা যদি আমার বলবার ক্ষমতা থাকত তা হলে বলতাম যে, ওরে খোকা সাধনার ধন, আজ আমার কাষ্ঠ জন্ম, পুতুল জন্ম. সার্থক হোল, আমার ভাষা নাই, বলতে পারলেম না, মনের কথা মনেই রয়ে গেল। আনন্দের দিন এই ভাবে কেমন কোরে কেটে গেল জানি না, শুনলাম খোকার মা শীগ্‌গীর করে চলে যাবে। দেখতে-দেখতে সেই দিন আসল, খোকার বাবা খোকাকে নিতে এলেন। ছুতোর গরীবের ঘরের যথাসাধ্য চেষ্টা করে খাবার আয়োজন করল, একটী দিন থাকবার অনুরোধ করাতে খোকা একদিন মাত্র রইল।

যাবার দিন বিকেলে পাল্কী এল খোকার মা কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে উঠল, বুড়ো-বুড়ী কেঁদে-কেঁদে আকুল হল, আমার কথা কারও মনে হল না ; আমার মুখে ভাষা নাই, আমি এ বলতে পারলাম না যে, "খোকা আমি এখানে আছি. আমাকে তুমি নিয়ে যাও, আমাকে ফেলে যেও না"। আমার খোকা আমার সামনে দিয়ে তার দাদাকে দাদু দাই বলে চলে গেল। আমার খোকার আমার কথা মনে রইল না।

ওরে আমার খোকা, ওরে আমার বুক জোড়া ধন, আমাকে ফেলে যাস নে, আমাকে তোর কোলে তুলে নে ; কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলাম না, মনের বাসনা মনেই রইল। খোকা কবে আসবে এই জন্য পথ চেয়ে বসে আছি। পর দিন আমায় পড়ে থাকতে দেখে আমার গায়ের ধূলা ঝেড়ে খোকাকে মনে করে বুড়ো-বুড়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তাকের উপর তুলে রাখলে ! এর পর থেকে কোনো শব্দ হলে চেয়ে দেখি যদি আমার খোকা এসে থাকে।

শ্রীবিশ্বনাথ দেব

বড়দিনের ছুটিতে

(গল্প)

মণ্টু আজ সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে ইস্কুলের জন্যে তৈরী হয়ে বসে রইল। তার মা ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে মণ্টু, আজ যে বাস্ আসবার আগেই তৈরী হয়ে বসে আছিস্? অন্য দিন তো নাইতে খেতে কুরুক্ষেত্র বেধে যায়।

মণ্টু পেছন ফিরে চুলের রিবনটা ঠিক করতে করতে ফিক্ করে হেসে বল্লে,—বাঃ—আজ বাড়ী যাব যে—সকাল সকাল ফিরে পুতুলের বাক্স সাজিয়ে দিতে হবে; নৈলে তোমার যে আবার তাড়াহুড়ো—বিছানা আগেই বেঁধে ফেল্বে—

মণ্টুরা আজ বড়দিনের ছুটিতে বাড়ী যাবে। এক মাস আগে থেকেই সব জল্পনা-কল্পনা চল্ছে—কবে যাওয়া হবে—কোন ক্লাসে যাওয়া হবে—বাড়ীতে কিছু না জানিয়ে গেলে বেশ হয় কিন্তু! ঠাকুমা অবাক হয়ে যাবে!—এমনি আবোল তাবোল কত কি!

সকাল থেকে মণ্টু খুব ব্যস্ত! এক দণ্ড আজ তার ফুরসৎ নেই।

বেথুন ইস্কুলে মণ্টু পড়ে—একটায় ইস্কুল ছুটি হ'তে সে গেটের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। কত বাড়ীর ঝি চাকর এলো, গেল—তাদের গনেশটা তো কৈ এখনো এলো না? মণ্টু ছট্ফট্ করে বেড়াতে লাগ্লো।

গনেশ আস্তেই মণ্টু তার গালে ঠাস্ করে এক চড় বসিয়ে দিলে।

গনেশের সঙ্গে মণ্টু এসে বাড়ী পৌঁছল।

রাত্তিরে গাড়ী চড়ে মণ্টু বাড়ী রওনা হল! সঙ্গে বাবা, কাকা, মা, ছোট ভাই মিণ্টু আর টুণ্টু।

পরদিন তারা যখন এসে বাড়ী পৌঁছল, আকাশে তখন দু' একটি করে তারা উঠ্ছে।

মণ্টুর বাবা রাস্তায় দু'টো টাট্কা ইলিশ মাছ কিনেছিলেন, গরম-গরম মাছের ঝোল ভাত খেয়ে তারা ঠাকুমাকে ঘিরে বস্ল। মিণ্টু বল্লে,—ঠাকুমা, একটা গল্প বল না?

ঠাকুমা বল্লেন, কাল সারারাত জেগে এসেছিস্—মার কাছে শো' গে যা —

মণ্টু বল্লে, না কিছুতে না—আমরা গল্প শুন্‌বো।

ঠাকুমা বল্লেন, সে কাল হ'বেখন।

মণ্টু মাথা নেড়ে বল্লে, না—না—না—আজই আমরা শুন্‌বো।

ঠাকুমা বল্লেন, তোদের সায়েবা গল্প কি আমি জানি? আমি হলুম সেকেলে মানুষ—

মিণ্টু এতক্ষণ চুপ্ করে ঠাকুমা আর দিদির কথা শুনছিল—এইবার সে বলে উঠ্‌ল—আমরা সেই—'এক যে রাজার' গল্প শুনতেই তো চাই—

তখন ঠাকুমা সুরু কল্লেন—এক যে রাজা—রাজার সিন্দুক ভরা মণিমাণিক্য—অমরাবতীর মত তার রাজপুরী—সৈন্য সামন্তে রাজ্য গিস্‌গিস্ করে কিন্তু রাজার মনে সুখ নেই।

মিণ্টু বল্লে—কেন নেই ঠাকুমা?

মণ্টু বল্লে—এই মিণ্টু কথার মাঝ খানে ফোঁড়ন দিস্‌নে—চুপ করে শোন্।

ঠাকুমা বল্‌তে লাগ্‌লেন—রাজার মনে সুখ নেই—রাজার ছেলে হয় না। কত পূজো-আর্চ্চা, যাগ-যজ্ঞি, কত সন্ন্যাসীর অষুধ—নাঃ—কিছুতে কিছু নয়। একটি টুক্‌টুকে ছেলের জন্যে রাজপুরী খাঁ খাঁ করে।

অনেক দিন পর রাজার একটি ছেলে হল। এমন সুন্দর ফুটফুটে তার চেহারা—সবাই ভারী খুসী। রাজ্যে আনন্দের হাট বসে গেলো।

ছয় ষষ্ঠির দিন রাজা মন্ত্রিকে ডেকে বল্লেন,—মন্ত্রী আজ সারারাত জেগে তোমার রাণীর আঁতুর ঘর পাহারা দিতে হবে।

মন্ত্রী শুধোলেন,—কেন মহারাজ?

রাজা বল্‌লেন—বিধাতা পুরুষ আমার ছেলের কপালে কি লিখে যান—তাই জেনে আমায় বল্‌তে হবে।

মন্ত্রি বললেন,—যে আজ্ঞে!

সন্ধ্যে হ'তেই মন্ত্রী আঁতুর ঘরের দরজায় পা ছড়িয়ে বসে রইলেন।

অমাবস্যার রাত্তির, চারদিক নিঝুম, আর ঘুট ঘুটে অন্ধকার ; তখন ঠিক দুপুর রাত্তির—মন্ত্রি একটু ঝিমুতে লাগ্‌লেন—হঠাৎ খুট্‌ করে একটা শব্দ হতেই মন্ত্রি চোখ রগড়ে উঠে বস্‌লেন। উঠ্‌তেই সাম্‌নে দেখেন, কে এক জন দোয়াত আর কলম হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার মাথা থেকে এ ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতরও চন্দ্রের মত আলো বেরুচ্ছে। মন্ত্রি শুধোলেন,—কে আপনি ?

মূর্ত্তি উত্তর করলেন—আমি বিধাতা পুরুষ—রাজকুমারের কপালে তার অদৃষ্টের কথা লিখ্‌তে এসেছি—আমায় রাস্তা দাও।

মন্ত্রি বললেন, -আমি আপনাকে যেতে দিতে পারি -কিন্তু কি লিখ্‌লেন—ফিরে যাবার সময় আমায় বলে যেতে হবে।

বিধাতা পুরুষ আর কি করেন, বললেন—বেশ তাই হবে।

ফিরে আস্‌তেই মন্ত্রি শুধোলেন, —কি লিখ্‌লেন ঠাকুর ?

বিধাতা পুরুষ বললেন, ভাল না রে রাজকুমারকে হরিণ শীকার করে খেতে হবে। মন্ত্রি রাস্তা ছেড়ে দিলেন।

পর দিন রাজা জিজ্ঞেস করতেই মন্ত্রি বললেন, মহারাজ, রাজকুমারের অদৃষ্ট ভাল নয়—তার কপালে রাজ্যভোগ নেই। রাজা শুনে একেবারে মুষড়ে গেলেন। দু'টি নয়—তিনটি নয় তাঁর একটি মাত্র ছেলে, তার কপালেও রাজসুখ নেই।

অনেক দিন কেটে গেছে। রাজা এখন বুড়ো হয়েছেন—রাজপুত্রও ধীরে ধীরে শৈশব ছাড়িয়ে কৈশোরে পা দিয়েছেন।

হঠাৎ অন্য এক রাজা আমাদের এই রাজ্য আক্রমণ করলে। রাজা বুড়ো হ'য়েছেন। যুদ্ধ করতে করতেই তিনি জীবন হারালেন। রাজপুত্র পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।

নতুন রাজা বুড়ো মন্ত্রিকে বললেন, আপনি আমার মন্ত্রি হয়ে থাকুন। কিন্তু তিনি কোন কথা না শুনে বেরিয়ে পড়লেন রাজকুমারের সন্ধানে।

কিছুতেই তার সন্ধান পান না। বছর পাঁচেক কেটে গেল। শেষটা অনেক

খোঁজা-খুঁজির পর মন্ত্রি জান্‌তে প্যারলেন পাহাড়ের ধারে ভীলদের সঙ্গে রাজকুমার হরিণ শীকার করেন—আর থাকেন ঐ খানেই এক কুঁড়ে ঘরে।

মন্ত্রি একদিন রাজকুমারের সঙ্গে দেখা করে বললেন,—দেখ হে—আমার একটা হরিণ দরকার—শুনেছি তোমরা হরিণ শীকার কর, আমায় একটা ধরে দিতে পার?

রাজকুমার বললেন,—খুব—আঁপনি কাল এসে নিয়ে যাবেন।

অনেক দিনের ছাড়া-ছাড়ি—রাজপুত্র মন্ত্রিকে চিন্‌তে পারলেন না।

পরদিন সকাল বেলা মন্ত্রী এসে দেখেন, একটা হরিণ রাজপুত্রের ঘরের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে।

রাজপুত্র বললেন—মশাই, কাল এই একটা হরিণই পেয়েছি।

মন্ত্রি শুধোলেন—আচ্ছা তোমরা কি করে হরিণ ধর হে?

রাজপুত্র বললেন—মশাই সে কথা আর বল্‌বেন না—পাহাড়ে ঘুরে-ঘুরে কি কষ্টে যে হরিণ ধরি—তা' আমরাই জানি।

রাজপুত্রকে কাছে ডেকে মন্ত্রি বললেন—দ্যাখ, তোমায় একটা কথা বলি—আজকে জালটা তোমার ঘরের নিচেই পেতে রেখো।

রাজপুত্র তো হেসেই অস্থির! বললেন—আপনি কি পাগল হয়েছেন! পাহাড়ের ওপর উঠে কত কষ্টে আমরা হরিণ ধরি—ঘরের নিচে জাল পাত্‌লে কি হবে?

মন্ত্রি বললেন,—আহা বুড়ো মানুষের কথাটা একবার শুনেই দেখ না।

রাজপুত্র তাই করলেন।

পর দিন ঘুম ভাঙতে মন্ত্রি দেখেন রাজপুত্র তার বাড়ী গিয়ে উপস্থিত।

মন্ত্রি শুধোলেন, কি হে খবর কি?

রাজপুত্র বললেন—আপনার কথা মত কাল ঘরের নিচেই জাল পেতে ছিলাম। সকাল বেলা উঠেই দেখি একটা হরিণ ধরা পড়েছে।

মন্ত্রি রাজপুত্রকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন,—বাপু হে তোমার আর একটি কাজ করতে হ'বে। কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। হরিণটি নিয়ে তুমি হাটে যাও, দাম জিজ্ঞেস করলে বোলো—দশ হাজার টাকা।

রাজপুত্র বললেন,— সে কি? একটা হরিণের দাম দশ হাজার?

মন্ত্রি বললেন,—আহা বাপু বুড়োর কথাটা শুনেই দেখ না? রাজপুত্র তাই করলেন।

হাটে যেতেই একটি লোক হরিণটির দাম জিজ্ঞেস করলে। রাজপুত্র উত্তর দিলেন দশ হাজার টাকা।

লোকটা পাগল নাকি, বলে হাসতে হাসতে চলে গেল। রাজপুত্র মনে-মনে ভাবলেন দেখাই যাকনা ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়।

হাট ভেঙ্গে গেল—রাজপুত্র কিন্তু দশ হাজারের এক পয়সা কমে হরিণটি দিতে রাজী হলেন না।

শেষকালে এক বুড়ো বামুন এসে বললে কতয় দিবিবে?

রাজপুত্র বললেন, দশ হাজার।

বামুন বললে—পাগল। হরিণের দাম কখনো দশ হাজার হয়?—আচ্ছা তোকে পাঁচশ দিচ্ছি।

রাজপুত্র নাছোড়বান্দা! শেষ কালে বামুন দশ হাজারেই হরিণটি নিলে।

রাজপুত্র তো দেখে অবাক!

বামুন বললে, তোকে দশহাজার দাম দিতে কে শিখিয়ে দিয়েছে?

রাজপুত্র বললে —তোমার মতই একটি বুড়ো বামুন।

বামুন বললে—আমায় তার কাছে নিয়ে যেতে পারিস্?

রাজপুত্র বললে, খু—ব।

মন্ত্রিকে রাজপুত্র এসে জানালে—হরিণ দশহাজারেই বিক্রি হয়েছে। আর যে লোকটি কিনেছে সে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

মন্ত্রি বললেন—দেখ্‌লে বাপু বুড়োর কথাটা মাঝে-মাঝে শুনো, ভাল হবে।

মন্ত্রি যখন শুন্‌লেন দশহাজারেই হরিণটি বিক্রি হয়েছে তখন বুঝলেন এ বিধাতা পুরুষ ছাড়া আর কেউ নন্, চল্‌লেন তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে

বামুন মন্ত্রিকে আড়ালে ডেকে বললেন—দেখ মন্ত্রি, তুমি এসে রাজকুমারকে এই

সব বুদ্ধি দিচ্ছ ? কাল আমার সারারাত জেগে হরিণ তাড়াতে হ'য়েছে। শেষকালে অনেক কষ্টে একটা হরিণ জালে ফেলেছি।

মন্ত্রি হেসে বললেন, কেন ঠাকুর, তুমিই তো রাজকুমারের কপালে লিখেছ—হরিণ ধরে তাকে খেতে হবে। পেছু হট্‌লে চল্‌বে কেন ? কাল জাল পাত্‌তে বলেছি ঘরের বাইরে—আজ ঘরের ভেতরেই পাত্‌তে বলে দেবো। যেক'রেই হোক তোমাকে হরিণ জোটাতেই হবে।

বেগতিক দেখে বিধাতা-পুরুষ বললেন দোহাই মন্ত্রি মশাই—আমি রাজকুমারকে তার রাজ্য ফিরিয়ে দিচ্ছি—তাকে অমন কাজটি করতে বোলোনা। একদিন হরিণ তাড়িয়েই আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত।

রাজকুমার মন্ত্রীর পরামর্শে ভীল বন্ধুদের নিয়ে তার রাজ্য অধিকার করে বস্‌লেন। আর রাজপুত্রের অনুরোধে এই মন্ত্রিই তার মন্ত্রির স্থান দখল করলেন।

* * * *

গল্প যখন শেষ হ'ল—মিণ্টু আর টুণ্টু তখন ঘুমিয়ে পড়েছে, আর মণ্টু চোখ দু'টো বড় বড় করে গল্প গিল্‌তে গিল্‌তে বল্‌ছে— হুঃ।

শ্রীঅখিল নিয়োগী

শিলং ভ্রমণ

আমরা গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রায়ই শিলংএ যাই। আমরা যেখান থেকে রওনা হই সেই সহরের নাম গৌহাটী। আমরা গৌহাটীতে থাকি। গৌহাটী থেকে শিলং খুব কাছে। এখান থেকে শিলং ৬৩॥ মাইল। শ্রীহট্ট ছাড়া যেখান থেকে হোকনা কেন শিলং যেতে হলে গৌহাটী দিয়ে যেতে হবে।

আসামের রাজধানী শিলং। ইহা অতি স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর স্থান। আসামের শাসনকর্ত্তা বার মাসই শিলংএ বাস করেন। বাঙ্গালাদেশের মত আসামে গ্রীষ্ম ও শীতকালের রাজধানী নেই।

শিলং মোটরে যাওয়া যায়। শিলং যাবার জন্য দু'বার মোটর ছাড়ে! সকাল সাতটায় ও দুপুর একটায়। আমরা প্রায়ই সকালের মোটরেই শিলংএ যাই।

গৌহাটী থেকে খানাপাড়া পর্য্যন্ত একেবারে সোজা রাস্তা। কিছু দূরে গেলেই পাহাড়ে রাস্তা আরম্ভ হয়। খানাপাড়া থেকে নয় মাইল গেলে বরণীহাট নামে এক জায়গা আছে। এখানে Inspection Bungalow, ডাক ঘর ইত্যাদি আছে।

গৌহাটী থেকে নংপো ৩৩ মাইল দূর। এখানে শিলংএর গাড়ী আর গৌহাটীর গাড়ী একত্র জড় হয়। নংপোতে ডাকবাংলা, চা খাবার ঘর ডাকঘর ও থানা ইত্যাদি আছে। এখানে জলযোগ এবং আহারাদির বন্দোবস্ত আছে।

নংপো থেকেই রাস্তা দিয়ে খাসায়া লোকদের যাতায়াত করতে দেখা যায়। শিলং যাবার পথের দৃশ্য অতি মনোরম। শিলংএর নয় মাইল দূরে বড়পানী নামে এক জায়গা আছে। এখান থেকেই সরল গাছ (Pine Tree) দেখতে পাওয়া যায়। শিলং প্রায় ৫০০০ ফিট্ উঁচু।

চেরাপুঞ্জি শিলং থেকে ৩১ মাইল দূরে। এক দিন আমরা সেখানে গিয়েছিলুম। চেরাপুঞ্জিতে মোটর করে যাওয়া যায়। ডামপেপ্ নামে এক জায়গা থেকে ৬।৭ মাইল ব্যাপী স্থানের দৃশ্য অতি মনোহর। কোন কোন স্থানে একখানা মোটর যাবার পথ মাত্র, অন্য দিক থেকে মোটর এলে বিপদের কথা। ডানদিকে পাহাড় এবং বাঁ দিকে ১,৫০০।২,০০০' ফিটের "গহ্বর" (Gorge)। এই দৃশ্য না দেখলে বোঝা যায় না। চেরাপুঞ্জি থেকে ৩ মাইল দূরে মোসমাই জল প্রপাত। দিন পরিষ্কার থাকলে এই একটী বিশেষ দেখ্‌বার জিনিষ। এখানে খৃষ্টানদের ধর্ম্মপুস্তকের খুব বড় লাইব্রেরী আছে। এখানে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী বৃষ্টি হয় তা তোমরা বোধ হয় সকলেই জান। শিলংএর খাসীয়ারা প্রায়ই বলে থাকে তা'রা চেরাপুঞ্জি কিম্বা শেলা* থেকে আসে। আর একটী কথা এখানে বলে রাখি, যে কমলা লেবু সিলেট থেকে আসে বলে জানি কিন্তু আসলে সেগুলো শেলা থেকে আসে। এখানে একটা গুহা আছে, অনেকে তা

* শেলা খাসিয়া-জয়ন্তীয়া পাহাড়ের অন্তর্গত একটী জায়গা।

দেখ্‌তে যান। এর কিছু দূরে নকালিকাই জল প্রপাত, কিন্তু এই জল প্রপাত দেখ্‌তে হ'লে শিলংএ একদিনে ফিরে আসা যায় না। বলতে ভুলে গেছি খৃষ্টানদের ধর্ম্ম পুস্তকাগারটী Welsh Mission দের। চেরাপুঞ্জিতে David Scott সমাধি স্তম্ভ আছে। David Scott চেরাপুঞ্জির সংস্থাপক এবং আসাম অঞ্চলে গবর্ণর জেনেরেলের এজেণ্ট ছিলেন।

ওয়ার্ড লেক

শিলং চেরাপুঞ্জির পরে স্থাপিত হয়। শিলংএ অনেক জলপ্রপাত আছে। নীচে তাদের কয়েকটীর নাম দেওয়া গেল—

Elephant Falls শিলং থেকে প্রায় ৭ মাইল দূরে, চেরাপুঞ্জির রাস্তা দিয়ে যেতে হয়; তারপরে Muflong Road দিয়ে। এই জায়গাটী বনভোজনের সুন্দর স্থান।

Spreadeagle Falls শিলং থেকে ৩ মাইল দূরে, Polo Groundএর

কাছে। ঈগল পাখীর ডানার মত দেখতে বলে এই জল প্রপাতের নাম Spread-eagle Falls হয়েছে।

Bishop and Beadon Falls শিলং থেকে ৩৷৹ মাইল দূরে, মৌলায়ের কাছে। মৌলায়ে মোটর থামে। Beadon Falls থেকে জলের তেজ নিয়ে সুবিখ্যাত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এবং তার ভাই শ্রীযুক্ত সাধনচন্দ্র রায় মহাশয় শিলংএ বৈদ্যুতিক আলো দিচ্ছেন।

Crinaline Falls এইটী শিলংএর ভেতরে Pine Mount Schoolএর কাছে। আগে এই জল প্রপাতে খুব স্রোত ছিল, কিন্তু এখান থেকে এখন জলের কল নিয়েছে বলে অব আগের মত স্রোত নেই। Sweet, Seven, Grunners নামে আরও অনেক জল প্রপাত আছে।

শিলংএ একটী Pasteur Institute আছে। আগে এদিককার লোকদের পাগ্‌লা কুকুরে কামড়ালে কশৌলি যেতে হত। ১৯১৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বাবা আমাকে অত দূর নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন শিলংএ Pasteur Institute হয়-নি।

এই দেশের ভাষা খাসীয়া। এ একেবারে আলাদা ভাষা। আমরা যেমন নামের আগে বাবু, শ্রীযুক্ত, লিখি খাসীয়ারা পুরুষের নামের আগে উ (u), মেয়েদের নামের আগে কা (ka) লেখে। খাসীয়া পুরুষের চাইতে খাসীয়া মেয়েরা বেশী পরিশ্রমী। একজন চাকরাণী রাখ্‌লে একটা সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীর কাজ সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়। খাসীয়া ভাষায় কুমারীদেরকে কন্‌থেই (kynthei) বলে। চাকরাণী-দেরকেও এই বলে ডাকে। আর একটী কথা খাসীয়ারা বাবুর স্ত্রীলিঙ্গ "বাবুনী" করেছে। আসামী বাঙ্গালী মেয়েদেরো "বাবুনী" বলে ডাকে। যেমন বাবু হরকিশোর, বাবুনী হরকিশোর।

শিলংএর Ward Lake দেখবার জিনিষ। এটী কৃত্রিম হ্রদ। কলকাতার ইডেন্ গারডেনে যে জলাশয় আছে অনেকটা তারই মত কিন্তু তার চাইতে অনেক বড় এবং সুন্দর। এখন নতুন কাউন্‌সিল হল্ (Council Hall) একটী দেখবার জিনিষ হয়েছে। এখানে আসাম সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ করা হয়।

Welsh Missionদের একটী খুব ভাল হাসপাতাল আছে। এই হাসপাতালে আজকালকার মতে চিকিৎসার খুব সুবিধা আছে। এটী Gauhati Shillong Roadএর কাছে একটী পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এই গৃহটী শিলং যাত্রীদের চোখে প্রথমে পড়ে! শিলংএ একটী সরকারী হাসপাতাল আছে।

শিলংএ সপ্তাহে বড় বড় তিনটী হাট বসে—বড় বাজার, ছোট বাজার ও লাবান বাজার। এই হাটগুলোর বস্‌বার একটী বিশেষ নিয়ম আছে। এ সপ্তাহে যদি বড় বাজার রবিবারে বসে, আস্‌ছে বারে সোমবারে, তার পরের সপ্তাহে মঙ্গলবার বস্‌বে। বড় বাজারের এই নিয়ম। ছোট বাজার বড় বাজারের তিন দিন পরে বস্‌বে। লাবান বাজার ছোট বাজারের তিন দিন পরে বস্‌বে। সপ্তাহে তিনবার হাট বস্‌তেই হবে। যে দিন বড় বাজার বসে সে দিন শিলং যাত্রীদের বাজারটী একবার দেখে আসা উচিত। বড় বাজার একটী পর্ব্ব বিশেষ। এই বাজারের আগের দিন সাধারণ খাসীয়ারা স্নান করে, কাপড়-চোপড় ধোয়। এই সব হাটে অনেক দূর থেকে লোক আসে, এমন কি চেরাপুঞ্জি থেকেও লোক আসে। "মৌচাকের পাঠক-পাঠিকারা" যদি কখন শিলংএ যান, তাঁরা যেন বড় বাজারে অন্ততঃ একবার যান। আর একটী জ্ঞাতব্য কথা লিখি, খাসীয়াদের "বার" বড় বাজারে দিন থেকে গণনা করা হয়।

১৮৯৭ খৃঃ অব্দে আসাম এবং বাংলা দেশে যে বড় ভূমিকম্প হয়, তাতে শিলংএর বিশেষ ক্ষতি হয়। আগে শিলংএ ইটপাথরের বাড়ী ছিল। এই বাড়ীগুলোর প্রায় সমস্তই ভূমিকম্পে পড়ে যায়। অনেক লোকের মৃত্যুও হয়েছিল। এই ভূমিকম্পের পরে বাড়ীগুলো টিন, খড়, কাঠ এবং ইক্‌ড়া দিয়ে তৈরী হচ্ছে। এখন শিলংএ ইট পাথরের বাড়ী নেই বল্লেই হয়। গৌহাটীতেও তাই।

আর একটী কথা, শিলংএ "থাপায়" যেন "মৌচাকের পাঠক-পাঠিকারা" একটী বার চড়েন। "থাপা" একটী বেতের চৌকি বিশেষ। এই চৌকিটাকে লোকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে যায় এবং এই চৌকিতে লোক বসে। আগে গৌহাটী থেকে শিলং যেতে হলে এই "থাপা" করে যেত। এই "থাপার" মত আর একটী জিনিষে

এলিফেন্ট জলপ্রপাত
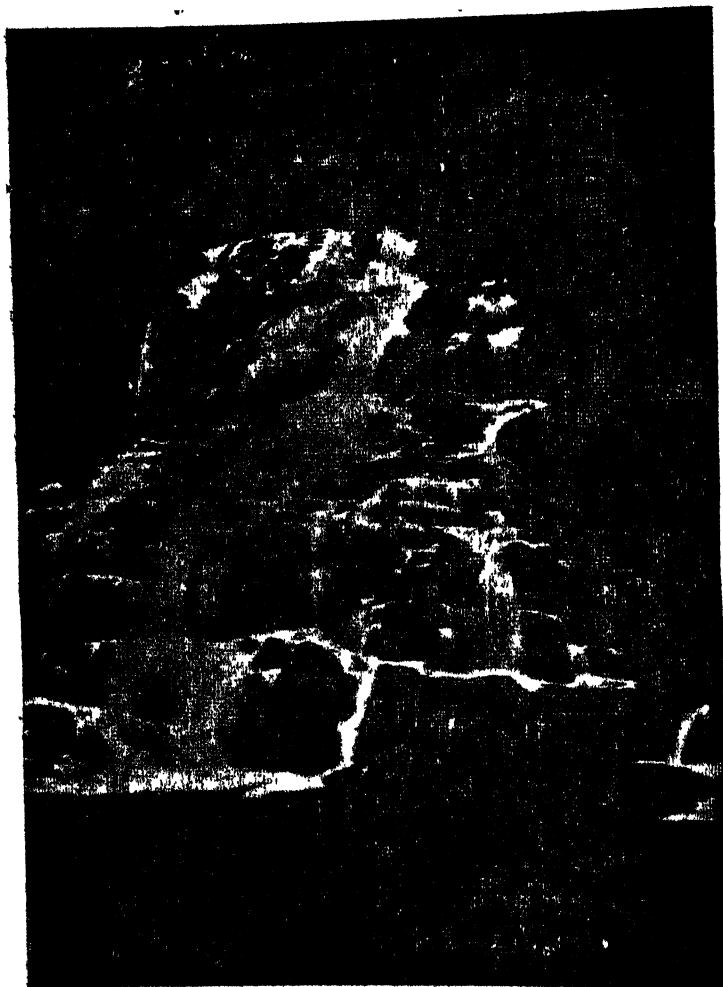
বাজারের জিনিষ-পত্র লোকে বয়ে নিয়ে যায়। "থাপাটী" হ'ল চৌকির মত, এটী হোল তীরের তূণের মত! এর নাম হচ্ছে "কাখো"।

মে মাসের শেষা.শষি জুন মাসের আরম্ভে খাসীয়াদের একটী বিশেষ পর্ব্ব। শিলং থেকে ৯।১০ মাইল দূরে (পাহাড় দিয়ে, রাস্তা দিয়ে আরও দূরে) নংক্রেম নামে এক রাজ্য আছে। সেই রাজ্যকে প্রায় স্বাধীন বলতে হ'বে। সেখানে বছরে একবার করে নাচ হয়, এবং নাচের পরে ঐ দেশীয় নিয়মে পূজো হয়। ঐ নাচে একটী বিশেষত্ব আছে। পুরুষ এবং মেয়েরা বৃত্তাকারে নাচে। মেয়েরা কুমারী। কিন্তু ওরা ইংরেজদের মত নাচে না, আলাদা-আলাদা নাচে। এই নাচের সকলেই প্রশংসা করেন। নাচের পরে পুরোহিত মুরগী-কাটে এবং ডিম ভাঙ্গে, এবং তার সঙ্গে কি জানি কি মন্ত্র বলে। বৎসরের ফলাফল এর দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। "মৌচাকের পাঠক-পাঠিকারা" যদি কখনও শিলংএ সেই মাসে যান, তা' হ'লে নংক্রেমে তাঁরা একবার যেন যান। নংক্রেমের নাচের দিন শিলংএর সব আফিস, স্কুল বন্ধ হয়। নংক্রেমে একটী বড় মেলা বসে।

খাসীয়াদের একটা ভয়ানক নিয়ম আছে। ওরা সাপের পূজো করে। এই পূজোর জন্য মানুষের রক্তের দরকার। এই রক্ত নাকের হওয়া চাই। সেই জন্য মাঝে-মাঝে শোনা যায় দু' একটী খাসীয়া নিরুদ্দেশ হয়েছে। কিন্তু ভয় নেই, সাপ "উদ্‌খারের" (যারা খাসায়া নয় তাদের রক্ত চায় না, খাসীয়াদের রক্ত চায়।

শ্রীমনোভিরাম বড়ুয়া

ময়নামতীর মায়াকানন

দুই

বোম্বাই-ফড়িং

আমরা সেই ভয়াবহ অরণ্য থেকে পালাবার জন্যে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হ'তে লাগলুম।

চলতে চলতে বার'বার পিছনে তাকিয়ে সেই একই দৃশ্য দেখলুম—বনের এক

জায়গায় গাছপালা অত্যন্ত, অস্বাভাবিক ভাবে দুলছে আর দুলছে! কেন দুলছে, কে দোলাচ্ছে?

বাঘা আমাদের পায়ে পায়ে জড়িয়ে চলতে লাগল, কিন্তু ভয়ে সে তখনো জড়সড় হয়ে আছে!

বনের ভিতরে কী যে বিভীষিকা লুকিয়ে আছে এবং বাঘা যে কি দেখে ভয়ে অমন মুষড়ে পড়েছে, অনেক ভেবেও তার কোন হদিস পেলুম না!

কুমার বললে, "আমার বাঘা বাঘ দেখেও ভয় পায় না। কিন্তু এর অবস্থাই যখন এমন কাহিল হয়ে পড়েচে, তখন এটা বেশ বোঝা যাচ্চে যে, বনের ভেতরে নিশ্চয়ই কোন ভয়ঙ্কর কাণ্ড আছে।"

বিমল দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললে, "চুপিচুপি ওখানে গিয়ে আমি একবার দেখে আসব কি?"

আমি তাড়াতাড়ি ডানপিটে বিমলের হাত চেপে ধ'রে বললুম, "তুমি কি পাগল হ'লে বিমল? বিপদকে যেচে ডেকে আনবার কোন দরকার নেই।"

বিমল বললে, "আচ্ছা, আপনি যখন মানা করচেন, তখন আর যাব না!"

আমরা আবার অগ্রসর হলুম। আশে-পাশে আরো অনেক ঝোঁপ, জঙ্গল আর বন রয়েছে। কেন জানি না, সেগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমার বুকটা কেমন ছাঁৎ-ছাঁৎ ক'রে উঠতে লাগল! প্রতি পদেই মনে হ'তে লাগল, ঐ-সব বন-জঙ্গলের মাঝখানে সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন আমাদের অপেক্ষায় ব'সে আছে! এক জায়গায় শুনতে পেলুম, বনের ভিতরে আবার সেই রকম ধপাস্-ধপাস্ ক'রে শব্দ হচ্ছে এবং প্রতি শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে—বনের ভিতরে যেন কোন পর্ব্বতপ্রমাণ দানব আপন মনে চলা-ফেরা ক'রে বেড়াচ্ছে! যার পায়ের শব্দেই পৃথিবী কাঁপে, না জানি তার আকার কি ভয়ানক! একবার সে যদি মানুষের গন্ধ পায়, তাহ'লে আর কি আমাদের রক্ষা আছে?

আরব্য উপন্যাসের সিন্দবাদ একবার এক দৈত্যের কবলে পড়েছিল। গালিভার সাহেবের ভ্রমণ-কাহিনীতেও দৈত্য-মুল্লুকের কথা আছে। তবে কি ঐ-সব গল্প

কাল্পনিক নয়, আমরা কি সত্যিই কোন দৈত্যদের দেশে এসে পড়েছি ? কিন্তু এ কথায় আমার মন বিশ্বাস করতে চাইলে না।

বিমল বললে, "বিনয়বাবু, আমরা তো কেউ এখানকার কিছুই চিনি না। কোন্ দিক নিরাপদ কি ক'রে আমরা তা জানতে পারব ?"

বিমলের কথা সত্য। আমি চেয়ে দেখলুম, দক্ষিণ দিক—অর্থাৎ যেদিকে সমুদ্র আছে, সেদিকটা বেশ ফাঁকা। সেদিকে বনজঙ্গল নেই, কাজেই কোন লুকানো বিপদেরও ভয় নেই। তার উপরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে খুব বড় একটা পাহাড়ও আছে। মঙ্গল-গ্রহের মত এখানেও আমরা ঐ পাহাড়ের ভিতরে আশ্রয় নিতে পারব। সকলকে আমি সেই কথা বললুম। সকলেই আমার প্রস্তাবে রাজি হ'ল। আমরা তখন সেই পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলুম।

পাখী নেই, প্রজাপতি নেই, মানুষের সাড়া নেই, চারিদিকে খালি বন আর পাহাড় আর সমুদ্র ! আমার মনে হ'ল, আমরা যেন পৃথিবীর সেই বাল্যকালে ফিরে এসেছি—যখন মানুষের নামও কেউ শোনে-নি, যখন পৃথিবীতে বাস করত সুধু প্রকাণ্ড, কিম্ভূতকিমাকার, আশ্চর্য্য সব জানোয়ার !

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, অনেক—অনেক উঁচুতে একঝাঁক পাখী উড়ে যাচ্ছে ! তাহ'লে এদেশেও পাখী আছে ! তাড়াতাড়ি আমি সকলের দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করলুম।

বিমল বললে, "কিন্তু ওগুলো কি পাখী ?"

কুমার বললে, "চিল।"

কমল বললে, "ঈগল।"

আমি বললুম, "কিন্তু চিল কি ঈগলের ডানা তো অত বড় হয় না !"

রামহরি বললে, "ওদের ল্যাজ কি রকম দেখুন !"

তাইতো, তাদের ল্যাজগুলো চতুষ্পদ জীবের মত যে ! কি পাখী এগুলো ?

ভালো ক'রে দেখবার আগেই পাখীর ঝাঁক ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল !

হঠাৎ পিছন থেকে কমল আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল ! চকিতে ফিরে দেখি, কমলের

পিঠের উপরে একটা অদ্ভুত আকারের জীব এসে বসেছে, আর কমল প্রাণপণে সেটাকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই পারছে না!

আমরা সকলে মিলে জীবটাকে মেরে ফেললুম। অদ্ভুত জীব! দেখতে মস্ত-বড় একটা ফড়িঙের মত—প্রায় একহাত লম্বা! কিন্তু তার মুখে সাঁড়াশীর মত দুখানা বড় বড় দাড়া রয়েছে আর তার দেহের দুইধারেও রয়েছে দুখানা ক'রে চারখানা হাত দেড়েক লম্বা ডানা!

রামহরি বললে, "ও বাবা, এযে বোম্বাই-ফড়িং!"

কমলের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার ঘাড়ের পিছনে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে!

কুমার হঠাৎ চেঁচিয়ে, একদিকে আঙ্গুল তুলে বললে, "দেখ, দেখ!"

সেদিকে, তাকাতেই দেখি গাছপালার ভিতর থেকে পালে পালে বোম্বাই ফড়িং বেরিয়ে আসছে! আমি বললুম, "পালাও, পালাও। ওরা আমাদের দেখতে পেলে আমরা কেউ আর বাঁচব না।"

সবাই বেগে দৌড়োতে লাগলুম—ফড়িং দেখে এর আগে মানুষ বোধ হয় আর কখনো পালায়নি।

তিন

পেটের ভাবনা

এই তো সমুদ্রতীর! উপরে, নীলপদ্মের রং-মাখানো অনন্ত আকাশ, নীচে পৃথিবী দেবীর পরোনের নীলাম্বরীর মতন অনন্ত নীল সায়রের লীলা।

সমুদ্রের বুকের উপরে ব'সে সূর্য্যের আলো হাজার হাজার হীরা-মাণিক নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলছে আমরা ব'সে ব'সে খানিকক্ষণ তাই দেখতে লাগলুম।

বিমল প্রথমে কথা কইলে। সে বললে, "বিনয় বাবু, এখন উপায়?"

—"কিসের উপায়?"

—"আমরা যে পৃথিবীতে এসেচি, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কোন্ দেশ, কোন্ দিকে, কত দূরে মানুষের বসতি আছে, তা আমরা জানি না। এখানে থাকাও সম্ভব নয়, কারণ কি খেয়ে বেঁচে থাকব?"

আমি বললুম, "চেষ্টা করলে বনের ভিতরে শিকার মিলতে পারে।"

বিমল বললে, "হ্যাঁ, মিলতে পারে, কিন্তু তাও বন্দুকের টোটা না ফুরানো পর্য্যন্ত।"

—"বিমল, টোটা ফুরোবার আগেই আমরা যে এ দেশ থেকে পালাবার পথ খুঁজে পাব না, এমন মনে করবার কোন কারণ নেই।"

—"কিন্তু শিকার পেলেও আমরা বাঁধ্‌ব কি ক'রে? আমাদের সঙ্গে [illegible]াই নেই, আগুন জ্বালতে পারব না।"

—"তা হ'লে আমাদের কাঁচা মাংস খাওয়াই অভ্যাস করতে হবে। মন্দ কি, সেও এক নূতনত্ব!"

রামহরি বললে, "বাবু, ভয় নেই, আপনাদের কাঁচা মাংস খেতে হবে না, আমি আপনাদের বেঁধে খাওয়াব!"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, "তুমি কোথা থেকে আগুন পাবে?"

রামহরি বললে, "কেন, ঐ পাহাড়ের পাশ দিয়ে আসতে আসতে আপনারা কি দেখেন নি, কত ছোট-বড় চকমকি পাথর প'ড়ে রয়েচে!"

আমি আশ্বস্ত হয়ে বললুম, "যাক্, তা হলে আমাদের একটা বড় ভাবনা দূর হ'ল! ইস্পাতের জন্যে ভাবতে হবে না, আমাদের সঙ্গে ছোরা-ছুরি আছে, তাই দিয়েই কাজ চালিয়ে নেব।"

কা

f ল পেটের উপরে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "ও বিনয়বাবু, শুনেই যে আমার ধে পেয়ে গেল! এখন খাই কি?"

নন

হেসে বললুম, "শিকার না পেলে আমাদের হাওয়া খেয়েই বেঁচে থাকবার

এমন স

চেষ্ ত হবে।"

দের খুব

বললে, "কেন বিনয়বাবু, খাবার তো আমাদের সামনেই রয়েচে, হাত

বিমল তা

ব লই হয়!"

মো! ওটা

লে, "সামনে! কোথায়?"

চ্ছ। কর্

বে। জালে, "ঐ দেখ!"

৫

চেয়ে দেখলুম, আমাদের সুমুখে বালির উপরে, অনেকখানি জায়গা জুড়ে হাজার হাজার গর্ত, আর প্রত্যেক গর্ত্তের সাম্‌নে বসে রয়েছে এক-একটা লাল রঙের কাঁকড়া!

বিমল মহা উল্লাসে একটা লাফ মেরে বললে, "কি আশ্চর্য্য, এতক্ষণ আমি দেখতে পাই-নি!"

আমরা সকলেই কাঁকড়া ধরতে ছুটলুম। কিন্তু খানিকক্ষণ ছুটাছুটি ক'রেই বুঝলুম, কাজটা মোটেই সহজ নয়! তাদের কাছে যেতে না যেতেই তারা বিদ্যুতের মতন গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে, কিছুতেই ধরা দেয় না! তারা কেউ আত্মসমর্পনে রাজি নয় দেখে আমরা শেষটা গর্ত্ত খুঁড়ে তাদের গোটাকতককে অনেক কষ্টে বন্দী করলুম।

গর্ত্ত খুঁড়তে-খুঁড়তে কমল হঠাৎ একরাশ ডিম আবিষ্কার করলে! মোট একশোটা ডিম!

আমি সানন্দে বললুম, "ব্যাস্, আর আমাদের খাবারের ভাবনা নেই! এগুলো কাছিমের ডিম!"

কমল বললে, "কাছিমের ডিম কি মানুষে খায়?"

—"নিশ্চয়ই খায়! দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন স্থানে কাছিমের ডিম আর মাংসই হচ্ছে মানুষের প্রধান খাদ্য! এখানে যখন কাছিমের ডিম পাওয়া গেছে, তখন আজ রাত্রে আমরা কাছিমও ধরতে পারব।"

বিমল বললে, "তা হলে দেখা যাচ্ছে, ভাগ্যদেবী এখনো আমাদের উপরে একেবারে বিমুখ হন-নি!"

কুমার বললে, "রামহরি, আর তো তর সইচে না—আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো!"

চার

সাগর-দানবের পাল্লায়

পাহাড়ের উপরে এখানেও একটা গুহা খুঁজে নিতে আমাদের বেশী দেরি লাগ্‌ল না। এ গুহাটির সব-চেয়ে সুবিধা এই যে, এর ভিতরটা বেশ লম্বা-চওড়া

হ'লেও মুখটা এমন ছোট যে, হামাগুড়ি না দিয়ে ভিতরে ঢুকবার উপায় নেই। কাজেই আত্মরক্ষার পক্ষে গুহাটি খুবই উপযোগী।

সমুদ্র-তীরে যেখানে কাছিমের ডিম পাওয়া গিয়েছিল, সন্ধ্যার পর আমরা আবার সেইখানে গিয়ে একখানা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইলুম—কাছিম ধরবার জন্যে!

দক্ষিণ আমেরিকায় যে-ভাবে কচ্ছপ শিকার করা হয়, আমি কেতাবে তা পড়েছি। কচ্ছপদের স্বভাব হচ্ছে ডাঙায় উঠে বালির ভিতরে ডিম পাড়া। রাত্রে দলে দলে তারা ডাঙায় ওঠে। স্ত্রী-কচ্ছপরা ডিম পেড়ে বালির ভিতরে লুকিয়ে রাখে। এক-একটা কচ্ছপ একসঙ্গে আশী থেকে একশো বিশটা পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। তার পর ভোর হবার আগেই আবার তারা জলে ফিরে যায়।

শিকারীদের কাজ হচ্ছে, কচ্ছপদের ধ'রে উল্টে দেওয়া। তা হলে আর তারা পালাতে পারে না। উল্টে দেবার সময়ে একটু সাবধান হওয়া দরকার, যাতে কাছিমের ডানা বা মুখের কাছে শিকারীর হাত না পড়ে। কচ্ছপের কামড় বড় সুখের নয়, আর তার ডানার আঘাতও এমন জোরালো যে, এক আঘাতে মানুষের পায়ের হাড় মট্ ক'রে ভেঙে যায়! .. ..এই সব কথা আমি সকলকে বুঝিয়ে দিতে লাগলুম।

আকাশে তখন একফালি চাঁদ দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার আলো এত ক্ষীণ যে, অন্ধকার দূর হচ্ছে না। যে ভয়ানক বন থেকে আমরা পালিয়ে এসেছি, অনেক দূরে একটা জমাট কালো ছায়ার মতন তাকে দেখা যাচ্ছে। তার দিকে যতবার তাকাই, আমাদের বুক অমনি দুরু-দুরু ক'রে ওঠে! ও বনে যে কী আছে, ভগবান্ তা জানেন!

এমন সময়ে সাদা বালির উপরে একটা কালো রেখা টেনে, প্রকাণ্ড একটা কচ্ছপ আমাদের খুব কাছে এসে, চারিদিকে একপাক ঘুরে এল।

বিমল তাকে তখনি ধরতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে চুপিচুপি বললুম, "থামো, থামো! ওটা হচ্ছে কাছিমদের কর্ত্তা। ও আগে এসে চারিদিকে গণ্ডী কেটে রেখে যাচ্ছে। কর্ত্তা গিয়ে খবর দিলে পর আর সব কাছিম এসে এই গণ্ডীর ভিতরে আড্ডা গাড়বে। তারপর আমরা আক্রমণ করব।"

রামহরি বললে, "হ্যাঁ, হুঁ্যা, ঐ যে, কাছিম-ভায়া ফিরে যাচ্ছেই তো বটে!"

আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না, কাছিম-কর্ত্তা ফিরে যাবার পরেই দলে দলে ছোট-বড় কচ্ছপ এসে ডাঙার উপরে উঠল।

তার পরেই আমাদের আক্রমণ! আমরা বেগে গিয়ে তাদের এক-একটাকে ধরে বালির উপরে চিৎ ক'রে ফেলে দিলুম। কাজটা অবশ্য খুব সহজ নয়, কারণ তাদের অনেকেই ওজনে প্রায় একমণ, কি আরও বেশী।

আমরা প্রায় গোটা-দশেক কাছিম বন্দী করলুম—বাকিগুলো জলে পালিয়ে গেল।
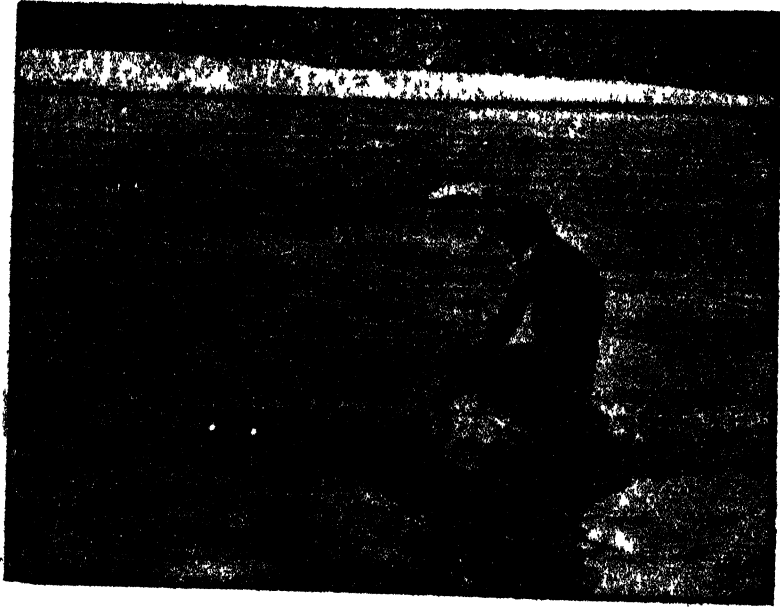
বন্দী কূর্ম্ম-অবতার। একটির উপরে রামহরি।

আমরা আগেই কতকগুলো শুক্‌নো লতা সংগ্রহ করে এনেছিলুম—বন্দীদের পা বাঁধবার জন্যে। সেই লতা দিয়ে আমরা তখনি তাদের বেঁধে ফেললুম।

বিমল বললে, "যাক্, এখন কিছুদিনের জন্যে আমাদের পেটের ভাবনা আর রইল না। এইবারে এ দেশ থেকে পালাবার কথা ভাবতে হবে!"

বিমলের কথা শেষ হতে না হতেই ভীষণ এক বিকট চীৎকারে সমস্ত পৃথিবী যেন পরিপূর্ণ হয়ে গেল! উঃ, তেমন উচ্চ চীৎকার আমি জীবনে আর কখনো শুনি-নি,—যেন হাজারটা সিংহ একসঙ্গে এক স্বরে গর্জ্জন ক'রে উঠল!

সে অমানুষিক চীৎকারে আমাদের সমস্ত শরীর এলিয়ে পড়ল, কেউ আমাদের আক্রমণ করলেও তখন আমরা সেখান থেকে এক পা নড়তে পারতুম না!

আবার--আবার—আবার সেই আকাশ-ফাটানো গর্জ্জন,—একবার, দুইবার, তিনবার!

সমুদ্রের জল থেকে কী ওটা উঠে আসছে— কী ওটা, কী ওটা?

অস্পষ্ট আলোয় তাকে ভালো ক'রে বোঝা যাচ্ছে না—কিন্তু তার মাথা প্রায় তালগাছের সমান উঁচু, আর তার দেহের তুলনায় হাতীর দেহও বিড়ালের সামনে নেংটি ইঁদুরের মতই নগণ্য! সেই ভয়ানক সমুদ্র-দানবের চোখ দুটো আলো-আঁধারির মধ্যে অগ্নি-শিখার মতন জ্ব'লে জ্বলে উঠছে! আমি সভয়ে বললুম, "পালাও, পালাও!"

বিমল কাতর স্বরে বললে, "আমার পা-দুটো যে অসাড় হয়ে গেছে, পালাবার যে উপায় নেই!"

রামহরি একটা আর্ত্তনাদ ক'রে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল!

কুমার আর কমল দুই হাতে মুখ চেপে বালির উপরে বসে পড়ল! এখন উপায়?

আমার দুই চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেল!

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ভাদর-বাদর

ইল্‌সে গুঁড়ি আকাশ ফুঁড়ি' হঠাৎ সুরু রে—
আকাশ চুঁয়ে আবার সুরু ঝুরু ঝুরু রে।
ওরে আজ ভাদরের বাদ্‌লাতে
মন্ মাতে মোর প্রাণ্ মাতে।

আকাশ যেন গোবর-লেপা -- মেঘের প্রলেপে ;
সূর্য্যি মামা কোথায় গেলেন,---ডিচ্ছে বলে কে।
হো মেঘ চাদরে মুখ গুঁজে
ঝিমোন্ তিনি চোখ্ বুঁজে।

ভাদর-বাদর অঝোর ঝরে সজোর আওয়াজে
সবুজ ক্ষেতে লাগায় দোলা অবুজ হাওয়া যে,
ওই তাল্পুকুরের দুই পাশে
সদা-ভেজা যূঁই হাসে।

হিজল তলা পিছল হোলো—যাস্না ওধারে,—
আস্ছে ভেসে ভিজে মাটির গন্ধ সোঁদা রে
ওরে ও জগা তুই আয়না রে
আজ ওধারে যায় না রে।

গন্ধরাজের গন্ধ উধাও—ধারায় ধুয়েছে—;
টাট্কা পুঁইয়ের ডাল খানি আজ হাওয়ায় নুয়েছে,—
ওই লাউ লতাটি কাঁপ্ছে রে,—
বাঁচ্লো যেন হাঁফ্ ছেড়ে!

প্রজাপতির ঝরলো ডানা,- কাঁদ্ছে অলিও,—
হায়, ঝরেছে সই-সোহাগী কেয়ার কলিও।
হায়, বোল্ হারালো বুল্বুলি
বাসায় ওটে চুল্বুলি।

বাদ্‌লা-হাওয়া শ্বেত করবীর পাপ্‌ড়ী ছড়ালো,
ঝর্‌লো বেণু,—ঠাণ্ডা মধু ধূলায় গড়ালো।
হায় আস্‌লো না আর মৌমাছি,
ভিজ্‌তে নাহি কেউ রাজী।

সখ্‌ করে আজ ভিজ্‌ছে চাতক,—ভিজ্‌ছে চাতকী,—
জল্‌ দিয়েছ বল্‌ যে তাদের ভিজ্‌বে নাত কি !
তারা স্নান করে আর পান করে
প্রাণ ভরে আজ গান্‌ করে।

মাথায় টোকা কাদের খোকা— বাঁধের জলে রে
পাতার গড়া না ভাসাতে ওই যে চলে রে।
হঠাৎ ঝাপ্‌টা এলো দ্যাখ্‌না রে
ভিজ্‌লো খোকা এক্‌বারে।

উতল্‌ হাওয়া মন্‌ মাতালো বাদল বেলাতে
আয় কে যাবি দূর দরিয়ায় কলার ভেলাতে –
ওরে আয় জুটি আয় আট্‌চালায়
আজ যাব না পাঠ্‌শালায়।

ভিজে দি কাকের আকুল প্রলাপ শুনছ নাকি হে,
ভিজ এক জলে নীর-হারা ওই ময়না পাখী হে।
সে াছ। রুণ কাতর ডাক্‌ ছেড়ে
র্দ্র ডানা ঝাড়ছে রে।

বান্ ডেকেছে গাং ছাপিয়ে—দু'তীর ছাপালো
দারুণ তোড়ে জোয়ার-জোরে পরাণ কাঁপালো।
একি! হঠাৎ কখন কল্লোলে
জোয়ার এলো পল্বলে!

ঝিম্ খেয়েছে ঝিঁঝির দলে গান্‌টি ভুলেছে,
ব্যাঙের দলে বার্দর আসর জমিয়ে তুলেছে।
আজ এক মিনিটও শান্তি নাই
ক্ষান্ত হবার নাম্‌টি নাই।

চোখ্-জুড়ানো-সবুজ-মাঠের শ্যামল-ক্ষেতে রে
বাদল-হাওয়া উতল হোলো—উঠ্‌লো মেতে রে-
আজ একলা বসে বন্ গাঁতে,
প্রাণ মাতে মোর মন্ মাতে।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

সবজান্তা

পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ ২০০০,০০০ অন্ধলোক আছে।

* * *

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর মেরু আবিষ্কারের সময়ে যে টিনে [illegible]ভরা মাংস ব্যবহার করা হয়েছিল—তার একটা টিন সে দিন খুলে দেখা গিয়েছে [illegible]নও সেই মাংস খাবার উপযুক্ত আছে।

আমেরিকা প্রতি বৎসর ৪,০০০,০০০ খানি মোটরকার তৈরী করে।

* * * *

সেদিন পৃথিবীময় টেলিফোনের ৫০ বৎসর জন্মোৎসব হয়ে গেল। টেলিফোনের আবিষ্কার কর্ত্তা হচ্ছেন অধ্যাপক গ্রেহাম বেল। তিনি একজন বধির মেয়েকে বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রী যাতে কোন রকমে শুনতে পান এই রকম একটা যন্ত্র আবিষ্কার কোরতে গিয়ে টেলিফোন আবিষ্কার করে ফেলেন।

* * * *

সেদিন লণ্ডনের ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রিজে দাঁড়িয়ে একটা ছেলে ব্রিজের তলায় একটা ষ্টিমার দেখবার জন্যে লোহার গরাদের মধ্যে দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দিয়েছিল। শেষে গরাদের ভিতর থেকে আর মাথা বেরোয় না। ছেলেটা কাঁদতে আরম্ভ কোরলে—একটা দুইটা কোরে ক্রমে হাজার হাজার লোক পুলের উপর দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ীতে ও মোটরের ভিড়ে পুল বন্ধ হয়ে গেল। হাসপাতাল থেকে ডাক্তারের দল এল, দলে দলে পুলিশ এল—খবর পেয়ে Fire Brigadeও এসে হাজির। অত লোকের চেষ্টাতেও ছেলেটার মাথা গরাদ থেকে বার করা গেল না। অনেকক্ষণ পরে অনেক গুলো মিস্ত্রী দিয়ে লোহার গরাদটা কাটাবার পর ছেলেটার প্রাণ রক্ষা হয়। তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কিছু দেখবার জন্যে অত ব্যস্ত হয়ে পড় না।

* * * *

মাটির খাবার—আমাদের দেশে ছেলে মেয়েরা মাটির খাবার তৈরী করে খেলা করে কিন্তু তা কখনও মুখে দেয় না। কিন্তু আফ্রিকার নীল নদী জলে যে মাটি আছে ঐ দেশের অধিবাসীরা তাতে খাবার প্রস্তুত করে এবং উহা আগুণে পুড়িয়ে আনন্দের সঙ্গে ভক্ষণ করে। পণ্ডিতেরা বলেন ঐ খাবার খেতে মিষ্টি এবং খেলে অসুখ করে না।

* * * *

পরিষ্কার জল—বাংলার পশ্চিমে যে সকল নদী আছে তা গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হয়ে যায়। ঐ দেশের অধিবাসীরা শিক দিয়া বিঘৎ খানেক গর্ত্ত করে এবং কিছুক্ষণ বাদে যখন গর্ত্ত ছাপিয়ে উঠে তখন তারা সেই জল এক প্রকার যন্ত্র দিয়ে টেনে তুলে। ঐ জলে খুব হজমী গুণ আছে এবং খেতে খুব সুস্বাদু।

* * * *

সব চেয়ে বড় মানচিত্র—ইতালীর রোম নগরে একটি বৃহৎ মানচিত্র আছে। তাহা নাকি বিশ হাত লম্বা ও চব্বিশ হাত উচ্চ, তাহা একটি বড় ঘরে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। সেই মানচিত্র হচ্ছে ইতালী মানচিত্র। তাতে ইতালীর সকল অংশ আঁকা আছে, এমন কি রাস্তা পর্য্যন্ত আছে। উহা করতে প্রায় চার লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।

শ্রীহিরণকুমার বসু

পুরস্কার প্রতিযোগিতা

আমরা প্রতিযোগিতার জন্যে এবারে অনেক ছবি পেয়েছিলাম। কিন্তু ভাল ছবি খুব কমই আমাদের হাতে এসেছে। সেই জন্য প্রথম পুরস্কারটা ভাগ কোরে শ্রীমীরা চৌধুরী ও শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্যকে দেওয়া হোল।

নূতন ধাঁধা

নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি সাজিয়ে জীবজন্তুর নাম কর :—

১। ন , ক ট ক র ক , া

২। া শ ক ক ল ,

৩। ত জ হ স ল ী

ধাঁধার উত্তর

মন্দির, মর্কট, ময়ূর, মাদুর, মাদল, মাদুর, মল্ল, মুগুর, মোক্তার, মাতঙ্গ, মাহুত, মেঘ, মোট, মুটে, মুরলী, মাছ, মেছুনী, মা, মুকুর, মেয়ে, মাদুলী, মদ।

নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকাগণ কবিতায় উত্তর দিয়েছেন—

শ্রীসুব্রত সরকার (কলিকাতা) শ্রী.শেফালিকা দেবী (কলিকাতা), ভুটবিহারী চট্টোপাধ্যায় (পাটনা), শ্রীইন্দুপ্রভা দত্ত শ্রীসুধাংশুকুমার (খুবড়ী), রায় (বহরমপুর), ননীগোপাল সরকার (জামসেদপুর), অমিয়া, ইন্দিরা, অশোক ও অজিৎ (রংপুর), বিনয়কুমার ও অনসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পাটনা), বিশ্বনাথ দত্ত ও গোপীনাথ কুণ্ডু (পাবনা), ক্ষীরোদবিহারী রায় (আলিপুর), শ্রীপঙ্কজবাসিনী চট্টোপাধ্যায় (খোশবসপুর), রমাপ্রসাদ সাধুখাঁ (কলিকাতা), শ্রীবাণীদেবী (কলিকাতা), রনেন্দ্রমোহন সিংহ (কলিকাতা), শ্রীকমলাদেবী (কুচবিহার), শ্রীরেণুকণা দেবী (রাজসাহী), শিবদাস সরকার (হাবড়া), হরিহরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা), শ্রীসুনীতি দেবী (শিলং), শ্রীঅবালিকা দেবীচৌধুরাণী (শেরপুর), শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী (হাজারীবাগ), শ্রীহাবেবা খাতুন, মিঠুকি, বাহুল্ক, কিতাশ, কামু,

হরি, আশু, নিতাই (শাঁকারী), গৌরী ও অরুণ সেনগুপ্ত (ইমসিন্), হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় (তেলিনীপাড়া), শ্রীমেনকা ও নন্দরাণী সরকার (কলিকাতা), দেবীভূষণ ভট্টাচার্য্য (কৃষ্ণনগর), তপোব্রত বাগচী (নদীয়া) লতিকা, মায়া, রেণুকা (কলিকাতা), শ্রীবনলতা গুহ (হবিগঞ্জ), গুণেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (শ্রীহট্ট), দীপেন্দ্রনাথ সরকার (পাটনা), পূর্ণেন্দু সেনরায়, প্রশান্তকুমার রায় ও কুমারী জ্যোৎস্না রায়, অসিমা বসু (পাটনা), শ্রীসরযূবালা দাসী (বাঁকুড়া), সুবলচরণ মিত্র (বাজেশিবপুর), কুমারী শৈলজা দেবী (বৈদ্যনাথ), শ্রীলাবণ্যময়ী দে (জামসেদপুর), প্যারীমোহন দে (শিবরামপুর), মোবারক আলি মিয়া (বরিশাল), নগেন্দুশেখর দত্ত, হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, নিবারণচন্দ্র তালুকদার, দীনেন্দ্রকান্ত চৌধুরী (নওগাঁ), বিজিতকুমার চৌধুরী (শ্রীহট্ট)।

নিম্নলিখিত গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ ধাঁধার উত্তর দিয়েছেন।

সিতাংশু, শান্তি, পৃথ্বীশ দাস, ডালিম, মুনীশ (কলিকাতা), বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (বাজেশিবপুর), কুমারী ধীরা দত্ত (গারোপাহাড়), সুশীলগোবিন্দ সাহা (কলিকাতা), সুশীলচন্দ্র মজুমদার ও অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার (খুলনা) বিশ্বময় দাসগুপ্ত (দিনাজপুর), বিমলচন্দ্র দত্ত (পাটনা), সূর্য্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাগলপুর), বীরেন ও ভবেশ ভাদুড়ী (নবদ্বীপ), প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র (কলিকাতা), শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল (নদীয়া), শ্রীপ্রেমলতা বসু (বরিশাল), সমরেন্দ্র ও রনেন্দ্র রায় (কলিকাতা), কুমারী উমা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরেণুকণা দেবী (এলাহাবাদ), রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (নশীপুর), অশোককুমার সরকার (কলিকাতা),হারাধন চট্টোপাধ্যায় (ভাগলপুর), শ্রীবিভা চৌধুরী ও ললিতা দেবী (কলিকাতা), শ্রীসরযূবালা চৌধুরী (জলপাইগুড়ি), চন্দ্রশেখর চট্টোরাজ (পুরুলিয়া), রণজিৎকুমার বাগচী (মেদিনীপুর), Members Babupara Boys Club (Lalmonirhat)। সুধাংশুভূষণ মিত্র (দার্জ্জিলিং), গোবিন্দলাল লাহিড়ী (রাঁচী), পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (রাঁচী), শ্রীসুহাসিনী দাসগুপ্তা (রংপুর), অজিতকুমার মিত্র (হুগলী), অরুণানন্দ সেন (মুঙ্গের), সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (পাটনা), প্রদোষচন্দ্র ঘোষ (ভাগলপুর), সুবোধকুমার দে (রেঙ্গুন), শ্রীশিবানী রায় (সিমলাপাহাড়), শ্রীদীপ্তি সরকার (কিশোরগঞ্জ), উর্ম্মিলা সেন (মজঃফরপুর), সুলতা, পবিত্রা, শোভনা, জ্যোৎস্না, জয়ন্ত, কীর্ত্তি, দীপ্তি ও আরতি (ডালটনগঞ্জ), শ্রীইলারাণী ও তরুণচন্দ্র রায় (আরা), শ্রীপূর্ণিমারাণী ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (মুজঃফরনগর), শ্রীবীণাদেবী (কলিকাতা), শ্রীযোগমায়া ঘোষ (কলিকাতা), শ্রীগীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা), শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য (কামারহাটি), কুমারী আভা রায় (ঢাকা), অমৃতাংশু চক্রবর্ত্তী (গয়া), জগদীশচন্দ্র গাঙ্গুলী (ঢাকা), শ্রীনীলিমা গাঙ্গুলী, সৌরেন্দ্রনাথ দে (পাটনা), প্রমীলাবালা সরকার (পাবনা), সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশুভা দেবী (পুরী), শ্রীইন্দিরা সেন (কলিকাতা), অজিতকুমার সেন (কলিকাতা), বেলা ও নীলিমা (কলিকাতা), নির্ম্মাল্য বাগচী (বিলাসীপাড়া), শ্রীমীরা চৌধুরী (কোটালপুকুর), সুধাংশুমোহন দত্ত মজুমদার, ভোলানাথ সেন (চন্দননগর), শচীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত (গোলকগঞ্জ), শ্রীপুষ্পকুন্তলা ও জ্যোৎস্নাময়ী পালিত (সিমলা), শ্রীশান্তিলতা চট্টোপাধ্যায় (আরিয়াদহ), দেবব্রত ভাদুড়ী (পাটনা), মনোভিরাম বরুয়া (গৌহাটি), বারীন্দ্র চৌধুরী, (শিলং), সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (তেলিনীপাড়া), যোগীন্দ্র ও কমলেশ (বেনারস), নির্ম্মলকান্তি সান্যাল (কলিকাতা), সুধাময়ী বসু (কলিকাতা), দিলীপকুমার ও রনজিৎকুমার মিত্র (কলিকাতা), রাজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় (হাবড়া), সুনীলকুমার বসু (কলিকাতা), শৈলেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কুমিল্লা), পি, মুখার্জ্জী

(হাজারীবাগ), বিমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (ফৈজাবাদ), শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ ঘোষ (ইন্দোর), চণ্ডেশ্বর চক্রবর্ত্তী (টাঙ্গাইল), রাজেন্দ্রমোহন দাস (বাঁকিপুর), সরোজকুমার সেন (গৌহাটী), সত্যেন্দ্রনাথ ও দাসুগোপাল মুখোপাধ্যায় (সাহেবগঞ্জ), ব্রজেন্দ্রগোপাল ঘোষ (মালদহ), শ্রীপ্রতিভা নিয়োগী (কলিকাতা), সুধাংশুশেখর পুরকায়স্থ (শ্রীহট্ট), সুবোধ, প্রবোধ, পূর্ণেন্দুনারায়ণ বিশ্বাস, বৈদ্যনাথ, পারুল (পাটনা), মাধুরী, নির্ম্মলা, মঞ্জরী ও দেবাশীষ দাশগুপ্ত (কলিকাতা), সরোজ, হিমাংশু ও সুকুমার মিত্র (কটক), বালকবালিকা পাঠ্য সমিতি ([illegible]), গোপালচন্দ্র রায় (হাজারীবাগ), শুভ্রাংশুশেখর মজুমদার, শ্রীবিভা চৌধুরী (কলিকাতা), সুকুমার পাল (শ্রীহট্ট), শ্রীকণা দাসগুপ্তা (দমদমা), জ্যোতির্ম্ময় আনন্দময় ও তস্য দিদি কাঞ্চনপ্রভা দেবী (কুড়িগ্রাম), অশোক, হেনা, বেলা, পারুল, (ঘাটশিলা), অমিয়কুমার দাশগুপ্ত (ঢাকা), অর্পণা নাগচৌধুরী, শ্রীশান্তিলতা দেবী (আজমীর), শ্রীপুষ্পিতা দেবী (কলিকাতা), রণজিৎ (কলিকাতা) ইন্দুভূষণ দে (কলিকাতা), শ্রীভারতী সমাদ্দার (পাটনা), দেবী, শুকু, ও অমু (কলিকাতা), রাসবিহারী প্রসাদ সিংহ (পাটনা), শিশু, রুণু, নীরু, সুজিৎ ও বিমলচন্দ্র সেন (দিল্লী), কুমারী পারুলশান্তি ধর (সিমলা), দেবব্রত লাহিড়ী (কলিকাতা), পুতুলরাণী অমল দা (কলিকাতা), ধূর্জ্জটীশরণ রায় (বাঁকুড়া), সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় (দিল্লী), শ্রীপ্রফুল্লময়ী রায় (বাঁকুড়া), শুভেন্দুবিকাশ সেন (গয়া), দেবেন্দ্র, জিতেন্দ্র দত্ত (পাটনা), শ্রীখোকন (সুনামগঞ্জ), শিশিরকুমার পাকড়াশী (চুঁচড়া), ডলি ঘোষ (কলিকাতা), সুধীর, ভাইটি উষা ও মুকুল (যশোহর), প্রভাতকুমার কর (কলিকাতা), শ্রীনীহারমালা দেবী (বরিশাল), জ্যোতিষচন্দ্র লাহিড়ী (মধুপুর), কুমারী অশোকা সেন (কলিকাতা), সুহাসকুমার মুখার্জ্জি (রাজসাহী), প্রবীরকুমার ঘোষ (বারাকপুর), দীনেশকুমার পালিত (চন্দননগর), মিস্ মাধুরী মিত্র (কলিকাতা), অশোকা, পরিমল দত্ত (বেন্দ্রপাড়া) মাধবানন্দ মাড়গোলার (কলিকাতা), বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় (আজমীর), প্রমিলা রায় (পুরী), বৈদ্যনাথ মিশ্র (কলিকাতা), প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় (গয়া), সুশীলমাধব বড়ুয়া (বগটীবাড়ী) অশোকরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (বেনারস), বাসন্তীরাণী ঘোষ (কলিকাতা), শ্রীসাবিত্রী সেন (কটক), প্রফুল্ল সুবেশ, প্রদোষ (রাজমহল), শ্রীঅরুণা সেন (থানা বড়ে), শ্রীশিবানী দেবী ও শ্রীসতী দেবী (তিনধেরিয়া), বিমলেন্দু মজুমদার (ফরিদপুর), শ্রীরেণুশ্যাম (কলিকাতা), অমরেন্দ্রনাথ রায়, মিনু পনু ও চিনু (লক্ষ্ণৌ), হীরালাল, কালাচাঁদ, মণীন্দ্র ও বারীন্দ্রনাথ ঘোষ (এলাহাবাদ); বারীন্দ্রনাথ মিত্র (ফরিদপুর), রাকেশলোচন সেন (ঢাকা)।

কলিকাতা—২৯, কালিদাস সিংহের লেন, কিনিক্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅতীন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

৭ম বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৩৩ [ষষ্ঠ সংখ্যা

তেপান্তরের মাঠ

সাত সমুদ্দুর তের নদা লঙ্কা দ্বীপের পার
তেপান্তরের মাঠে এল রাতেব অন্ধকার ;
তেপান্তরের মাঠের মাঝে বোম্বা সিমূল গাছ
আগ্ ডালে তার বসে আছে কাঁকুড় সিঙ্গি মাছ ;
মাছের পেটে মাণিক জ্বলে হাজার বাতির আলো
সারা মাঠটি আঁধার ঘেরা ঘুটঘুট্টে কালো ;
যায়না দেখা গাছের পাতা যায়না দেখা মাটি
জলের ধারে কোলা ব্যাঙ্ চল্‌ছে হাঁটি হাঁটি ;
আকাশ পানে চোখ দুটো তার পাতাল পানে ঠ্যাঁ
আস্ শাঁওড়ার ঝোপের মাঝে হুতুম থুমোর ছাঁ ;

ঘুমের ঘোরে কাঁকুড় সিঙ্গে দ্যায়লা করে হাঁসে
হাজার বাতি উঠ্‌ল জ্বলে মাঠের চারি পাশে ;
হকচকিয়ে কোলা ব্যাঙ ওপর পানে চায়
গুটি গুটি হুতুম থুমো ধরল এসে তায় ;
ফাটাল ব'য়ে ময়াল সাপ গাছের ডগে চড়ে
ঘুম ভেঙ্গে যায় কাঁকুড় সিঙ্গের মাথার টনক নড়ে ;
এক লাফেতে পালিয়ে গেল কাঁকুড় সিঙ্গে মাছ
পিছলে পড়ে ময়াল সাপ তেলা সিমুল গাছ ;
হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে গেল সিমুল গাছের ডগা
কাঁকলে ভাঙ্গা ময়াল সাপে নিয়ে গেল বগা ;
মনের সুখে কাঁকুড় সিঙ্গে সাগর দোলায় দোলে
হেঁসে ওঠে খোকনমনি জেগে মায়ের কোলে।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

ব্যাঙ ও ব্যাঙাচী

"গ্যাঙোর গ্যাঙোর গ্যাঙ্, ডাকিতেছে কোলা ব্যাঙ্"—হাসির কথা বটে কিন্তু বর্ষাকালে বিছানায় শুয়ে পল্লীগ্রামে যখন শোনা যায় ব্যাঙের ডাক—গ্যাঁঙোর গ্যাঁঙোর গোঁ গোঁ গঁড়র্ গঁড়র—আর তার সঙ্গে যখন মেশে ঝিঁ-ঝিঁ ঝিঁ-ঝিঁ রব, তখন বাঙালীর ছেলে বুড়ো খুসী হয় না এ কথা বলবার উপায় নাই। আর সেই কন্‌সার্টের তাল রাখে যদি ফোঁটা ফোঁটা পাতা-ঝরা জল আর সঙ্গীতে বাহবা দেয় যদি গ্রামের খেঁকী-কুকুর, তা হ'লে আমাদের দেশ পাড়াগাঁর নিশার অনৈক্যতান বাজনা পূর্ণতা লাভ করে।

ভেক যে কুৎসিৎ সে বিষয় মতদ্বৈত নাই। প্রায় সব জানোয়ারের একটা ঘাড় বা গর্দ্দানা আছে, ব্যাঙের নাই। একেতো বাইরে তার কান নাই, তার উপর গায়ে লোমও নাই, গা'টা চক্‌চকে তেলাও না, আবার কোমরটা ভাঙ্গা: শুধু কি তাই এইখানেই তার মন্দ চেহারা শেষ হয়নি। বিধি তাকে হাতী ঘোড়া বাঘ ভাল্লুকের মত চারটে পা দিয়েছেন বটে কিন্তু তার দেহের মলিনতার সঙ্গে খাপ্ খাওয়াবার জন্য সেই দুজোড়া শ্রীচরণও বেখাপ্পা সৃষ্টিছাড়া রকমের। তার সম্মুখের পদযুগল ছোট আর পিছনের পা বড়।

এর ফলে পথ চলবার সময় তাকে তুড়িলাফ দিতে হয়। তার সেই আকস্মিক তুড়ুক্ তুড়ুক্ তুড়িলাফের ভয়ে দুরন্ত ছেলে বা বন্য পশু তার উপর অত্যাচার করিতে সমর্থ হয় না। দুষ্ট ছেলেরা দূর হতে ভেককে খোঁচাখুঁচি করে বটে—তবু শিউরে ওঠে যখন সে থপাস্ করে লাফ্ মারে। তার পিছনের পায়ে আঙ্গুল বাহির হতে দেখা যায় চারটে, সেগুলো আবার হাঁসের আঙ্গুলের মত চামড়ার দস্তানা দিয়ে মোড়া। সামনের পায়ের আঙ্গুলগুলো পরস্পর বিভিন্ন।

ব্যাঙের চোখ কিন্তু খুব বড় বড়—ড্যাবডেবে। ঠিক চোখের নিচেই দুটো কালো দাগ আছে সেই দুটা ওদের কানের পটহ। আমাদের বাহিরের কান হাওয়ায় ঢেউ ধরে। সেই ঢেউয়ের সঙ্গে শব্দ আসে -ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ভিন্ন ভিন্ন হিল্লোল। সেই বায়ুর হিল্লোলগুলো আমাদের কানের খুব ভিতরে অবস্থিত পটহে গিয়ে ঘা দেয়। তারপর নানা রকম যন্ত্র নড়বড় হ'লে আমরা শুনতে পাই। ভেকের বাহিরের কাণ নাই একেবারেই পটহ। আবার অনেক পোকার মোটেই কান নাই, তারা চামড়ার পাতের ভিতর দিয়ে শব্দ শোনে। সে সব কথা আর এক দিন বলব।

ব্যাঙের আরও দুই একটা অসাধারণ অঙ্গের কথা বলি। আমাদের এবং সব বড় জন্তুর বুকের ভিতর যে সব যন্ত্র আছে সেগুলোকে ক্ষতি হ'তে রক্ষা করে আমাদের শিরদাঁড়া, বুকের হাড় এবং এই দুইটি উপর নীচ লম্বা হাড়কে যে সব এড়ো এড়ো হাড় যোগ করে—যাদের নাম পাঁজরা। ব্যাঙের এই পাঁজরার হাড় মোটে নাই—তাই ভেকের দেহটা তুলতুলে নরম।

আরও অসাধারণ ব্যাঙের জিব। আমাদের জিব গলার দিকে দেহের সঙ্গে আবদ্ধ, বাহিরের দিকটা অসংলগ্ন। তাই আমরা জিব বার করে ভেঙচি কাটতে পারি এবং মিষ্টি জিনিসও চাটতে পারি। কুকুর তো গরমের সময় জিবের অনেকটা বার করে হাঁপায় আর জিবের ডগা দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ে। টিয়া পাখীরও ঐ রকম জিহ্বা—সাপের জিহ্বা চেরা হলেও ভিতরের দিকটা আটকানো, বাহিরের দিকটা খোলা। ব্যাঙের কিন্তু জিব একেবারে উল্টো। শেষের দিকে অর্থাৎ ঠোঁটের ঠিক পিছনেই তার জিবটা আটকানো আর ভিতর দিকটা অর্থাৎ গলার দিকে সেটা খোলা। সে খায় পোকা মাকড়। একটা পোকাকে ড্যাবডেবে চোখ দিয়ে দেখে, টিপ্ করে জিবটা ধনুকের মত বার করে তার গায়ে লাগায়। ভেকের জিহ্বায় থাকে আটা। সেই আটা লাগলে আর পোকা বেচারা টু-শব্দ করতে পারে না। ব্যাঙ্ তখন জিবটিকে মুখের মধ্যে টেনে নেয়। তার ফলে খাদ্য একেবারে গলায় চলে যায়। ভেকের উপরের মাড়িতে কাঁটা কাঁটা দাঁত আছে। কিন্তু তার নীচের মাড়িতে দাঁত একেবারে নাই। তোমরা এই প্রবন্ধ পাঠ করে যখন পুকুর ধার থেকে একটা ব্যাঙ ধরে পরীক্ষা করবে তখন এই সব বিষয়গুলো দেখো আরও অন্যান্য বিষয় লক্ষ্য ক'র। তা হ'লে শিখবে বেশী।

আমি ভেকের এই যে বর্ণনা দিলাম—এ পূর্ণ বয়স্ক জন্তুর। ভেক জমিতেই বেশী থাকে তাড়া পেলে জলে পড়ে। তারা জোড়া পা দিয়ে জলে সাঁতার কাটতে পারে আবার ইচ্ছে করলে জলের ভিতর ডুবেও থাকতে পারে।

কিন্তু ব্যাঙ্ শৈশব ও বাল্য অবস্থায় এ রকম দেখতে নয়। সে প্রথমে যখন ডিম ফুটে বেরয় তখন জলের পোকার মত দেখতে হয়। তখন সে জলচর জীব—

কিল্‌বিল করে অল্প জলে সাঁতার কেটে বেড়ায়। তারপর সে মাছের মত দেখতে হয়। তোমরা অনেক সময় নালার জলে বা পুকুরের ঘাটের কাছে যাদের সাঁতার দিতে দেখে মাছ বলে ঠিক করেছ তারা হয় ত বেঙাচী বা ব্যাঙের শিশু। শিশু ভেক বা ব্যাঙাচী দেখতে মাছেরই মত। তারপর ব্যাঙাচীর পিছনের পা বের হয়। তখন তাদের দেখতে অপরূপ। তারপর তাদের সামনের পা দুটো বার হয়; তারা চার পায়ে সাঁতার কেটে বেড়ায় অথচ কুমীরের মত লেজ। এ অবস্থায় তাদের দেখতে বেশ। সে যখন আরও বড় হয় তখন তার চেহারা ঠিক ভেকেরই মত হয়

—কেবল একটা লেজ থাকে। কিছুদিন পরে তার লেজটা খসে পড়ে তখন সে ফিটু-ফাটু ব্যাঙবাবু—আর চেনবার যো নেই সে জলের পোকা ছিল বা লেজওয়ালা একটা জবরজঙ্গী জানোয়ার রূপে জলের ভিতর সাঁতার দিয়ে বেড়াত।

তোমরা যদি বর্ষাকালে কোনও জলের ধারে ঘাস, কলমী সাক, সালুক প্রভৃতি পরীক্ষা কর তো দেখবে যে এক এক স্থলে নাল হড়হড়ে ঘন সাগুর পায়েসের মত কতকটা জিনিস। সেই জিলেটিনের মত জিনিসের ভিতর যে ছোট ছোট দানা থাকে সেই গুলা ব্যাঙের ডিম। সেই ডিম যদি নাল শুদ্ধ এনে এক গামলা জলের মধ্যে ফেল তো দেখবে জল লেগে সে গুলো ফেঁপে উঠবে। সেই ফাঁপা ডিমের ভিতর নানা রকম ফাটা ফাটি হয়ে শেষে পোকার আকারের ব্যাঙাচী বার হয়। তখন তাকে মাছ বলে ভ্রম হয় কিন্তু একটু যদি ভেবে দেখ তো দেখবে যে মাছের সঙ্গে এর অনেক প্রভেদ। অনেক মাছের গায়ে আঁস থাকে এদের গা তেলা। মাছের মুখের গালে একটা কান্‌কো থাকে। তার ভিতরে ছোট ছোট কাঁটা কাঁটা থাকে—মাছ সেইগুলার সাহায্যে শ্বাস নেয়। ব্যাঙাচীদের সরু সূতোর মত দুদিকে আঘা থাক। এরা এর সাহায্যে শ্বাস নেয়। এই যন্ত্রকে ইংরাজীতে

বলে gill ব্যাঙাচীর মুখের নীচে থুবনী থাকে। সেই থুবনী ঠোঁটের কৃপায় বেচারা জলের ভিতরের গাছ পালা সিঁড়ি প্রভৃতি শক্ত পদার্থ ধরে থাকে।

ব্যাঙাচীর ক্ষুধা খুব প্রবল। যদি ব্যাঙাচীকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও তো সর্ব্বদা গামলার ভিতর জলের গাছ—যেমন ঝাঁঝি পাটা এবং শৈবাল দিয়ে রাখিবে। সেগুলো সে কেবল রাক্ষসের মত খায়। ব্যাঙাচীর বাহিরের এই কান্‌কো বেশী দিন থাকে না। সে যেমন বাড়ে তার সঙ্গে সঙ্গে মাছের কান্‌কোর মত ঢাকা কানকো তার ভিতর গজায়। তখন বাহিরের সূতার মত কানকো ফুলটা শুকিয়ে যায়। এই কান্‌কোর কথাটা শেষ করি। আমরা স্থলের জীব, বুকের ভিতর একটা যন্ত্র আছে—তার সাহায্যে শ্বাস নেই, এর নাম ফুস্‌ফুস্‌। নাকের ভিতর দিয়ে হাওয়া যায় সেই ফুসফুস অবধি—সেখানে ফুসফুস হাওয়ার ভিতর থেকে অম্লজান হাওয়া টেনে নেয় বাকীটা আবার ছেড়ে দেয়। আমাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে সেই অনাবশ্যক হাওয়াটা বেরিয়ে যায। ভেক শেষে স্থলচর হয়। তাই ধীরে ধীরে তার বুকের ভিতর ফুসফুস তৈয়ারী হয়।

শিশু ব্যাঙের দুটো পা বেরোয়। এ পা দুটা পিছনের পা। তার দেহ আরও লম্বা হয় আর সামনের পা গজায়। এ সময় ব্যাঙাচীর দেহ খুব স্বচ্ছ। পেটের ভিতরের পাকোনো নাড়ি দেখা যায়। এ অবস্থায় তার প্রায় লাগে এক মাস। তার দেহ যেমন বাড়ে মুখটিও ধীরে ধীরে বাড়ে এবং চপে আসে—শেষে সে ব্যাঙ্‌ মুখো হয়।

ব্যাঙাচার জীবনীশক্তি খুব বেশী। আমি তাকে স্বচ্ছ জলে রেখে দেখেছি, সাদা ঘোলা জলে রেখেছি, কম জলে রেখে দেখেছি, বেশী জলে রেখে দেখেছি, তার বাড় বাড়ন্ত হয় সমান। কেবল খেতে পেলেই হল। ব্যাঙাচী অবস্থায় সে পাকা হিন্দু—নিরামিষ ভোজী। বড় হ'লে আর তার নিরামিষে তার মন মজে না সে চায় পোকা মাকড়।

একটা বিষয় তোমাদের সতর্ক করে দিই। যে গামলায় ব্যাঙাচী রেখে তোমরা

পরীক্ষা করবে, সে গামলায় কৈ, মাগুর বা সিঙ্গি মাছ রেখো না। এরা তা হ'লে টপ্ টপ্ ব্যাঙাচিদের ধরে খাবে।

ব্যাঙ অনেক রকমের আছে। আমাদের দেশের কোলা ব্যাঙ্গুলো কালো আর সোনা ব্যাঙের রঙ্ বেশ। গেছো ব্যাঙ্ গাছে ওঠে।

এদের প্রধান শত্রু সাপ্। যখন সাপে ব্যাঙ্ ধরে তখন এরা এমন কাতর চিৎকার করে যে শুনলে কষ্ট হয়। বনে গোখরো সাপের মুখ থেকে যে ব্যাঙ পালাতে পারে সে কামড়ালে মানুষ মরে যায়। আমি এমন ব্যাঙ্ দেখিনি।

লোক পাগল হ'লে কবিরাজ মশায় সোনা ব্যাঙের ঝোল খেতে ব্যবস্থা দেন। আর ফরাসী দেশে সাহেবমেমরা এক রকম ভেক আহার করেন্। বাবা! শুনে আমাদের গা সিউরে উঠে।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

বোটানিক্যাল গার্ডেন ভ্রমণ

অনেক আগে থেকেই আমার ও আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল "বোটানিক্যাল গার্ডেনটা" 'একবার দেখে আসা যাক্ চলুন'। শনিবারটা ছাড়া আমাদের আর সময় হবে না। অন্য দিন সব ক্লাস আছে। তাই ঠিক করলাম আসছে শনিবারেই যাওয়া যাবে।

আমরা এক সঙ্গে চার জন থাকি, প্রথমে ভেবেছিলাম দুই জনেই যাব, কিন্তু শেষে ঠিক করলাম চার জনেই এক সঙ্গে যাব। সবাই প্রায় সমবয়সী, বেশ ফুর্ত্তিতেই যাওয়া যাবে।

শনিবার আসল। এগারটায় খাওয়া দাওয়া শেষ কোরে গোটা দেড়েকের পর রওনা হব ঠিক করলাম। খাওয়া দাওয়া সব সেরে যার যার জামা কাপড় পরে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। সঙ্গে ক্যামরা নিলাম। আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম বোটানিক্যাল

গার্ডেনএর বেশ ভাল দেখে কয়টা জায়গার ফটো তুলে নিয়ে আসব। অনেকখানি যায়গা নিয়ে নাকি এক বট গাছ আছে, তারও একটা ফটো তুলে নিয়ে আসব ঠিক করলাম। ক্যামেরা আমাদের তিন জনেরই ছিল।

জানিনা কোন ঘাট থেকে উঠ্‌তে হয় -তাই জেনে নিলাম চাঁদপাল ঘাট থেকে উঠ্‌তে হবে—হাইকোর্টের কাছেই। চিনি না চাঁদপাল ঘাটটা কোন খানে—বেরিয়েই সোজা হাইকোর্টের দিকে হাঁটতে লাগলাম। হাইকোর্টের কাছে গিয়ে দেখলাম, অনেক ভদ্র লোক, সুটকেশ, ব্যাগ ইত্যাদি সব হাতে করে গঙ্গার ঘাটের দিক যাচ্ছে, ভাবলাম কাছে হয়ত কোথাও হবে চাঁদপাল ঘাট; একটু এগিয়েই দেখলাম মস্ত সাইন বোর্ডে লেখা রয়েছে Chandpal Ghat গেট দিয়ে সোজা ঢুকে পড়লাম, বাঁ দিকেই টিকিটের ঘর Ticket Masterকে জিজ্ঞেস্ করলাম—বোটানিক্যাল গার্ডেনের return ticket কত হবে মশায়—তিনি বল্‌লেন চার আনা। আমাদেরই মত এক ভদ্দর লোক এসে জিজ্ঞেস্ করলেন, কোথায় যাবেন মশায় আপনারা—বোটানিক্যাল গার্ডেনে—আমার একটা টিকিট করা আছে kindly যদি নেন; দুটো পয়সা লাভ হবে ভেবে ছ'পয়সা দিয়ে টিকিট খানা কিনে নিলাম। Return Ticket তিন খানাই করতে হ'ল আমাদের।

প্লাটফরমে গিয়ে শুনলাম ষ্টীমার আসার এখনও মিনিট পনেরো বাকী আছে। বেঞ্চে যায়গা ছিল না বসার ; তাই একপাশে গিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হ'ল। দেখতে লাগলাম গঙ্গার সেই জোরে বয়ে যাওয়া জল--ওপারের দালান গুলো, কলকারখানা গুলো যার চিম্‌নি দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে—আরও দেখ্‌তে লাগলাম গঙ্গার বুকের উপর দিয়ে ফেরি ষ্টীমার গুলোর জল চিরে ওপার যাওয়া এবং আসা। খানিক বাদে একটা ষ্টীমার এল; শুনলাম এটা যাবেন বোটানিক্যাল গার্ডেনে। আরও খানিকক্ষণ বসে থাক্‌তে হ'ল। খানিক বাদে আর একটা ষ্টীমার এল। এবারও জিজ্ঞেস্ করলাম। কয়েকজন ভদ্দর লোক বল্‌লেন -বোটানিক্যাল গার্ডেন হ'য়ে রাজগঞ্জ যাবে এটা।

উঠে পড়লাম। আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ছিল। ভিড় হয়েছিল বেশ—

বসার যায়গা ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে একধার ঘেসে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল। প্রথম শ্রেণীতে কিন্তু অনেক বেঞ্চি খালি পড়েছিল। যাত্রীদের সংখ্যা কম ছিল। ষ্টীমার প্লাটফরমটী ছেড়ে দিল। চলতে আরম্ভ ক'রল। দেখতে লাগলাম মস্ত মস্ত অনেক জাহাজ পড়ে রয়েছে গঙ্গার ভিতর নঙ্গর ক'রে। দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল। জাহাজ গুলি দেখে মনে পড়ে গেল আমাদের সেই ইংলণ্ড, ইতালি, আমেরিকা বর্ম্মা—যত সব বিদেশের কথা। খানিকক্ষণ তাই নিয়ে কথাবার্ত্তা চলতে লাগল আমাদের ভিতর।

আস্তে আস্তে ষ্টীমারটী শিবপুর ষ্টেসনে এসে পৌছল। অনেক যাত্রী নামল অনেক যাত্রী উঠল। মিনিট দুই পরে ষ্টীমারটী শিবপুর ষ্টেসন ছেড়ে আবার চলতে আরম্ভ করল আমাদের গন্তব্য স্থানের দিক। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তক্তাঘাট ষ্টেসন পর্য্যন্ত এলাম—বসতে ইচ্ছা হ'ল, তাই ভাবলাম—প্রথম শ্রেণীতে অনেক জায়গা খালি রয়েছে, একটায় গিয়ে বসা যাক্। এক ভদ্র লোকের পাশে গিয়ে বসে পড়লাম আমরা চার জনে।

তক্তাঘাট ষ্টেসন ছাড়িয়ে শালিমার ষ্টেসনে পৌছবার পাঁচ ছয় মিনিট আগে পাশের ভদ্রলোকটী জিজ্ঞেস্ করলেন—আপনারা কি প্রথম শ্রেণীর টিকিট করে এসেছেন। বললাম না। ভদ্রলোকটী বল্লেন, আপনাদের যখন প্রথম শ্রেণীর টিকিট নেই, হয়ত, আবার চেক করবে—একটা লজ্জার কথা—দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়ে আপনাদের বসাই ভালো—কথাটা নেহাৎ মন্দ বল্লেন না। বললাম সে ত ঠিকই -তবে, এই ত সামনের ষ্টেসনেই নেমে যাব, সামান্য কয়েক মিনিটের জন্য আর—

ভদ্রলোকটি বাঙ্গালাই ছিলেন, বয়েস এই বছর চল্লিশের কিছু উপর হবে হয়ত, কি জানি তিনি তার বাঙ্গালা নামের স্বার্থকতা অথবা নিজের মহত্ব প্রকাশ করবার জন্যই হ'ক কি অন্য কোন কারণেই হ'ক বললেন—ইচ্ছা করলে আমি আপনাদের কাছ থেকে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া আদায় করিয়ে দিতে পারি—তবে সেটা আমি ক'রব না। বললাম—নাই'ক আমাদের উপর অতটা দয়া প্রকাশ আর নাই করলেন—বিশেষ বাধিত আপনার কাছে আমরা। আর বেশী বাজে কথা না

বলে উঠে গিয়ে আবার দ্বিতীয় শ্রেণীতে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল। ভদ্রলোকটি শালিমার ষ্টেসনেই নেমে গেল।

শালিমার এর পরের ষ্টেসনই বোটানিক্যাল গার্ডেন। শালিমার ষ্টেসন ছাড়িয়ে গঙ্গা খানিক বেঁকে গিয়েছে পশ্চিম দিকে। ষ্টীমারটী সোজা পশ্চিম দিক যেতে লাগল। সামনে গঙ্গা সোজা অনেক দূর গিয়েছে কেবল সাদা জল দেখাচ্ছিল। মেঘে অর্দ্ধেক ঢাকা সূর্য্যের রোদ পড়ে জল রুপালি কাগজের মত চক্‌চক্‌ করছিল— তার ভিতর দিয়ে আস্‌ছিল মস্ত বড় একখানা জাহাজ তার পতাকা উড়িয়ে—ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল জাহাজখানি। জাহাজ খানি দেখতে দেখতে বোটানিক্যাল গার্ডেন এসে পৌছলাম। সেখানে কেবল আমরাই নাম্‌লাম। আর কোন যাত্রী ছিল না নামার।

প্লাটফরম্‌ গেট ছাড়িয়েই বাগানে পড়তে হয়; দুই ধার দিয়ে সারি সারি তাল গাছ অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়েছে। মনে হচ্ছে যারা ঢুক্‌ছে তাদেরই যেন আহ্বান করে নেবার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা তাদের উঁচু মাথা উঁচু করে। ঢুকেই বেশ স্ফুর্ত্তি লাগতে লাগল। চারিদিক আরও নানান রকমের গাছ রয়েছে দেখলাম যাদের হয়ত সবগুলোর নাম জানি না। তার ভিতর দিয়ে সমান ভাবে কচি কচি ঘাস রয়েছে—মনে হচ্ছে ঘাসগুলি যেন তাদের কচি সবুজ রংএর কাপড়গুলি মেলে রেখে দিয়েছে গাছের নীচ দিয়ে। আবার মেঘের ফাঁক দিয়ে রোদ পড়ে তাদের কচি রংটাকে যেন আরও কচি করে দিচ্ছে। সেখান থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে বেশ একটু পাড়াগেঁয়ে গন্ধ আসছিল।

খানিক দূর এগিয়েই একটা Statueর মত দেখতে পেলাম। কাছে গিয়ে পড়ে দেখ্‌লাম লেখা রয়েছে Kid monument! ইচ্ছা ছিল এই মনুমেণ্টটী নিয়ে Palm tree গুলির একটা ছবি তুল্‌ব, সামনেই গঙ্গা নদী থাক্‌বে, তার জল বুকে করে বেশ সুন্দর হবে। কিন্তু আমাদের তা হয়ে উঠল্‌না। বড় মেঘলা দিন ছিল—যদিও অল্প সময়ের জন্য মাঝে মাঝে রোদ দেখা দিচ্ছিল।

Monument এর পাশ দিয়ে বাঁ দিক একটা রাস্তা চলে গিয়েছে সোজা অনেক

দূর। দুই ধার দিয়ে নানান রকমের গাছ। সোজা হাঁটতে লাগলাম সেই রাস্তা দিয়ে। লোক জন সে দিন খুব কমই ছিল। প্রথমেই সেই বটগাছটী দেখতে হবে ঠিক্ করলাম। কোথায় জানি না, জিজ্ঞেস্ করার লোকও পেলাম না। সোজা পথ দিয়ে হাটতে লাগলাম, বিদেশে পথ-ঘাট-না-চেনা-পথিকের মত। কিছুদূর এগিয়েই দূর থেকে দেখতে গেলাম এক রকম পাতাওয়ালা অনেক-খানি যায়গা নিয়ে কতকগুলি গাছ! মনে করলাম ঐটাই হবে হয়ত সেই বটগাছটী। কাছে গিয়ে দেখলাম সত্যিই সেই বটগাছটী। প্রথমে দূর থেকে তার একটা ছবি নিলাম। আমাদের Vest Pocket Cameraওয়ালা সাথীটী—যে রাস্তা দিয়ে এলাম—এই রাস্তার একটা ছবি নিলেন। বট গাছটীর তলায় এসে সব দেখতে লাগলাম্। তার শেকড়গুলি নিচে নেমে এসেছে। বটগাছটীর নিচে একটা নিস্তব্ধতা পড়ে রয়েছে। কোনখানে তার গোড়াটা ঠিক করা যাচ্ছিল না। ঘুরে ফিরে দেখ্তে লাগলাম। দেখলাম কালো রংএর একখানা সাইনবোর্ডে সাদা রংএর অক্ষরে লেখা রয়েছে। লেখাগুলি ইংরেজীতেই—প্রায় ১৫৭ বছর হয়েছে এই গাছটীর বয়স—একহাজার ফিট্ উঁচু হবে গাছটী—কাণ্ডটীর বেড় সাড়ে পাঁচ ফুট্—ছয়শ একটা শেকড় আছে এর—মাটীতে নেমে এসেছে।

সাইনবোর্ডটী লাগান ছিল অশ্বত্থগাছটীর একটা মোটা রকমের শেকড়ে। শেকড়টী দেখ্লে মনে হয়, অনেক তার বয়স হয়েছে। শেকড়টীর মাথার দিকটা পচে গিয়েছে! তলার দিকটা আস্তে আস্তে যেন মাটী থেকে পৃথক হয়ে আস্ছে, শেকড়টীকে একটী কাণ্ড বল্‌লেও দোষ হয় না। সাইনবোডটী সমেত একটা ফটো তুলে নিলাম। আকাশ তখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, ফটো বিশেষ খারাপ হয় নাই। দুঃখের বিষয় আমার তোলা ফটোটি বিশেষ ভাল হয় নাই। সমস্ত গার্ডেনটা একবার ঘুরে দেখতে হবে তাই বেশীক্ষণ আর দেরী না করে অন্য রাস্তা দিয়ে আবার চল্‌তে লাগলাম। কত রং বেরং এর গাছ, লতাপাতা দেখ্তে পেলাম। সামনেই Plant house একটা রয়েছে দেখ্‌লাম। Plant houseটী গোল করে লোহার ফ্রেমে করা -বেশ শক্ত রকমের—মাঝখানটা উঁচু করা একটা চূড়ার মত। ভিতরে

গিয়ে দেখলাম—উপরে জালের মত করে তার দেওয়া হয়েছে। তার উপর লতাপাতা গিয়ে খড়ের ছাওয়া ঘরের মত হয়ে গেছে। দেখলাম নানা রকমের গাছ গাছড়া রয়েছে। বেঞ্চ পাতা ছিল মাঝে মাঝে। একটায় বসে খানিক্ষণ বিশ্রাম করে নিলাম। ভিতরে বসে একটা ফটো তুললাম আমাদের দলের। খানিক বাদেই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। হাটতে হাট্‌তে আবার সেই Kid monument এর কাছে এসে পড়লাম।

চারটে বেজে গিয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব -খাবার আনিনি সঙ্গে—ভাবলাম এইবার ফেরা যাক্। কিন্তু পূব ধারটা মোটেই দেখা হ'ল না। সবাই ঠিক করলাম এসেছি যখন দেখে যেতে হবে—তাই সোজা একটা রাস্তা ধরে পূব দিক হাঁটতে লাগলাম্—পা আর চল্‌ছিল না চল্‌তে চল্‌তে সামনেই আর একটা Plant house এর ঘরের মত একটা ঘর দেখ্‌তে পেলাম। ঢুকে পড়লাম্— দেখ্‌লাম একটা লোক খড়ম্ পায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—বাগানেরই কোন মাইনা করা লোক হবে সে—বোধ হ'ল—দেখে বেড়াচ্ছে যে বাগানের কোন গাছ দর্শকরা নষ্ট না করে, এখানেও অনেক রকমের গাছ দেখলাম, খানিক বাদে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম্, একটু হেঁটে সামনেই দেখ্‌তে পেলাম Resting Room বলে একটা ঘর রয়েছে। ভিতরে গেলাম। বেঞ্চ রয়েছে, লম্বা লম্বা টেবিল রয়েছে—আরও দেখ্‌লাম্ দেয়ালে টাঙ্গান রয়েছে গার্ডেনএর একটা ম্যাপ। খানিকক্ষণ দেখে নিলাম কোন কোন যায়গায় ঘুরলাম। দেখবার এখনও ঢের বাকী রয়েছে দেখলাম। আর ভাল লাগ্‌ছিল না। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কেউ বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়লাম, কেউ টেবিলের উপর পা তুলে বসে পড়লাম, খানিক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর—বেরিয়েই এবার ষ্টীমার ঘাটের দিক যেতে লাগলাম। দূর থেকে দেখ্‌তে পেলাম একটা ষ্টীমার ঘাটে এসে পৌঁছেছে; তাই একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে সবাই উঠে পড়ল্। আমি ও টিকিট্ করে উঠে পড়লাম্।

ষ্টীমারটী আস্তে আস্তে চাঁদপাল ঘাটে এসে পৌঁছুল্। নেমে পড়লাম্। নেমেই খেলার মাঠের দিক্ হাট্‌তে লাগলাম ইডেন গার্ডেনের ভিতর দিয়ে।

ব্রহ্মা বাড়ীতে চিঠি লিখে লোক পাঠিয়ে তখনি অস্ত্র আনিয়ে মানুষকে দিলেন। দিয়ে বললেন,—এর সঙ্গে কেউ পারবে না। বুদ্ধি খাটিয়ে এই অস্ত্র প্রয়োগ করতে পার্‌লে সারা পৃথিবী তোমার হবে। তবে সাবধান বাপু, নিজেদের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি করে মরো না।

মানুষ দেবতাদের প্রণাম করে মর্ত্ত্যে চললো। যাবার পথে সেই বন। বনে বাঘ মহা আস্ফালন করছে। মানুষকে দেখে হালুম করে তেড়ে এলো। মানুষ তখনি অস্ত্র বাগিয়ে দাঁড়ালো। অস্ত্র দেখে বাঘ হতভম্ব। বললে,—কি ওটা ?

মানুষ বললে,—অস্ত্র! এসো, কত বল পেয়েছি ফন্দী খাটিয়ে, দেখে নি একবার।

অস্ত্রের মূর্ত্তি দেখে বাঘ ল্যাজ গুটিয়ে সরে পড়লো।

মানুষ বাড়ী ফিরে এলো। তার মা বললেন—কিরে, বল পেলি ?

মানুষ বললে—না মা, বল ব্রহ্মার কাছে আর নেই মোটে।

মা বললেন,—তাহলে উপায় ?

মানুষ বললে,—অস্ত্র পেয়েছি মা। তখন সব কথা মানুষ খুলে বললে।

শুনে মা বললেন—দেবতার কথা মেনে চলিস্ বাবা। নিজেদের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি করিস্‌নে—মহা-অনর্থ ঘটবে, অশান্তির সৃষ্টি হবে।

শ্রীসুধীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

গর্ত্তর ব্যাঙ্

(গল্প)

এক ছিল ব্যাঙ্। সে এক নদীর ধারে গর্ত্তর মধ্যে থাকতো। একদিন তার বাড়ী থেকে একটু দূরে সে বেড়াতে গেছে, এমন সময় খুব ঝড় এল। ঝড়ের ঝাপ্‌টায় ব্যাঙ্ এক অজানা জায়গায় ঠিকরে পড়লো! সেখানে ছিল গরু বাঁধবার একটা

খুঁটী ; তাতে যে গরুটা বাঁধা ছিল, সে তো এই ঝড় দেখে দড়ি-টড়ি ছিঁড়ে কোথায় পালিয়েছে। ব্যাঙ্ অনেক কষ্টে সেই খুঁটী আঁকড়ে পড়ে রইল। কিছুক্ষণ বাদে ভাবলে, ঐ তো ঝড় —কি তার শক্তি! এই খুঁটী ধরে বসে আছি - খুঁটী-শুদ্ধ আমায় ওপড়াতে পারলে না। এই ভেবে খুঁটী ছেড়ে এক পা নড়ে বসলো। যেমন নড়া, অমনি সে ঝড়ের ঘুর্ণীতে উড়ে একেবারে এক গর্ত্তর মধ্যে পড়লো। সে গর্ত্তটা হচ্ছে এক সাপের। সাপেরা তখন সপরিবারে বাইরে খাবারের খোঁজে বেরিয়েছে। গর্ত্তয় ছিল কটা ডিম। ব্যাঙ গিয়ে ডিমের উপর লাফিয়ে পড়তেই ডিমগুলি ভেঙ্গে গেল। ব্যাঙ্ দেখে, সর্ব্বনাশ, এ যে সাপের ডিম। সাপেরা যদি এসে পড়ে, তাহলেই গেছি। ব্যাঙের ভাবা ভয় হলো। কিন্তু করে কি? বাইরে ঐ ঝড় — সে ঝড়ে বেরুনো দায়। উপায়?

যাই হোক, কিছুক্ষণ পরে ঝড় থামলো। তখন ব্যাঙ্ গর্ত্ত ছেড়ে বেরিয়ে আস্তে আস্তে নিজের বাড়ীর দিকে চল্‌লো। কিন্তু বাইরে তখন ঝড়ে সব তছ্‌নছ্ করে দেছে—গাছের ভাঙ্গা ডাল-পালা, কাঠি কুটো, ঝরা পাতা—তার মধ্যে থেকে নিজের বাসা খুঁজে বার করা শক্ত। বহু কষ্টে বাসা মিললো। ব্যাঙ্ নিজের গর্ত্তয় ঢুকে চুপ করে বসে ভগবানকে ডাকতে লাগলো,— সাপের হাত থেকে বাঁচাও, ঠাকুর! আমি ইচ্ছে করে তাদের ডিম ভাঙ্গিনি। ভয়ে গা তার থেকে থেকে শিউরে উঠছিল।

ওদিকে সাপের বাসায় সাপ আর সাপিনী এসে দেখে, তাদের ডিমগুলি কে ভেঙ্গে চুরমার করে দেছে। ঝড়ে ভেঙ্গেছে? না! কে তবে এ কাজ করলে? সাপিনী তো কেঁদে আকুল! সাপ হতভম্ব, সাপিনীকে কি বলে প্রবোধ দেবে? পাসের গর্ত্তে থাকতো এক বুড়ো সাপ পক্ষাঘাতে আর বাতে পঙ্গু! তার নড়ার শক্তি নেই। অন্য সাপেরা চাঁদা তুলে তার খোরাক জোগায়! সাপিনীর কান্না শুনে পাশের গর্ত্তর সেই বুড়ো সাপ ফণা বার করে বললে,—ও পাড়ার কোলা ব্যাঙ এসে তোমাদের ডিম ভেঙ্গে দিয়ে গেছে।

শুনে সাপ ফোঁশ করে উঠলো! হুঁ, ব্যাঙ! তার এত বড় স্পর্দ্ধা! এমন

সাহস! সাপিনী চোখের জল মুছে বললে,—চল, ব্যাঙ্‌কে সাজা দিতে হবে। দুজনে বেরুলো তখন ব্যাঙের খোঁজে।

ব্যাঙের বাসার সাম্‌নে তখন ভিড় জমেছে। ঝড় থামতে দেশের যত ব্যাঙ গ্যাঙর-গ্যাঙ্, গ্যাঙোর-গ্যাঙ্ করে বেরিয়ে পড়েছে—ভিজে মাটী পেয়ে সব মহা-আনন্দে দল বেঁধে।

সবাই এলো, গর্ত্তর ব্যাঙ এলো না যে! তাইতো,—ঝড়ে বেচারী মারা গেল নাকি! ব্যাঙের দল এসে ব্যাঙের বাসায় হাজির। তাদের সে-আওয়াজে গর্ত্তর ব্যাঙ্ কেঁপে লেপ মুড়ি দিলে। ব্যাঙের দল তাকে ডেকে বললে,—বলি, ও গর্ত্তর ব্যাঙ্, ঝড় থেমে গেছে। এখনো বাসার কোণে বসে আছ কেন?

দলের সাড়া পেয়ে গর্ত্তর ব্যাঙ্ আরাম পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো; এসে তার বিপদের কথা খুলে বললে। শুনে দল-শুদ্ধ ব্যাঙ শিউরে উঠলো, বটে! তা হলে এখন উপায়?

কাছেই মস্ত একটা গাছের ডাল ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে ছিল। সেই ডালে ছিল এক চিলের বাসা। চিল বেচারা ঝড়ের পর ফিরে দেখে, বাসা নেই। নীচের সেই ভাঙ্গা ডালটিতে বসে সে চেয়ে দেখে, ব্যাঙের দলে ভয়ের সাড়া পড়ে গেছে! চিলের তখন ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব। তার ওপর বাসা নেই! বাসা তৈরী করতে হলেও গায়ে বল চাই! বল পেতে হলে এখন খোরাকের দরকার! সে ডালের উপর থেকে তাগ্ করে একটা মোটা খোঁড়া ব্যাঙের উপর ঝপ্ করে মারলে ছোঁ! ব্যাঙের দল ভয় পেয়ে ভাবলে, বুঝি সাপ এলো! তারা গ্যাঙর-গ্যাঙ শব্দে খোঁড়া ব্যাঙকে ঘিরে লাফিয়ে উঠলো। উঠবি তো ওঠ্ একবারে চিলের ঘাড়ে! সারাদিন না খেয়ে ঝড়ের দাপটে ঘুরে চিল ছিল কাবু। ব্যাঙেরা ঘাড়ে উঠতেই সে গড়িয়ে পড়লো। পড়েই বললে,—মাপ কর, মাপ—সন্ধি।

ব্যাঙেদের সর্দ্দার বললে, সন্ধিতে রাজী—কিন্তু এক সর্ত্ত আছে।

চিল বললে,—কি সর্ত্ত? সর্দ্দার তখন গর্ত্তর ব্যাঙের বিপদের কথা খুলে বল্‌লে। শুনে চিল বললে,—বেশ, তা আমায় কি করতে হবে?

সর্দ্দার বললে,—এখনি সেই সাপ হয়ত আসবে, তুমি আমাদের সহায় হও।

চিল বললে,—আচ্ছা, কিন্তু তার আগে আমায় কিছু খেতে দাও।

চিল ও ব্যাঙ

কোলা ব্যাঙ ছিল সঙ্গী। সে বললে,—কোথায় কি বা পাব! কিছু পোকা-মাকড় আছে, তাতে হবে?

চিল বললে,—যে খিদে পেয়েছে, আর একটু বাদে হয়তো কাদা-মাটীই খেয়ে ফেলবো! পোকা মাকড় তো আমার কাছে এখন কালিয়া-পোলাও!

কোলা ব্যাঙ পোকা-মাকড় এনে দিলে, চিল বসে খেতে লাগলো। অন্য ব্যাঙেরা 'এটা খাও', 'ওটা খাও' বলে খাতির করছে, এমন সময় আওয়াজ শোনা গেল, ফোঁশ্!

ওরে বাস্‌রে! ব্যাঙের দল লাফিয়ে চিলের ডানা ঘেঁসে বসলো।

চিল চমকে উঠে বললে,—হলো কি?

ব্যাঙেরা বললে—ঐ!

চিল বললে—ঐ মানে?

ব্যাঙেরা বললে,—সাপ!

বটে! বলে চিল মাটীতে ঠোঁট মুছে ওৎ পেতে বসলো। সাপ আর সাপিনী দূর থেকে ব্যাঙের সভা দেখে ছুটে আসছে! চিল সোঁ করে আকাশে উড়ে একবার তাদের পানে চেয়ে দেখলে,—তারপর তীরের মতই সোঁ করে নেমে সাপিনীকে থাবায় তুলে নিয়ে উড়ে গেল। সাপ তা দেখে প্রথমটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো

তারপর ভোঁ দৌড়! ভাবলে, আগে তো নিজে বাঁচি, তারপর আর সব। ব্যাঙের ওপর রাগের কথা ভয়েই সে ভুলে গেল।

সাপ গিয়ে নিজের দলে খপর দিলে। সাপের দল জড় হয়ে তখন সেখানে এসে দেখে, মাটীতে ব্যাঙের দলই শুধু তৈরী নয়—চিলের দলও সেই ডাল-ভাঙ্গা গাছের মাথায় উড়ে বেড়াচ্ছে! সাপেরা তখন চুপি-চুপি বলাবলি করলে, তোমরা কত বড় ব্যাঙ্ দেখে নেবো! আজ না হয় চিলকে পেয়েছ! এই চিল যখন কাছে থাকবে না, তখন ..

সে-দিনের মত সাপেরা সুড়-সুড় করে বাড়ী ফিরলো। কিন্তু সেই অবধি ব্যাঙের উপর ভারী সাপের রাগ।

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

জলার পেত্নী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিবনারায়ণের মৃত্যুর পরে জয়নারায়ণ একা তাঁর বাপের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হলেন। জমিদারী পেয়ে প্রথমেই তিনি তাঁর দাদার খোঁজ করতে আরম্ভ করলেন। তিনি দেশে দেশে হরিনারায়ণ ও তাঁর পরিবারের খোঁজে লোক পাঠালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। প্রায় দশ বছর খোঁজাখুঁজি করার পর যখন দাদার কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না তখন তিনি নিরাশ হোয়ে জমিদারীর কাজে মন দিলেন।

জয়নারায়ণ তাঁর দাদাকে চিনতেন এবং তিনি যে কি রকম দয়ালু ছিলেন আর

প্রজাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতেন তা জানতেন। সেই জন্য কাজে মন দিয়ে তিনি দাদার আদর্শে জমিদারী চালাতে লাগলেন।

জয়নারায়ণ বিয়ে করেন-নি। সংসারে তাঁর আপনার বল্‌তে কেউ ছিল না বটে, কিন্তু আপনার বলতে কেউ না থাকলেও বিশ্বশুদ্ধ লোকই তাঁর আপনার হোয়ে উঠেছিল। কোথায় কার অসুখ করেছে তার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা, কে খেতে পাচ্ছে না তাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা, কোন্ গ্রামে জলের কষ্ট সেখানে বড় বড় পুকুর খুঁড়িয়ে দেওয়া, এমনি সব ভাল ভাল কাজ কোরে তিনি তাঁর টাকা ও সময়ের সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন।

কালীগ্রামের জমিদারদের অত্যাচারের অখ্যাতি দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হোয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জয়নারায়ন এমনভাবে জমিদারী চালাতে আরম্ভ করলেন যে কয়েক বছরের মধ্যে দেশবিদেশে তাঁর সুখ্যাতি রটে গেল। নিজের প্রজারা তো দূরের কথা, অন্য দেশের লোকেরা পর্য্যন্ত তাঁর নাম শুনলে ভক্তিতে মাথা নত করত। তাঁর সুবিচার আর দয়ার কথা শুনে চারিদিক থেকে লোক এসে তার জমিদারীতে বাস করতে আরম্ভ করলে। তার ফলে জমিদারীর আয়ও বেড়ে গেল।

এমনি কোরে পূর্ব্বপুরুষের দুর্ণাম ঘুচিয়ে জয়নারায়ণ যখন ভালো জমিদার বলে নিজের নামে সুপ্রতিষ্ঠ করেছেন এমন সময় একদিন কে তাঁকে হত্যা করলে।

জয়নারায়ণের হত্যার সংবাদ দেখতে দেখতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল। প্রজারা হায় হায় করতে লাগ্‌ল, কিন্তু কে যে তাঁকে খুন করলে, কি উদ্দেশে তাঁকে খুন করা হোলো এ কথা পুলিশ কিংবা কেউ কিছুতেই ধরতে পারলে না।

এদিকে জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর আর এক গোল উঠ্‌ল। তাঁর তো সংসারে কেউ ছিল না, তবে অত বড় বিষয় পাবে কে? খোঁজ কোরে জানতে পারা গেল যে, জয়নারায়ণের বড় ভাই হরিনারায়ণ অনেক দিন আগে বাপের সঙ্গে ঝগড়া কোরে বাড়ী থেকে চলে গিয়েছিলেন। তিনি কিংবা তাঁর ছেলে হোলো বিষয়ের প্রকৃত মালিক। শেষকালে সরকার থেকে তাদের খোঁজ আরম্ভ হোলো। এমনিতে যখন কোনো সংবাদই পাওয়া গেল না তখন সরকারী এটর্নী কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে লাগ্‌ল।

বিজ্ঞাপন

প্রায় ত্রিশ বছর আগে কালীগ্রামের স্বনামধন্য জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ চৌধুরীর (মুখোপাধ্যায়) বড় ছেলে শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ চৌধুরী (মুখোপাধ্যায়) বাপের সঙ্গে ঝগড়া কোরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে কোথায় চলে গিয়েছিলেন। জমিদার শিবনারায়ণ চৌধুরী যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি ছেলের খোঁজ কোরে কোনো সন্ধানই পান-নি। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ছোট ছেলে জয়নারায়ণ চৌধুরী কালীগ্রামে জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন এবং তিনিও তাঁর বড় ভাইয়ের অনেক খোঁজ কোরেও কোনো সন্ধান পান-নি। সম্প্রতি জয়নারায়ণ চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে। হরিনারায়ণ চৌধুরী অথবা তাঁর বংশের কোনো লোক এই বিজ্ঞাপন দেখে আমাদের চিঠি লিখে সমস্ত সংবাদ জানবেন। ইতি—জন্‌সন্ এণ্ড কোম্পানী

অনেক দিন আগে হরিনারায়ণের সঙ্গে আমাদের একবার দেখা হয়েছিল, তার কি হোলো একবার খোঁজ নেওয়া দরকার।

বাপের সঙ্গে ঝগড়া কোরে হরিনারায়ণ তো স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সেখান থেকে তিনি প্রথমে নৌকো কোরে কলকাতায় চলে এলেন। কলিকাতায় তিনি ইচ্ছা করলেই একটা চাকরী-বাকরী নিয়ে সুখে সচ্ছন্দে থাকতে পারতেন কিন্তু হরিনারায়ণ তা করলেন না। তিনি ভাবলেন যে কলকাতায় সকলেই তাঁকে চিনে ফেল্‌বে। দু-দিন বাদে হয়ত তাঁর বাবা এখানে এসে তাঁকে ধরে নিয়ে যাবেন। তারপরে বাড়ীতে গিয়ে আবার বাপের সমস্ত অত্যাচারের সহায় হোতে হবে। তার চেয়ে এমন জায়গায় যাই, যেখান থেকে কোনো সংবাদই বাপের কাছে পৌঁছবে না।

এই ভেবে হরিনারায়ণ স্ত্রীকে নিয়ে কাশী রওনা হলেন। তখন কাশীর পরে আর রেল ছিল না। তিনি মনে করলেন এইখানেই একটা চাকরী জুটিয়ে দিন কাটিয়ে দেবেন, কিন্তু সেখানেও এক মুস্কিল বাধ্‌ল। কাশী তাঁর দেশ থেকে অনেক দূরে হোলেও তিনি দেখলেন যে, রাস্তায় বেরুলেই পদে-পদে বাঙালীর সঙ্গে দেখা হয়। একদিন সত্যিসত্যিই রাস্তায় তাঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখাও হোয়ে গেল। সেখানে

তখনো হরিনারায়ণের গৃহত্যাগের সংবাদ পৌঁছয়-নি, তা না হ'লে সেই আত্মীয়টি তখুনি তাঁদের ধরে দেশে চালান কোরে দিত। হরিনারায়ণ ঠিক করলেন সেই দিনই কাশী থেকে পালাতে হবে। তারপরে বাড়ীতে এসে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ কোরে সেই রাতেই কাশী থেকে গরুর গাড়ী চড়ে আগ্রার দিকে পাড়ি দিলেন। তারপরে প্রায় মাসখানেক বাদে তাঁরা আগ্রায় এসে পৌঁছলেন। আগ্রা শহরটি বেশ স্বাস্থ্যকর, তার ওপর সেখানে বাঙালী একেবারে নাই বল্লেও চলে, কাজেই সেখানে ধরা পড়বার ভয়ও কম। এই সব নানা দিক চিন্তা কোরে হরিনারায়ণ সেইখানেই বাস করতে লাগলেন।

হরিনারায়ণ যে পরিজনহীন, এমন কি যেখানে বছরে একটা বাঙালীর মুখও দেখা যায় না এমন দূরদেশ আগ্রায় গিয়ে বাস করছেন, এ কথা তার বাবা কিংবা ছোট ভাই কেউ স্বপ্নেও মনে করতে পারে-নি। তারা কলকাতা, কি বড় জোর কাশী অবধি খোঁজ কোরে তার সম্বন্ধে নিরাশ হোয়ে গিয়েছিলেন।

এদিকে হরিনারায়ণ সঙ্গে যে টাকা এনেছিলেন তা পথ-খরচ ও বছরখানেক আগ্রায় থাকতে-থাকতেই ফুরিয়ে গেল। জমিদারের ছেলে, খাওয়ার কষ্ট তো দূরের কথা, দু-পা যেতে হোলে যে গাড়ী ছাড়া কখনো পায়ে হাঁটে-নি, তাঁর এত কষ্ট সহ্য হবে কেন? শরীর তাঁর খুব শীগ্‌গীরই ভেঙে পড়তে লাগল; বাড়ীতে টাকা চেয়ে পাঠালে তাঁর বাবা তখুনি আনন্দে টাকা পাঠিয়ে দিতেন কিন্তু তাতে তাঁর আত্মসম্মানে ঘা লাগবে এই জন্য বাড়ীতে সাহায্যের জন্য কিছু না লিখে, সেখানে চাকরীর সন্ধান করতে লাগলেন।

আগ্রায় তখন নতুন রেল হচ্ছিল, হরিনারায়ণ চেষ্টা কোরে সেখানে একটা কুড়ি টাকা মাইনের চাকরী পেলেন। তিনি নিজেদের জমিদারী-সেরেস্তায় কাজ কোরে হিসাবের কাজে খুব পাকা হোয়ে উঠেছিলেন, তার ওপরে তিনি ইংরেজী জানতেন—তখনকার দিনে ও-সব দেশে খুব কম লোকই ইংরেজী জানত। সবার ওপরে তাঁর গুণ ছিল তাঁর সাধুতা। রেলের আপিসে তখন যারা কাজ করত তারা প্রায় সকলেই কোম্পানীর টাকা চুরি করত। কিন্তু হরিনারায়ণ লক্ষ লক্ষ

টাকা নিজের হাতে ঘেঁটেছেন তাঁর কি ঐ দু-পাঁচ টাকায় কখনো লোভ হোতে পারে! তিনি বরং চোরদের ধরে শাস্তি দেওয়াতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সাধুতা দেখে মনিবরা খুব খুশী হোয়ে উঠলেন, আর বছর দশেকের মধ্যেই হরিনারায়ণের কুড়ি টাকা মাইনে থেকে একেবারে একশ' টাকা মাইনে কোরে দিলেন।

এই সময় হরিনারায়ণের একটি ছেলে হয়। এই ছেলের নাম রাখা হোলো অপূর্ব্বনারায়ণ। অপূর্ব্ব বড় হোতে লাগল। পশ্চিমে বাংলা স্কুল ছিল না। হরিনারায়ণ নিজেই তাকে বাংলা অক্ষর শিখিয়ে মাতৃভাষার সঙ্গে পরিচিত করলেন। কিন্তু বাড়ীর বাইরে বাংলা বলবার লোক নেই। অপূর্ব্ব বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে উর্দ্দুতেই কথা কইত। ক্রমে তার চাল-চলন একেবারে হিন্দুস্থানীদের মতন হোয়ে উঠল। তাকে দেখে বোঝবার যো রইল না যে সে হিন্দুস্থানী কি বাঙালী।

অপূর্ব্বনারায়ণ যে কত বড়লোকের ছেলে, তারা যে দেশে মস্ত জমিদার, তার ঠাকুর্দ্দার প্রতাপে যে বাঘে আর গরুতে এক ঘাটে জল খায়—এ কথা সে জানতেই পারলে না। হরিনারায়ণ ছেলেকে ঘুণাক্ষরেও তাঁর আগের জীবনের কথা জানতে দেন-নি। অপূর্ব্ব বড় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার মনের মধ্যে তাদের দেশের কথা জানবার জন্য কৌতুহল হোতে লাগল। একদিন সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ মা, আমাদের দেশ কোথায় ?

মা বল্লেন—কালীগ্রামে।

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করলে—সে কোথায় মা ?

মা বল্লেন—বাংলা দেশে।

অপূর্ব্ব আবার জিজ্ঞাসা করলে—সেখানে আমাদের কে আছে মা ?

এমনি সব প্রশ্ন দিয়ে অপূর্ব্ব প্রায়ই তার মাকে ব্যতিব্যস্ত কোরে তুলত। অপূর্ব্ব যত দিন ছোট ছিল ততদিন তার মা কোনো রকমে কথা কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু অপূর্ব্ব বড় হোয়ে উঠতে এখন আর তার কাছে কোনো কথা গোপন করা সম্ভব হোলো না। শেষকালে একদিন তিনি অপূর্ব্বকে সব কথা খুলে বলে এ সম্বন্ধে কোনো কথা তাঁর বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে বারণ কোরে দিলেন।

অপূর্ব্ব বড় হোলো। হরিনারায়ণেরও ক্রমে একশো টাকা থেকে পাঁচশো টাকা মাইনে হোলো। আগ্রার মতন জায়গায় যার পাঁচশ টাকা আয় তাকে লোকে খুব বড়লোক বলেই জানত। হরিনারায়ণের সুখের দিন ফিরে আসতে লাগ্‌ল। কিন্তু এত সুখ তাঁর সহ্য হোলো না এই সময় হঠাৎ তাঁর সমস্ত সুখদুঃখের সমভাগিনী, তার চিরদিনের সঙ্গিনী স্ত্রী তিন দিনের কলেরায় মারা গেলেন।

স্ত্রী মারা যেতে হরিনারায়ণ একেবারে ভেঙে পড়লেন। এতদিন তিনি স্ত্রীর মুখ চেয়ে কোনো দুঃখকেই দুঃখ বলে জ্ঞান করেন নি, সেই স্ত্রীকে হারিয়ে একেবারে চোখে অন্ধকার দেখলেন।

হরিনারায়ণের বয়স হয়েছিল। স্ত্রীর শোকে তার শরীর খুব শীগ্‌গীর ভেঙে পড়্‌ল। তিনি কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে অপূর্ব্বকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমেরই কোনো কোনো জায়গায় বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন। প্রায় ছ'মাস বেড়িয়ে হরিনারায়ণ আবার আগ্রায় ফিরে এলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে পৃথিবীতে তাঁর আর বেশী দিন নেই। মারা যাবার আগে অপূর্ব্বকে সংসারী কোরে যাবার জন্য তার বিয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সে সময়ে পশ্চিমে যে সব বাঙালী থাকতেন তাদের ছেলেদের বিয়ে হওয়া বড় মুস্কিল ছিল। অত দূরে কেউ মেয়ে বিয়ে দিতে রাজীই হোতো না। হরিনারায়ণ তাদের অপিসে অপূর্ব্বর একটি চাকরীও কোরে দিলেন। ক্রমে তিনি সবই গুছিয়ে আনছিলেন এমন সময় একদিন আপিসে কাজ করতে করতে হঠাৎ তিনি অজ্ঞান হোয়ে পড়লেন। অপূর্ব্ব তখুনি তার বাবাকে সেই অবস্থায় বাড়ীতে নিয়ে এল। সেখানকার ভাল ভাল চিকিৎসক ডাকা হোলো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। তিনদিন সেই অজ্ঞান অবস্থায় কাটিয়ে তিনি ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন।

বছরখানেকের মধ্যেই বাপ আর মা দুজনকেই হারিয়ে অপূর্ব্ব একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়্‌ল। পৃথিবীতে আপনার বলতে তার আর কেউ ছিল না। এই বিশাল সংসারে নিজেকে বড় একা আর অসহায় মনে হোতে লাগ্‌ল। আত্মীয় পরিজন কেউ না থাকলেও হরিনারায়ণকে আগ্রার সকলেই ভালবাসত। তারা এসে অপূর্ব্বকে

সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌ল। অপূর্ব্বের কিন্তু কিছুই ভাল লাগ্‌ছিল না। সে চাকরী-বাকরী ছেড়ে দিয়ে এক রকম সন্ন্যাসী হোয়েই দিন কাটাতে লাগ্‌ল।

এই রকম কোরে প্রায় বছর দুয়েক কাটবার পরে একদিন খবরের কাগজে সরকারী এটর্ণী জন্‌সন্ কোম্পানীর বিজ্ঞাপন তার চোখে পড়্‌ল।

ক্রমশঃ

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

ময়নামতীর মায়া-কানন

পাঁচ

ডিপ্লোডোকাস ?

জলের ভিতর থেকে সেই সৃষ্টিছাড়া জীবটা যখন প্রথম মাথা তুললে, তখন তাকে মনে হ'ল যেন একটা বিষম মোটা অজগর সাপের মত! কিন্তু একমুহূর্ত্ত পরেই আবছায়ার মতন দেখা গেল তার বিরাট দেহ! তার চারটে পা এবং পা-গুলো তার দেহের তুলনায় খুব ছোট হ'লেও প্রত্যেক পা-খানা অন্ততঃ ছয় সাত ফুটের চেয়ে কম উঁচু হবে না!

আমরা স্তম্ভিতের মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম, সেই সাগর-দানব ডাঙায় উঠে তার প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ ফুট লম্বা ল্যাজ বার-কতক বালির উপরে আছড়ালে, তারপর হঠাৎ নিজের হাতীর চেয়ে দ্বিগুণ লম্বা, চওড়া ও উঁচু দেহের উপরে একটা বিশফুট লম্বা অজগরের মতন গলা শূন্যে তুলে আবার তেম্‌নি বাজের মতন চীৎকার করতে লাগল! সে-সময়ে তার মাথাটা এত উর্দ্ধে উঠল যে, পাশে কোন তিন-তালা বাড়ী থাকলেও তার ছাদের উপর থেকে সে অনায়াসে শিকার ধরতে পারত!

তার ভীষণ চীৎকারে রামহরির মূর্চ্ছা আপনি ছুটে গেল! সে চীৎকারে মৃতের চির-নিদ্রাও বোধ হয় ভেঙে যায়, রামহরির মূর্চ্ছা তো সামান্য কথা!

তবু আমরা কেউ পালাতে পারলুম না—যেন এক অসম্ভব দুঃস্বপ্ন দেখে আচ্ছন্নের মতন আমরা দাঁড়িয়ে রইলুম!

তারপরেই আচম্বিতে চীৎকার থামিয়ে সেই ভীষণ জীবটা ঝপাং ক'রে আবার সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, - দেখতে দেখতে তার দেহের সমস্তটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল, জলের উপরে জেগে রইল স্তুধু তার অজগরের মতন মাথা এবং গলার খানিকটা! ঐ মাথা ও গলার তলায় যে কি প্রকাণ্ড ও অদ্ভুত দেহ আছে, তাকে তখন দেখলে কেউ তা কল্পনাও করতে পারত না!

এতক্ষণে আমাদের সাড় হ'ল! আমি বললুম, "জীবটা বোধ করি আমাদের দেখতে পায় নি,—এই-বেলা পালাই চল!"

তারপরেই আমরা সবাই এক সঙ্গে তীরের মতন পাহাড়ের দিকে ছুট দিলুম,—একেবারে গুহার সামনে না গিয়ে আর দাঁড়াতে ভরসা করলুম না। বিমল রুদ্ধশ্বাসে বললে, "বিনয়বাবু, এ কি দেখলুম!"

—"আমিও তাই ভাবচি!"

রামহরি দুই হাত কপালে চাপড়ে বললে, "আর ভেবে কি, হবে, এখানে আর আমাদের নিস্তার নেই!"

আমি ভাবল্‌ [illegible] াতে হাঁপাতে হাসা, "বিনয়বাবু, মঙ্গল ছাড়া আর কোন গ্রহে

কিন্তু বিমল [illegible] ক, গতি আছে ?"

বিমলের [illegible] "আমরা [illegible] ও পারে।"

[illegible] লুম, বালির উ [illegible] লে অন্য কোন গ্রহে এসে পড়েচি।"

—"কেন তুমি এ অনুমান করচ ?"

—"পৃথিবীতে এ-রকম ভয়ানক জীবের কথা কেউ কখনো শুনেচে ?'

কমল বললে, "উঃ! ভাবতেও আমার বুক টিপ্‌ টিপ্‌ করচে।"

আমি বললুম, "আমরা যে পৃথিবীতে এসেচি, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই! এ-রকম সাগর দানবের কথা আমরা আব কখনো শুনি-নি বটে, কিন্তু এই বিপুল পৃথিবীর কোথায় কি আছে, মানুষ তাব সব রহস্য তো জানে না! তবে যে জীবটিকে আমরা এখনি দেখলুম, এটি নিশ্চয়ই 'প্রাগৈতিহাসিক' জীব! প্রাগৈতিহাসিক কি জানো তো ? যে যুগের ইতিহাস পাওয়া যায় না, সেই যুগকে ইংরেজীতে বলে pre-historic যুগ। এই Pre historic কথাটিকে বাংলায় বলে 'প্রাগৈতিহাসিক'।"

বিমল বললে, "হ্যাঁ, সে যুগের কথা আমি কেতাবে পড়েচি। পৃথিবীর সেই আদিম যুগে, যখন মানুষের জন্ম হয় নি, তখন জলে, স্থলে আকাশে নানান অদ্ভুত আকারের জীবজন্তু বিচরণ কবত। তখনকার অনেক জলচর আর স্থলচর জীবের আকার ছিল ছোটখাট পাহাড়েরই মত বড়! তাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কঙ্কাল এখনো মাটি খুঁড়লে পাওয়া যায। কিন্তু বিনয়বাবু, সে-সব জীব তো মানুষ জন্মাবার আগেই পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে ?'

আমি বললুম, "এ কথা জোর ক'রে বলা যায় না। পৃথিবীতে এখনো এমন অনেক স্থান আছে, মানুষ যেখানকার কথা কিছুই জানে না। সে-সব জায়গায় কি আছে আর কি না আছে, কে তা বলতে পারে ? মাঝে মাঝে ভ্রমণকারীদের বর্ণনায় পড়া যায়, পৃথিবীর স্থানে স্থানে কেউ কেউ সেকেলে জানোয়ারদের মত অসম্ভব আকারের জানোয়ার স্বচক্ষে দর্শন করেচে। সে কথা অনেকেই বিশ্বাস করেন না বটে, কিন্তু কথাটা যে মিথ্যা, এমন প্রমাণও তো নেই! এই যে আমরা আজ একটা

অদ্ভুত জীব দেখলুম, এটাকে তো চোখের ভ্রম ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না! প্রাগৈতিহাসিক বা সেকেলে জীবদের অনেক কাহিনী আমি পড়েচি। সেকালে "ডিপ্লোডোকাস" ব'লে এক প্রকাণ্ড জানোয়ার ছিল। আজ যে সাগর-দানবকে আমরা দেখেচি, তার সঙ্গে ঐ 'ডিপ্লোডোকাসে'র চেহারা আশ্চর্য্য রকম মিলে যায়! কিন্তু আজ অনেক রাত হয়েচে, এ-সব কথা এখন থাক্। ভেবে-চিন্তে এ-সম্বন্ধে আমার যা ধারণা, পরে তা তোমাদের কাছে জানাব। এখন এস, ঘুমের চেষ্টা দেখা যাক্ গে!"

ছয়

আবার বিপদ

পরদিন সকাল বেলায় আমরা ভয়ে ভয়ে আবার সমুদ্রের ধারে গেলুম—বন্দী কচ্ছপগুলোকে ধ'রে আনবার জন্যে।

সৌভাগ্যের কথা, সাগর-দানবের আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। কেবল যে-স্থানে দাঁড়িয়ে সে লাঙ্গুল আস্ফালন করেছিল, সেখানটায় দেখা গেল, বালির ভিতরে মস্ত-একটা গর্ত্তের হয়েছে! সে গর্ত্তের ভিতরে অনায়াসেই দশ-বারোজন লোককে কবর দেওয়া যায়! যার ল্যাজেই এত জোর, তার গায়ের জোর যে কত, আমরা তা কল্পনাও করতে পারলুম না!

বালির উপরে সাগর দানবের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পায়ের দাগও আমাদের চোখে পড়ল!

হঠাৎ কমল বলে উঠল, 'একি! মোটে তিনটে কচ্ছপ রয়েচে! অন্যগুলো গেল কোথায়?"

মোটে তিনটে কচ্ছপ! বেশ মনে আছে, আমরা দশটা কচ্ছপ ধ'রেছিলুম! তারা যে বাঁধন খুলে সমুদ্রে পালায়-নি তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। কারণ তাদের পিঠের শক্ত খোলগুলো ভাঙা-চোরা অবস্থায় সেখানেই ছড়িয়ে প'ড়েছিল, কোন জীব এসে যে তাদের মাংস খেয়ে গেছে, এটা বুঝতে আমাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হ'ল না।

আমি ভাবলুম নিশ্চয়ই এ সাগর-দানবের কীর্ত্তি!

কিন্তু বিমল চেঁচিয়ে বললে, "বিনয়বাবু, বিনয়বাবু, দেখে যান!"

বিমলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলে। চেয়ে দেখলুম, বালির উপরে বড় বড় পায়ের দাগ!

বিমল বললে, "দেখচেন, এগুলো সাগর-দানবের পায়ের দাগ নয়?"

হ্যাঁ, এ পায়ের দাগ একেবারে অন্য রকম! তবে এও নিশ্চয় আর একটা বিরাটদেহ দানবের পদচিহ্ন, কারণ প্রত্যেকটি পায়ের দাগ লম্বায় অন্ততঃ তিনফুটের চেয়ে কম নয়! উঃ, নাজানি এ জীবটার আকার কী প্রকাণ্ড! প্রতি চারটে ক'রে পায়ের দাগের মাঝখানে আবার আর একটা ক'রে লম্বা-চওড়া অদ্ভুত দাগ রয়েছে! ভালো ক'রে দেখে বুঝলুম, এটা সেই অজানা দানবের বিপুল লাঙ্গুলের চিহ্ন!

বিমল সেই পায়ের দাগ অনুসরণ ক'রে অগ্রসর হ'ল। রামহরি, কুমার আর কমলকে সেইখানেই অপেক্ষা করতে ব'লে আমিও বিমলের পিছনে পিছনে চললুম।

যেতে যেতে বিমল বললে, "বিনয়বাবু, যার পায়ের দাগ আমরা দেখছি, সেইই নিশ্চয় কচ্ছপগুলোকে খেয়ে ফেলেচে!"

—"আমারও তাই বিশ্বাস।"

—"কিন্তু অত বড় বড় সাত-সাতটা কচ্ছপ একসঙ্গে খাওয়া তো যে সে জীবের কর্ম্ম নয়!"

—"তা তো নয়ই। কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্চ বিমল?"

—"জীবটা কোথায় থাকে, তাই দেখতে। কোন্‌দিক থেকে বিপদ আসবার সম্ভাবনা, সেটা জেনে রাখা ভালো।"

আমি আর কিছু না ব'লে বিমলের সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলুম।

আমরা প্রায় এক মাইল পথ পার হয়ে এলুম, পায়ের দাগের রেখা তখনো ঠিক সমানই চলেছে! খানিক তফাতেই একটা ছোটখাটো বন রয়েছে, পায়ের দাগ গেছে সেই দিকেই।

আমি বললুম, "বিমল, জন্তুটা যে ঐ বনের ভেতরেই থাকে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আমাদের আর অগ্রসর হবার দরকার নেই।"

বিমল কি-একটা জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ল, তারপর বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে একদিকে তাকিয়ে রইল!

যেদিকে সে চেয়ে আছে সেইদিকে তাকিয়ে আমিও যেন থ হয়ে গেলুম!

একটু দূরেই হাড়গোড়-ভাঙা 'দ'য়ের মতন একটা গাছ একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তারই তলায় ব'সে বিচিত্র এক জানোয়ার আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে!

চোখের সামনে দেখলুম যেন ভীষণতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! এ জীব যেন ভগবানের সৃষ্টির বাইরে! তার মুখখানা অনেকটা কুমীরের মত, সামনের পাদুটো ছোট, পিছনের পাদুটো বড়, আর তার মোটাসোটা ল্যাজটা দেখতে কাঙ্গারুর মতন!

তার দেহ অন্ততঃ ত্রিশ হাতের চেয়ে কম হবে না!

হঠাৎ সে ল্যাজ আর পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর বিকট এক অপার্থিব চীৎকার ক'রে ঠিক কাঙ্গারুর মতন এক লাফ মারলে! অত-বড় দেহ নিয়ে কোন জীব যে অমন ক'রে লাফ মারতে পারে, না দেখলে আমি তা বিশ্বাস করতে পারতুম না!

বিমল সভয়ে ব'লে উঠল, "ও যে আমাদের দিকেই আসচে! পালান—পালান!"

আমরা দুজনে প্রাণপণে ছুটলুম—আর সেই কুমীর-কাঙ্গারুও ঠিক তেমনি ক'রেই শূন্যে লাফ মারতে-মারতে আমাদের অনুসরণ করলে! মাঝে মাঝে তার ভীষণ চীৎকার শুনে আমার গায়ের রক্ত যেন জল হয়ে যেতে লাগল! ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বেতারে ছবি

বেতারে কথাবার্ত্তা বলা, বেতারে গান শোনা—এ সব তোমরা অনেকেই শুনেছ। যারা কলকাতায় থাক তারা অনেকে বাড়ীতে বেতার যন্ত্র খাটিয়ে নানা রকম আমোদ উপভোগ করেছ। কিন্তু বেতারে ছবি পাঠানোর কথা কখনও শুনেছ কি? মনে কর তুমি যেখানে আছ সেখানে মস্ত একটা ফুটবল খেলা হচ্ছে—তুমি সেই খেলার ছবি তুলেছ। তুমি ইচ্ছা কোরলে তখনই এই ছবিটা কোলকাতার কোন খবরের কাগজে ছাপবার জন্য বেতারে পাঠাতে পার।

সত্যিকার ফটো | বেতারে পাঠানো ছবি

১৯০৭ সালে জার্ম্মান অধ্যাপক আর্থার কোরন প্রথমে এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হন। এই সময় তিনি বার্লিন থেকে মিউনিক সহরে বেতারে ছবি পাঠাতে সমর্থ হন, ছবি পাঠাতে ১৫ মিনিট সময় লেগেছিল। সেই থেকে এই বিষয়ে আরো বেশী গবেষণা কোরতে করতে তিনি এখন খুব উন্নতি লাভ করেছেন।

বেতারে ছবি পাঠান এখন এতো সোজা হয়েছে যে একখানা পোষ্টকার্ডের মত ছবি যে কোন যায়গায় পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে পাঠান যায়। এই নতুন আবিষ্কারের দরুন পৃথিবীর যে কত উপকার হয়েছে তা এইখানে তোমাদের বলি। মনে কর বোম্বাই সহরে একটা মোকদ্দমা হচ্ছে—এমন সময় একটা খুব আবশ্যকীয় দলীল

দেখবার দরকার হোল। সেই দলিলের ছবি পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে বোম্বাইয়ে পাঠান যেতে পারে। এমন কোরে হাতের লেখা, দস্তখৎ, দরকারী চিঠিপত্র, ইত্যাদি নানা রকম আবশ্যকীয় জিনিষ এক মুহূর্ত্তে যে কোন স্থানে পাঠান যেতে পারে।

বেতারে পাঠানো ছবি
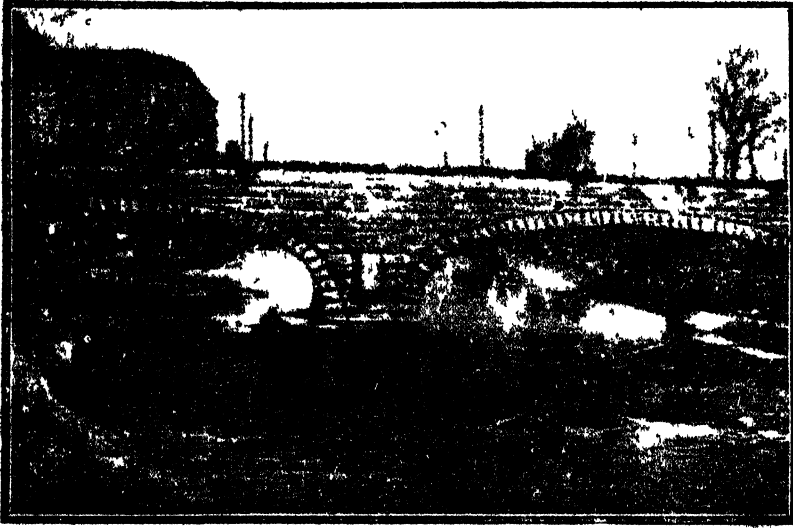
বেতারে ছবির দরুন চোর-ডাকাতকেও ধরবার খুব সুবিধা হয়েছে। কারণ তাদের হাতের টিপ্ যে কোন মুহূর্ত্তে সব খানে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের ধরা যেতে পারে। এই খানে কয়েকটী ছবি ছাপা হোল এই ছবিগুলো এক সহর থেকে অন্য সহরে বেতারে পাঠান হয়েছিল।

সবজান্তা

একজন বৈজ্ঞানিক হিসাব কোরে দেখেছেন যে পৃথিবীতে প্রতি বৎসর ১৬০০০,০০০ বার বজ্রপাত হয়। অর্থাৎ প্রতিদিন ৪৪,০০০ বার। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী বজ্রপাত হয় জাভাতে।

নাইল নদীতে সব চেয়ে বেশী রকম মাছ পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত নাইল নদীতে নয় হাজার রকম মাছ পাওয়া গিয়েছে।

তিমি মাছের শোনবার ক্ষমতা এত তীক্ষ্ণ যে আধ মাইল দূরে কোন নৌকা কি জাহাজ গেলে সে তৎক্ষণাৎ টের পায় এবং জলের তলায় ডুব মারে।

তিনটী বাঙ্গালী যুবক সাইকেলে চড়ে পৃথিবী ভ্রমণ কোরবেন ঠিক করেছেন। গত বৎসর তাঁরা সাইকেলে চড়ে কলকাতা থেকে কাশ্মীর (৪০০০ মাইল) বেড়িয়ে এসেছিলেন। এই পৃথিবী ভ্রমণ কোরতে হলে সবসুদ্ধ তাঁদের ৩০,০০০ মাইল সাইকেল চড়তে হবে।

এ পর্য্যন্ত এরোপ্লেনে কেউ ৩২,০০০ ফিটের বেশী উঁচুতে উঠতে পারে নি। লেফটেনাণ্ট বুলম্যান নামে একজন ফরাসী ৫০,০০০ ফিট উঁচুতে উঠবেন বলে ঠিক করেছেন।

একটা সুঁয়োপোকা আর দেহের ওজনের দ্বিগুন খাবার রোজ খায়। আর একটা গঙ্গা ফড়িং তার দেহের ওজনের দশগুন খাবার রোজ খায়।

চীনের কোন কোন যায়গায় নিয়ম আছে যে যদি কেউ ঋণ শোধ না কোরতে পারে তাহলে যে টাকা টাকা ধার দিয়েছে সে দরজার কবাট খুলে নিয়ে যায়। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কবাট না থাকলে বাড়িতে ভূত দৈত্যরা অনায়াসে ঢুকতে পারে।

একজন ফরাসী গাড়ীওয়ালার সমস্ত গায়ে ১২০ রকম উল্কির চিহ্ন আছে। এর চেয়ে বেশী উল্কি এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন লোকের গায়ে দেখা যায় নাই।

একটা বড় সূর্য্যমুখী ফুল একদিনে দুই 'পিণ্ট' জল টেনে নেয়। আর এক একার জমিতে যা কফির ফসল হয়—তারা চার মাসে ৪৭৫ গ্যালন জল খেয়ে ফেলে।

ধাঁধার উত্তর

১। বন্যকুক্কুট। ২। বৃকলাশ। ৩। জলহস্তী।

নিম্নলিখিত গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ ধাঁধার উত্তর দিয়েছেন।

দীপ্তি সরকার (কিশোরগঞ্জ); বিনয়কুমার ও অমলকুমার বন্দোপাধ্যায় (পাটনা); প্রভাতকুমার দত্ত, রমাই মিত্র, শেফালী ও অশোক ঘোষ; ভুপেন্দ্রমোহন সাহা (মাহিগঞ্জ); সত্যেন্দ্রনাথ ও কুমারেন্দ্রনাথ সরকার (কলিকাতা); হরিহরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা); শ্রীরেণুশ্যাম (কলিকাতা); যোগমায়া ঘোষ (কলিকাতা); কমলা ঘোষ (কলিকাতা); প্রতিভাদেবী (হাজারীবাগ); বাণীদেবী (কলিকাতা); আরতি রায় ও বিভূতিভূষণ সরকার (পাটনা); শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও সোমনাথ ঘোষাল (নদীয়া); তারাদাস রায় (মালদহ); রনেন্দ্রমোহন সিংহ (কলিকাতা); অশোককুমার সরকার (কলিকাতা); দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ (দেওঘর); ধূর্জ্জটীশরণ বক্সী (বাঁকুড়া); বীণাপাণি দেবী (কলিকাতা); প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র (কলিকাতা); ঊষা, আইভি, মুকুল ও সুধীর (যশোহর); বিভুতিভূষণ বসু (মেদিনীপুর); মেনকা ও নন্দরাণী সরকার (কলিকাতা); গুণেন রায় (বাঁকুড়া); শৈলজাবালা দেবী (দেওঘর); সমরেন্দ্র ও রনেন্দ্র রায় (কলিকাতা); তপস্তোষ বাগচী (যমশেরপুর); দমদমা সাহিত্য মন্দিরের শিশু সভ্যগণ (বগুড়া); অমিয়া, ইন্দিরা, অশোক ও অজিত মিত্র (রংপুর); ইন্দুভূষণ দে (কলিকাতা); সুধীরচন্দ্রবসু (কলিকাতা); উপেন, নগেন, সন্তো, আনন্ত, বেহাল, ঝাড়ু ও খোকা (নড়াইল); অশোক, হেনা, বেলা ও পারুল (ঘাটশিলা); সুধাংশুভূষণ মিত্র (দারজিলিং); সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা); জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য ও মুনা

(কামারহাটি); সুকুমার ও সুনীলকুমার দে (পাটনা); সলিলা দেবী ও তরুণকুমার মুখার্জ্জি (নাগপুর); হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (গয়া); কুমারী শান্তিলতা চট্টোপাধ্যায় (আরিয়াদহ); রাজেন্দ্রকৃষ্ণ পটনায়ক (বাঁকুড়া); সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় (দিল্লী); কুমারী করুণাকণা, রবীন্দ্রনাথ ও আর্য্যকুমার সেন (নশীপুর); কুমারী পারুলশান্তি ধর (সিমলা); হিরণচন্দ্র চৌধুরী (রাজসাহী); দেবব্রত দত্ত (চন্দননগর); যতীশচন্দ্র লাহিড়ী (মধুপুর); প্রতিমা, প্রীতি, পূর্ণিমা, উষা, নির্ম্মাল্য ও চন্দন (পাটনা); নিবারনচন্দ্র, ক্ষিতীশচন্দ্র, উপেনচন্দ্র তালুকদার ও তিনকড়ি সরকার (রাজসাহী); নিরুপমা, শ্যামলী, গৌরী, শিবানী, সতীদেবী ও পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (তিনধারিয়া), বীরেশ, রাকেশ, রমেশলোভন সেন, ফুল্লকুসুম, পারিজাত কুসুম ও মল্লিকাকুসুম দাসগুপ্তা (ঢাকা); ইলাবতী সেন (নারায়ণগঞ্জ); দ্বীপেশলোভন সেন (বোম্বাই); ভূপেশলোভন সেন (ময়ূরভঞ্জ) মহির্ম্ময় বসু (কলিকাতা); সনৎকুমার ঘোষ (শিবসাগর); কুমারী ইন্দুপ্রভা দত্ত (ধুবড়ী); নিমাইচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া); হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় (তেলিনীপাড়া); জগদীশচন্দ্র গাঙ্গুলী (ঢাকা); রেণুকণা দেবী, বীণা, শান্তি, সত্য ও বাণী (রংপুর); মুনসুর রহমান (সরিষা); পুষ্পলতা রায় (পাটনা); রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (এলাহাবাদ); কুমারী সুধাময়ী সিংহ (পাটনা); কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় (কালিপাহাড়ী); লাবণ্যময়ী দে (জমশেদপুর); দ্বীপেন্দ্র, সুধাংশু, গৌরী, ইন্দিরা, অরুণা, আবলু, অমল, বিমল, গৌর, নিতাই ও খুকুরাণী (দিল্লী); বিমলচন্দ্র সেন (দিল্লী); মিস্ স্বর্ণরাণী বসু (কলিকাতা); অরুণাসেন (থানা—বম্বে); প্রজ্ঞা কাঞ্জিলাল (দেরাদুন); খোকন (সুনামগঞ্জ); কুমারী প্রফুল্লময়ী রায় (বাঁকুড়া); বিমলেন্দুবিকাশ রায় (বগুড়া); কমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পানিহাটী); কৃষ্ণকিঙ্কর সরকার (চাঁচল); অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (হাজারিবাগ); অরুণকুমার রায়, কুমারী রেণুকা ও রেবাদেবী (দেওঘর); সরোজকুমার সরকার (কলিকাতা); ধীরেন ও ভবেশ ভাদুড়ী (নবদ্বীপ); Miss Dolly Ghosh (Calcutta); খোকন, রাণু ও বেনু (শ্রীহট্ট); স্নেহপ্রসূন সেন (এলাহাবাদ); মেহেরুন (কাশীপুর); Students I. N. M. Institution (Maheshpur); দুর্গা, ফুলি, বুড়ো, অনি, পুটে ও টুনু (পাটনা); শুধাংশুশেখর মজুমদার (খুবড়ী); অর্দ্ধেন্দুনাথ মজুমদার (জুনিয়াদহ); দেবী, সুকু অনু বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা); প্রতুলচন্দ্র ঘোষ, হীরেন্দ্র ও বীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য, শক্তিভূষণ ও নরহরি দাস (বীরভূম), অসীমা বসু (পাটনা); অরুনানন্দ সেন (ভাগলপুর); লীলা ও বুলবুল রায় (এলাহাবাদ); দত্ত ফ্যামিলি লাইব্রেরীর বালকগণ (কলিকাতা); প্রমীলা রায় (পুরী); শুভেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (শ্রীহট্ট); প্রিয়ব্রত লাহিড়ী (কলিকাতা); দেবব্রত লাহিড়ী (কলিকাতা); নিতাই, প্রভাত, মধুসূদন ও দীনেশকুমার পালিত (চন্দননগর); সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভ্রাদেবী (পুরী); দেবব্রত ভাদুড়ী ও সুধীরচন্দ্র সরকার চন্দ্রশেখর চট্টরাজ (পুরুলিয়া); এনু, পুনু, বেলা, ছেনা, মোনা, গুজু, বুলু ও ডিনু (ডালটনগঞ্জ); বিজয়া সেনগুপ্তা (কলিকাতা); সুধাংশুকুমার রায় (মুরসিদাবাদ); গৌরি ও অরুণ সেনগুপ্ত (ইন্‌সিন্—বর্ম্মা); রাধাবিনোদ শেঠ (চন্দননগর); শিশিরকুমার পাকড়াশী (চুঁচুড়া); সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহেবগঞ্জ); মনু ও বুটু (হাজারিবাগ); প্রতুলকৃষ্ণ গুপ্ত (মালদহ); কুমারী বেলা বসু (ডায়মণ্ডহারবার); নকুলেশ্বর বসু (ঢাকা); বিমলেন্দু মজুমদার (ফরিদপুর); সৌরেন্দ্রনাথ দে (পাটনা); অমলেন্দু বসু (পাটনা); নবেন্দুশেখর দাস (মেদিনীপুর); বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় (আজমীর); সুনীলকুমার বসু (কলিকাতা); রাণী সরকার (রাঁচি); চট্টেশ্বর চক্রবর্ত্তী (টাঙ্গাইল); শচীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত (গোলকগঞ্জ); কালিদাস লাহিড়ী (সিরাজগঞ্জ); নীরোদবিহারী রায় (কলিকাতা); বিমলেন্দুনাথ ঘোষাল (বর্দ্ধমান); উর্ম্মিলা দেবী (ঢাকা); চন্দনকুমার ঘোষ (রেঙ্গুন); বীণাপানি দেবী (রংপুর); সন্তোষকুমার চন্দ্র (নির্শাচটী); নির্ম্মলাবালা দেবী (কামারহাটী); সবিতানাথ দে চৌধুরী (রাণাঘাট); নুটবিহারী, নলিনী, কমলা, গৌরি, খাঁদু, নন্দ ও শুভু (পাটনা); শান্তসারণ সরকার (রাণীগঞ্জ); প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় (গয়া); পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (রাঁচি); কালিন্দ্রকুমার পাল (কটক); বিমলপ্রভা চন্দ্র (কৃষ্ণনগর)

[illegible]

৭ম বর্ষ] কার্ত্তিক ১৩৩৩ [সপ্তম সংখ্যা

শরৎ

নেই কো কেন কদম কেয়া শিখীর কেকা-রব,
বাদল্ দিনের মেঘেব মুখোষ কোথায় গেলো সব।
ভোরেব বেলা সূয্যিমামাব চাঁপার মতো আলো
শিশির ভেজা ঘাসের পরে লাগ্ছে বড ভালো।

নদী পুকুব ছাপিয়ে ওঠে, ধানের ক্ষেতেব বিল
বকের শ্রেণী দিচ্ছে পাড়ি পারুল-ডাঙ্গার ঝিল্।
মাথাব পবে সুনীল আকাশ, নীচে শ্যামল ধরা,
বাঁধের পাড়ে তালের সারি ঘন পাতায় ভরা।

অরুণ আলোর পড়্লো ছড়া, বাজ্লো মেঘের শাঁখ,
সবুজ ক্ষেতে কাশের চামর দুল্লো লাখে লাখ!
ঝরে পড়া শিউলী ফুলে ঢাক্লো বনপথ,
থাম্লো সেথা শরৎ রাণীর মরাল টানা রথ।

আস্‌তে পথে যেদিকে তাঁর পড়ছে নয়ন দুটি
সোনার ফসল উঠ্‌ছে পেকে পড়ছে ভুঁয়ে লুটি।
চাষার মুখে ফুটলো হাসি, ঘুচ্‌লো সকল শোক,
দুর্গাপূজার বাদ্যি শুনে মাতলো গাঁয়ের লোক।

গোয়ালপাড়ার ক্ষেত্রবাবু মস্ত জমিদার,
চক্‌ মিলানো বাড়ীতে তার লোক ধরে না আর।
বাজ্‌ছে সানাই, নেচে কুঁদে ঢাকী বাজায় ঢাক্‌,
ড্যাব্‌রা চোখো ছেলের দলে লাগিয়ে দিয়ে তাক্‌।

পূজোর ক'দিন কারো ঘরে চড়বে নাকো হাঁড়ি,
গাঁয়ের সবার নিমন্ত্রণ জমিদারের বাড়ী।
ভিয়েন হতে খাঁটি ঘিয়েব আস্‌তেছে সুঘ্রাণ
ছেলেমেয়ের ভিড়ে কোথাও নেই-কো তিলেক্‌ স্থান।

এই ক'টা দিন মধুর সুখে হ'লে অবসান
বিসর্জ্জনের বাজ্‌না শুনে সবাই ম্রিয়মাণ।
কেমন করে মা দুর্গায় বিদায় দেবে বলো
দাঁড়িয়ে সবে কাতর প্রাণে দৃষ্টি ছলছল।

আবার যবে ঘুরবে বছর আসবে আশ্বিন মাস
মা দুর্গা ফিরবে ঘরে পুরবে মনের আশ।
এই আশাটি বক্ষে ধরে বিসর্জ্জনের পরে
ফিরলো সকল গাঁয়ের লোকে যে যার আপন ঘরে॥

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ময়দানব

(গল্প)

পুরাণের সেকেলে গল্প নয়,—একালের কথা।

মফঃস্বলে বাপের মস্ত কারখানা, বাপ মস্ত কারবারী—ছেলের নাম ময়দানব। ময়দানব ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতার সিটি কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট পড়ে, থাকে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে কলেজের হোষ্টেলে।

তার আজগুবি গল্পে দু'দিনেই হোস্টেলে সে নাম কিনে ফেললে। সকলেই বুঝে নিলে, তার নাম যেমন প্রকাণ্ড, কথাও তেমনি, অর্থাৎ প্রকাণ্ড গল্প ছাড়া ময়দানব ছোট কথা কইতেই জানে না!

কাল হলো তার ম্যাচ দেখতে যাওয়া। সেই কি কম ফুটবল খেলায়? ভারী তো শক্ত খেলা! বাপের সে আদরের দুলাল—টাকা চাইলেই পায়! বাপকে চিঠি লিখে টাকা আনিয়ে কলেজের ক্লাবে একেবারে দশ টাকা নগদ চাঁদা দিয়ে মেম্বর হলো, আর একটা খেলার ইউনিফর্ম্ম তৈরী করিয়ে ফেললে। কিন্তু চাঁদা পেলেই তো আনাড়ি খেলোয়াড়কে কোনো ক্লাব মাঠে ম্যাচে নামাতে পারে না। কাজেই ময়দানব ইউনিফর্ম্ম এঁটে ঐ প্রাকটিশ করে 'বী'-টীমে; ম্যাচে তার ডাক পড়ে না!

ছুটীর সময় দেশে ফিরে ঐ ইউনিফর্ম্ম দেখিয়ে সঙ্গীদের কাছে কি গল্পই সে ফাঁদতো। মোহনবাগানের সে হলো সেণ্টার ফরোয়ার্ড কি করে? একদিন কলেজে তার প্র্যাকটীশ দেখে মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন তাকে মোটরে চড়িয়ে তাদের ক্লাবে নিয়ে গেল —তারপর দলে ভর্ত্তি করে নিলে! শেফিল্ডকে দুটী গোল যে এবার মোহনবাগান দেছে, সে কার জোরে? সঙ্গীর দল হাঁ করে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইলো। তারপর ডালহৌসি, ক্যালকাটা যে দুটী গোল খেয়েছে, সে কে খাওয়ালে?...এই ময়দানব শর্ম্মা। সঙ্গীর দল মহা-খুসী হয়ে বললে, —জানি, ময়দানব এখানে হা-ডু ডুতে পাল্লা দিতে না পারলেও ফুটবলে সে একেবারে গোবা-প্লেয়ার বনতে পারে!

শুধু ফুটবল। 'ক্যালকাটা সুইমিং কম্পিটিশনে সেই তো ফার্ষ্ট হয়েছিল— শুধু রেফারিটার' অসহ্য ঠেকলো —মফঃস্বলের ছেলে এসে কাপ নিয়ে যাবে! তাই দু'- ইঞ্চির গোল তুলে তাকে দিলে সেকেণ্ড করে। রাগে সে জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে এলো —প্রাইজ নিলেই না! তারপর ঐ জন্মাষ্টমীর দিন। শিবপুরের বাগানে যাচ্ছিল তাদের হোষ্টেলের একটি দল পিক্-নিক্ করতে—একটা ছেলে জলে পড়ে যায় কেমন বে-টক্করে! অতগুলো ছোকরা ভয়ে হতভম্ব—ময়দানব ঝপ্ করে জলে পড়ে ডুব-জল থেকে তুলে ছেলেটাকে রক্ষা করে!

এমনি নানা গল্পে ময়দানব বুঝিয়ে দিলে, কলকাতা সহর তার সাহস আর কশরৎ-কীর্ত্তির জোরে গুলজার হয়ে উঠেছে! চিঠি লিখিস্ না কেন রে? এ কথার জবাবে ময়দানব বললে —সময় পাবো কখন্, বল! ক্যালকাটা আর হাইল্যাণ্ডারদের সঙ্গে মোহনবাগানের যত ম্যাচ, তাতে আমায় না হলে চলে না! তাছাড়া এই শীল্ডের ফাইন্যাল—সেদিন কলেজের এক প্রোফেশরের অসুখ বলে আমাকে পড়ে থাকতো হলো। মন খারাপ ছিল বলেই খেলতে গেলুম না। তাই! না হলে মোহনবাগানের শীল্ড কখনো ফশ্কায়! হুঁঃ! থাক, এবারে যা হয়ে গেল, ফিরে বারে জয় মোহনবাগান!

পরের বছরকার কথা। হোষ্টেলের ছেলেরা মহা সোর-গোল তুলেছে পূজোর ছুটীর আগে। কেউ যাবে বাপ মার কাছে মধুপুর, কেউ পুরী, কেউ বদ্দিনাথ...ময়দানব চুপ

করে বসে শুনছে, দেশ ছাড়া তার যাবার জায়গা আর কোথাই বা আছে! জয়গোপাল বললে—বাইরে না গেলে কিছুই দেখা হয় না, তা যাই বল তোমরা!

ময়দানব এখানে মোহনবাগানের কথা পাড়তে পারে না—কেন না, ফুটবলে সে কত বড় ওস্তাদ, তা হোষ্টেলের ছেলেদের অজানা নয়! এখানে দেশের ছেলেদের সঙ্গে ঝালঝাপাটি, সাঁতার—এই সবের কথা কয়েই সে কোনো মতে নিজের কীর্ত্তি বজায় রাখে! কলকাতায় সে যখন প্রথম আসে, তার মাথায় ছিল লম্বা চুল। হুলো! ধর্ম্মতলায় এক হেয়ার-কাটারের দোকানে ঢুকে আট আনা পয়সা ফেলে ; কিন্তু যা বানিয়ে বেরুলো, খাসা! পিছন-দিকটা কামানো, শাঁস বার করা কেবল বুলবুলীর ঝুঁটি! দেশে বাপ ছেলের মাথা দেখে বললেন,—এ কি কাণ্ড ঐ হতভাগা সামনের দিকটা ছাঁটবার পয়সা দিস্‌নে, বুঝি? ময়দানব হেসে বলে সেই কলকাতার মধ্যে ফুটবল খেলতে গেলে এমনি গোরাদের মত চুল ছাঁটতে হয়, ফুটবল-প্লেয়ারদের ফ্যাশান! গোল-কীপারের

ছুটীর আর ক'দিন বাকী। হঠাৎ ময়দানবের দিদির চিঠি! লিখেছে,—আমরা পশ্চিমে এসেছি—ঝুপসী! বাবা অবাক হয়ে গেল! ভাইরে, এবার ছুটীতে তুমি এখানে আসো। কবে আসবে, টীম ম্যাচে নিলে না খেলতে আমাদের ঠিকানা, প্রবাস-বাস, ঝুপসী, বি, এন, আর, কলেজের কাছে! যেমন দর্প,

দেশ থেকে তার বাবা লিখে পাঠালেন,—ছুটীতে বেশী পাঠালুম। পূজা-কনসেশন-টিকিট কিনো। ইতি— যেয়ে

ঝুপসী হাবড়া থেকে ১৭ ঘণ্টার পথ ; বেঙ্গল-নাগপুর রেল লাইনে। কি

চিঠি পড়ে ময়দানব লাফিয়ে উঠলো—মার্ দিশ্ কেল্লা। সে ঝুপসী যাচ্ছে!

ময়দানব তো সেইদিনই চাঁদনি থেকে এক ওভারকোট কিনে নিয়ে এলো, তাছাড়া হেয়ার-অয়েল, টুথ-ব্রাশ, টুথ-পেষ্ট, সেণ্ট, এমনি সব খুঁটিনাটি! ছোট ছোট ভাগ্নে-ভাগ্নী আছে—তাদের জন্য কিনে আনলে, কল্যর-বক্স, রেশ-গেম, লুডো, সেলুলয়েডের পুতুল, এই সব। তারপর ছুটী হতেই এক ট্যাক্সি ডাকিয়ে সোজা চলে এলো হাওড়া ষ্টেশন এবং বাপের কথা মত পূজা-কনসেশন-টিকিট কিনে

ট্রেনে চড়ে বসলো। ঐ-পর্য্যন্ত বেশ চললো—কিন্তু তারপর যা ঘটলো, শোনবার মত!

ঝুপসীতে ট্রেন এসে পৌঁছুলো পরদিন বেলা তিনটেয়। ময়দানব কেবলি টাইম্-টেব্‌লের পাতা উল্টে দেখছে, কখন ঝুপসী আসে। ঝুপসীর প্লাটফর্ম্মে ট্রেন ঢুকতেই সে জিনিষপত্র গুছিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল,— ঐ যে প্লাটফর্ম্মে তার বড় ভাগ্নে ফকিরচন্দ্র দাঁড়িয়ে। মনের আনন্দে ট্রেন থামবার আগেই সেই ইউনিফর্ম্ম পরা মূর্ত্তি নিয়ে কামরার দরজা খুলে সে দিলেএক লাফ। প্লাটফর্ম্মে ছিল একটা কলার ছোবড়া পড়ে—কোন হতভাগা পাজা কলা খেয়ে ছোবড়া ফেলেছিল, ময়দানব লাফ মারতেই তার পা পড়লো সেই ছোবড়ায়! অমনি, দুম্ করে এক আছাড়! ময়দানব কোন মতে উঠে একবার দন্ত-বিকাশ করলে। তার পর কোলি-কোলি করে হাঁক পেড়ে জিনিষপত্র নামাতে বললে।

ভালকে
শর্ম্মা।
দিতে না
শুধু যু
শুধু রেকারিটা
ইকির গোল তুলে
—প্রাইজ নিলেই
হোষ্টেলের একটি দল
বে-টক্করে। অতগুলো ছোকরা
জল থেকে তুলে ছেলেটাকে রক্ষা
এমনি নানা গল্পে ময়দানব বু
কীর্ত্তির জোরে গুলজার হয়ে উ
জবা ...নের বললে
সা

কামরার দরজা খুলে সে দিলে এক লাফ

ফকির এসে বললে,—লাগলো মামা?

ময়দানব তার পানে একবার হেসে বললে,—দূর পাগলা! আমরা ফুটবল প্লেয়ার! পড়ে পড়ে গা শক্ত হয়ে গেছে। আমাদের কি লাগে! হুঁঃ, এবার

মোহনবাগানে খেলেছিলুম না,—এই লাষ্ট শীল্ড ম্যাচে—হাইল্যাণ্ডারদের সঙ্গে ম্যাচ—ওঃ, কি ধাক্কাধাক্কি—সে তোরা আইডিয়াই করতে পারবিনে!

ভাগনে আর স্পীক্-টি নট্! তার মামা এমন মাতব্বর। মোহনবাগানে শীল্ড খেলেছিল! গর্ব্বে তার বুক ফুলে উঠলো। কথা কবার শক্তিও তাই লোপ পেয়েছিল!

মোহনবাগানের কথায় ময়দানব এমন তন্ময় যে ট্রেন থেকে জিনিষগুলো কুলি নামালে কি না, সে হুঁশ তার ছিল না। ট্রেন চলে যেতে প্লাটফর্ম্ম খালি হলো। তখন ময়দানব দেখে, সর্ব্বনাশ। তার নতুন ওভারকোটটা নামানোই হয়নি! কিন্তু ভাগনের সামনে সে কথা বলে বেকুব হতে পারে না! এখানে আসার জন্য কেনা ওভারকোট—নগদ ত্রিশটি টাকা দাম দিয়েছে—গা কবকব করতে লাগলো! ঐ হত-ভাগা কল্যাণ ছোবড়ার জন্যেই না এই কাণ্ড। রাগে ফুটবলী কৈতায় সে সেই ছোবড়াতে মারলে এক কিক্। ছোবড়া যদি বল হতো, আর এটা যদি ফুটবল-গ্রাউণ্ড হতো, আর সামনে যদি হাইল্যাণ্ডারের গোল-পোষ্ট থাকতো তো গোল-কীপারের সাধ্যও ছিল না সে ছোবড়া আটকানো—নির্ঘাৎ গোল হতো।

ময়দানব নিজের কিকের জোর দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল! হায়রে, এত কায়দা থাকা সত্ত্বেও ময়দানবকে সিটি কলেজ টীম ম্যাচে নিলে না খেলতে—ইলিয়ট শীল্ডে হেরেও মরেছে তাই ঐ সবাবন কলেজের কাছে! যেমন দর্প, তেমনি তা চূর্ণ হয়েছে!

প্লাটফর্ম্মের বাহিরে একগাদা পুশ্-পুশ্ গাড়া দাঁড়িয়ে ছিল। তারি একটা নিয়ে মামা-ভাগ্নে বাসায় চললো। গাড়ীতে বসে মামা কলেজে খেলার মাঠে তার কি প্রতিপত্তি, তার এমন পরিচয় দিতে দিতে চললো যে, নিজের কাণেও সে-সব কথা একেবারে আশ্চর্য্য-রকম শোনাচ্ছিল। যেন রূপকথা!

বাড়ী এসে দিদিকে ভগ্নীপতিকে প্রণাম করে ভাগ্নে ভাগ্নীর উপহার বণ্টনে উদ্যত হতে দিদি বললেন,—যা, যা, নেয়ে নে শীগগির! কত কষ্ট হয়েছে বেলে! ও-সব পরে হবে'খন!

হেসে ময়দানব বললে,—কিছু কষ্ট হয়নি, দিদি...জানো না তো, আমাদের

এ-সব কত রপ্ত! সেবার আমাদের মোহনবাগান খেলতে গেল না, সেই ইউক্লিড কাপ্ কম্পিটিশনে, বম্বায় ..তা আমি হলুম মোহনবাগানের সেণ্টার-ফরোয়ার্ড...যেতে হলো! সে কি কষ্ট ..ওঃ, এ তো তার কাছে নস্যি! ...

ভগ্নীপতি বললেন -যাওনা বাবু, নাইতে! তোমার দিদি বলছেন, বড় বোনের কথাটা রাখোই না তোমারও ইউক্লিড জিওমেট্রি এ্যালজেব্রা-টুর্ণামেণ্টের কথা পরে শোনা যাবে'খন!

ভগ্নীপতির শেষ কথাটায় ময়দানব একটু ভড়কে গেল! এ্যালজেব্রা-টুর্ণামেণ্ট! তাহলে...? অর্থাৎ তোমরা বুঝতেই পারছো, ময়দানবের এ কথা একদম বানানো! মোহনবাগানের তাঁবুর ধারেও কোনো দিন সে যেতে পারেনি, ঐ হেডোয়ার্ডস্ কোম্পানির গ্যালারিতে বসে মোহনবাগানের খেলাই যা দেখেছে! তার পর ইউক্লিড্ টুর্ণামেণ্ট আবার আছে না কি! ময়দানব চুপ-চাপ স্নান করতে গেল।

দিব্যি বাথরুম -প্রকাণ্ড বাথটবে জল, একেবারে আমীরী কায়দা! ময়দানব স্নান করে এসে আহারে বসলো। আহারের পর ভাগ্নে-ভাগ্নীকে উপহার বিতরণ হলো। তারপর একটু গল্পসল্প করে ভাগ্নেকে বললে,—চলো হে ফকিরচন্দর, একটু বেড়িয়ে আসি। ফকির তখন বাপের কাছে লুডোর ছক্ পেড়ে বসেছিল। একটু খেলে মামার কথায় বেজায় অনিচ্ছাসত্ত্বে বেরিয়ে পড়লো। মামা লুডো দেছে, সেজন্য কৃতজ্ঞতাও কিছু আছে তো!

ঝুপসী বেশ জায়গা—পাহাড় লেক্, চমৎকার! সন্ধ্যার পর মামা-ভাগ্নে বাসায় ফিরলো —তারপর গল্প, আহার, নিদ্রা।

দু'দিনে ময়দানবের কাছে ঝুপ্সীর পথ-ঘাট সব রপ্ত হয়ে গেল। বাড়ীর সঙ্গে তার যা ঐ স্নানাহার আর নিদ্রার সম্পর্ক! তাছাড়া বাইরেই সে ঘোরে! আর রোজই সে বাড়ীতে মজার মজার খপর নিয়ে ফেরে! দিদিকে বলে, ঐ যে কোণে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, ওটা এত কাছে দেখালে কি হয়, বাসা থেকে ঠিক পাক্কা দশ মাইল। ওই পাহাড়ের উপর অগস্ত্য মুনির আস্তানা আছে! সেখানে এক যোগী

আছেন, তাঁর বয়স আড়াইশো বছর। তিনি ময়দাবনকে দেখে বলেছেন, সে একটা কীর্ত্তি রেখে যাবে!

শুনে দিদি বললেন,- যাবিরে আমারে নিয়ে?

ময়দানব বললে,—আমার তো ইচ্ছে, দিদি—কিন্তু যাওয়া তোমার শক্তিতে কুলোবে না।

দিদি বললেন,—কেন?

ময়দানব বললে,—পাহাড়ের কাছাকাছি চার মাইল গাড়ীর পথ নেই। সে চার মাইল খালি পাথর আর নদী,—তাছাড়া ছোট ছোট আরো গোটা আষ্টেক পাহাড়ে চড়া···সে কি পাহাড়, দিদি! আমি নেহাৎ শক্ত ছেলে, তাই না...তো আমারো ঐ চার মাইল পথ যেতে চার ঘণ্টা সময় লেগেছিল...

দিদি বললেন,—তাবলে যোগীবরকে দেখবো নারে! হোক্ কষ্ট, আমি নয় এঁকে বলে ডুলির বন্দোবস্ত করাবো! ডুলি পাওয়া যাবে না?

ময়দানব বললে—না। ঐ তো মুস্কিল!

দিদি এ কথা তাঁর স্বামীকে বললে তিনি ময়দানবকে বললেন,—অগস্ত্য মুনি এখানে কোথা থেকে এলো আবার!

ময়দানব বললে,—আমি তা জানি না। যোগীবর বললেন আমায়...

ময়দানবের ভগ্নীপতি উকিল। তিনি তখন জেরা সুরু করলেন। ময়দানব জেরার জবাবে রামায়ণ-মহাভারতের কত কথা পেড়ে বসলো। শেষটায় ভগ্নীপতি পরের দিন নিজে ময়দানবের সঙ্গে গিয়ে যোগীবরকে বাসায় আনবেন বলতে ময়দানব বললে —কিন্তু যোগীবর কাল ভোরেই হরিদ্বারে চলে যাবেন, বলছিলেন। নাহলে...

এর পর ভগ্নীপতি চুপ করলেন।

এমনি খুঁটিনাটী কথা আর কত বলি! রোজ রোজ এমনি সব কাহিনী বলে ময়দানব যখন আপনাকে মস্ত উঁচুতে উঠিয়ে বসেছে, তখন একদিন নাকাল হলো কি রকম, সেই কথাটুকু বলে আজকের গল্প শেষ করা যাক্!

ঝুপসীতে বাংলা-বাড়ী বিস্তর। বাংলা-বাড়ীগুলি সব ঠিক এক ধরণের। সবগুলিই

মতুন। সামনেই ফটক, তারপর মাঝখানে ফুলগাছের বাগান—বাগানের দুধারে পথ ঘুরে বাংলার সামনে গেছে। বাংলা উঁচু ফ্লোরের উপর। বাংলার ফটকে সব নাম লেখা আছে। ময়দানবের বাংলার নাম প্রবাস বাস। তার পাশের বাংলার নাম আরাম-নিবাস। তার পাশে বিরাম-কুঞ্জ, তারপর পুলক-আশ্রম; এমনি। এই নাম লেখা না থাকলে বিষম গোল বাধতো, এর বাংলায় ও উঠতো, ওর বাংলায় সে এসে ঢুকতো। বাংলা সব বাইরে থেকে দেখতে এক—কোনো তফাৎ নেই! এবারে সব বাংলাই ভর্ত্তি। বাঙালী মাদ্রাজী পার্শী একেবারে নানা জাতের লোকজনে ঝুপসী সহর সরগরম হয়ে উঠেছে!

অম্বিকাপতি রোজ বলেন, অন্ধকার রাত্রে এখানে বাড়ী খুঁজে ঢোকা ভারী শক্ত। দিয়াশলাই জ্বেলে বাংলার নাম দেখে ঢুকতে হয়। না হলে কোনটায় ঢুকতে কোনটায় ঢুকবো! ময়দানব তাই যেখানেই যাক, সন্ধ্যার সময় ফেরে।

সেদিন ময়দানব খুব গুমর করছিল, সে সহরে থাকে এখানকার বাংলা তার এমন চেনা হয়ে গেছে যে অন্ধকার রাত্রে দিয়াশলাই না জ্বেলেও সে বাড়ী খুঁজে আসতে পারে। ভাগনে ফকিরচন্দরের বাইসিক্ল সেদিন সে নিয়ে বেরিয়েছিল। বিকেলের দিকে একটা পাহাড়ে পথে ফিরতে গেল সে বাইসিক্লের টায়ার ফেটে। সর্ব্বনাশ! এতখানি পথ ঐ বাইসিক্ল ঘাড়ে আসাও শক্ত! কি করে? কতদূর এসে সে সামনে দেখে, ঝুপসীর পুলিস ফাঁড়ি। সেখানে গেল। ফাঁড়িতে ছিল এক বাঙালী সব-ইনসপেক্টর! বাঙালী দেখে ময়দানবকে তিনি চা খাওয়ালেন। ময়দানব নিজের বিপদের কথা বলে বাইসিক্লখানি সে-রাত্রের মত ফাঁড়িতে রেখে বাসায় ফিরছিল হেঁটে। সে কি একটুখানি পথ! অন্ধকার রাত্রি! তারপর পথের নানা ফ্যাকড়া বেরিয়েছে। প্রায় ঘণ্টা দুই ঘুরে একখানা বাংলায় সে ঢুকে পড়লো। রাত্রি ছিল অন্ধকার। পকেট থেকে দিয়াশলাই বার করে জ্বালবে, দেখে, একটিও কাঠি নেই। প্রবাস-বাস বাংলায় ঢুকতে যদি আর কোনো বাংলায় ঢোকে? সে একবার থমকে দাঁড়ালো, তারপর ভাবলে, না, এই বাংলাই ঠিক। ময়দানব ফটকে ঢুকলো। ঢুকে দু'পা এগিয়েছে, অমনি বাংলার বারান্দায় এক কুকুর ডেকে উঠলো বিষম বিরক্তভাবে, ভৌ করে। সে শব্দে

বাংলার ঘরের দোর খুলে তখনি এক আলো ফুটে উঠলো। টর্চ! এবং ইংরাজী গলায় স্বর ফুটলো, কৌন্ হ্যায়? সর্ব্বনাশ! এ যে সাহেবের বাংলা। তারপর ওটা সাহেবের কুকুর যখন, তখন নিশ্চয় ডালকুত্তা! ময়দানব তাড়াতাড়ি ছুটে একেবারে ফটক ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। পিছনে কুকুরের চীৎকার, ঐ এলো বুঝি। ময়দানব ছুটতে ছুটতে অমন কতখানি পথ পার হয়ে যে এলো, দম ফুরিয়ে গেছে ঘেমে উঠেছে! আর পারা যায় না। সে একবার দাঁড়ালো। না আর কোনো সাড়া শব্দ নেই। মাথার উপর এক আকাশ নক্ষত্র। একটু দাঁড়িয়ে তারপর আর একটু এগিয়ে ময়দানব ডানহাতি এক বাংলায় ঢুকলো। এবার ঠিক বাংলা। আর ভুল নয়।

বাংলায় ঢুকে এগিয়ে এসে ময়দানব দেখে, বাংলার দোর বন্ধ! সে ভাবলে, আচ্ছা, তার ঘর তো পিছন দিকে সে ঠিক ঢুকবে। ভেবে সে সেইদিকে চললো। ওদিকে বাংলার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে ভিতর থেকে কে বলে উঠলো,—কে? স্বর বাঙালী মেয়ের।
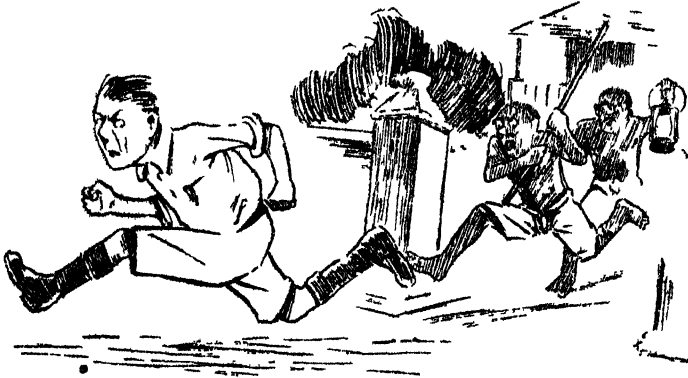
কিন্তু এ তো তার দিদির গলা নয়। তবে কি এবারো ভুল হলো? এদিকে পা যে-

মার মার শব্দে তিনচারজন লোক বেরিয়ে পড়লো

রকম ভারী হয়ে উঠেছে, একটু না জিরুলে এ পা চালাবার সামর্থ্যও হবে না। কাজেই সে একটু পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। ওদিকে তার জবাব না পেয়ে বাংলার দরজা

খুলে গেল আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন ! আলোটা চারিধারে ঘুরিয়ে কে বললে,—ঐ যে, ঐ একটা মানুষ .

সঙ্গে সঙ্গে তেওয়ারী, লছমন, ভুলু বলে ডাকাডাকি এবং পরক্ষণেই মার-মার শব্দে তিন-চারজন লোক আর লাঠী-সোঁটা ঘাড়ে তেওয়ারী লছমন ভুলু বেরিয়ে পড়লো। ময়দানব গুড়ি মেরে ফটক পার হয়ে পথে এসে দাঁড়ালো ; কিন্তু ছোটবার শক্তি আর নেই ! তাছাড়া এ অন্ধকারে কোন দিকেই বা ছুটবে ? তার চেয়ে ..

তেওয়ারী এসে তার মাথার বুলবুলির ঝুঁটি ধরে দিলে এক টান।

ভিতর থেকে মনিব বললেন,—ধরে আন।

তখন তেওয়ারী আর লছমন পাঁজাকোলা করে একেবারে ঝুলন্ত অবস্থায় ময়দানবকে এনে বাংলার বারান্দায় ফেললে। ভুলু বললে,—ঠিক। এই ছোঁড়াই কাল আমার বাইসিক্ল চুরি করেছে, বাবা। আজ ওকে দেখেছি দুপুরবেলা বাইসিক্ল চড়ে যাচ্ছিল। এখন আবার এসেছে, আবার কি চুরির মতলবে !

বাবু বললেন,—বেঁধে থানায় নিয়ে যা...

ময়দানব কাকুতি করে বললে, সে চোর নয়। এ বাংলায় ভুল করে ঢুকে পড়েছিল।

ভুলু বললে,—বেটা শয়তান ! চোর নন্ ! মাথায় এই বুলবুলির ঝুঁটী...বার্ডসাই খাস্ ? এ চুল ছাঁটা ভদ্দর লোকের নয়। বেটা বার্ডসাই-খেকো চোর ! বলে সে তার মাথার বুলবুলির ঝুঁটি ধরে মারলে এক গুঁতো ময়দানবের পিঠে। ময়দানব সটান্ শুয়ে পড়লো।

মেয়েরা বললে,—মারধোর করিস্ নে রে। শেষে মারা যাবে। তার চেয়ে থানায় দিয়ে আয়।

ময়দানব বললে,—তার আগে একটু জল খেতে দাও। জিভ আমার শুকিয়ে গেছে গো !

ভুলু ভারী গোঁয়ার। সে বললে,—দেবো বৈ কি জল খেতে ! ব্যাটা চোর ! জল কেন, চায়ের পেয়ালা এনে দিচ্ছি ..চা···চা খাবেন, না, কোকো ? বলুন দয়া করে ..

মেয়েরা বললে—আহা, দে বাপু, একটু জল খেতে।

জল খাওয়া হলে তেওয়ারী আর লছমন একটা গামছায় পিছমোড়া বেঁধে ময়দানবকে নিয়ে চললো। বাবু বললেন,—আমিও যাই, চ।

সবাই বেরিয়ে পড়লো। বাবুর হাতে লণ্ঠন। তেওয়ারী আর লছমন ময়দানবকে ধরে নিয়ে পথে এলো।

পা কি চলে! এই মেহনৎ ..তার উপর ঐ গুঁতো, মার! আবার থানা-পুলিশ! ময়দানবের চোখের সামনে পৃথিবীখানা একটা কালো গোলার মত বন্‌বন্ করে ঘুরছিল! পায়ের তলায় পথটা যেন ঝড়ের মুখে নৌকোর মত দুলছিল! মাথা এমন গুলিয়ে গেছলো যে সে কোথায় আছে, কি করছে, কিছুরি হুঁশ ছিল না! এমন সময় উল্টো দিক থেকে সামনে লণ্ঠন ঝুলিয়ে কারা আসছিল। বাবু বললেন—এত রাত্রে বেড়াতে চলেছে কারা – দেখেছিস?

যাদের লক্ষ্য করে কথাটা বলা হলো, তারা কাছে আসতেই ময়দানব বলে উঠলো,—ঐ, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন। আমি চোর নই। উনি আমার ভগ্নীপতি

আসছিলেন ময়দানবের ভগ্নীপতি নিশিবাবু, আর তাঁর চাকর হরিয়া। নিশিবাবুকে দেখে বাবুটি বললেন -নিশিবাবু?

তিনি বললেন,—হ্যাঁ, কে ও? মলয় বাবু নাকি? সঙ্গে···চোর?

মলয়বাবু বললেন –হ্যাঁ, আর বলেন কেন! বেটা কাল একখানা বাইসিক্ল চুরি করে নিয়ে গেছে আজ রাত্রে আবার বাংলায় ঢুকেছিল। তা, খুব ধরা পড়ে গেছে! হুঁসিয়ার ছিলুম কি না

ময়দানব বলে উঠলো,—নিশিদা বাঁচান আমাকে।

নিশিবাবু বলে উঠলেন—আরে, ময়দা?

আর ময়দানব! ঠাণ্ডুনির চোটে সে তখন লেচি হয়ে গেছে! তার মুখের কাছে লণ্ঠন তুলে নিশিবাবু বললে,—ময়দাই তো। এঁর বাংলায় ঢুকলে কি করে? এই রাত হয়ে গেছে, বেড়িয়ে ফেরোনি! সকলে মহা-ভাবনায় অস্থির! বাঘের পেটে গেলে, কি, ভাল্লুকের থাবায় পড়লে...দেখুন তো, মলয়বাবু, আক্কেলখানা! আমার সম্বন্ধী এটি...এত রাত্তির অবধি হাওয়া খায় কেউ? খুঁজতে বেরিয়েছি তাই –

মলয় বাবু বললেন,—আপনার সম্বন্ধী! আরে, তা বলতে হয় বাপু, এতক্ষণ! পরিচয় দিলেই তো চুকে যেতো! এই চোরের মার খেলে? একটু বুদ্ধি নেই? ছি, ছি!

ময়দানব বললে—আজ্ঞে, সময় দিলেন কৈ! আপনার ছেলে যে মারটা মারলে—

মলয়বাবু বললেন,—ভারী গোঁয়ার ছেলে। ফুটবল খেলে না। ও যে মোহনবাগানের প্লেয়ার।

নিশিবাবু বললেন—তাহলে তোমায় চিনতে পারলে না? তুমিও না মোহনবাগানের শীল্ড প্লেয়ার?

আর প্লেয়ার! ময়দানব একেবারে কাবু। মাবে এমন কাবু হয়নি, এ কথায় যেমন...!

ব্যাপার খোলশা বোঝা গেল—রূপসার বাংলাগুলো সব এক ধরণের কি না—আর ময়দানবের কাছে দিয়াশলাই ছিল না বলেই এই কাণ্ড। নিজেদের বাংলা ভেবে মলয়বাবুর বাংলায় ঢুকে পড়েছিল!

মলয়বাবু বললেন,—আগের রাত্রে বাইসিক্লের চুরি গেছলো বলে আজ আমরা ...

নিশিবাবু বললেন,—হ্যাঁহে ময়দা, বাইসিক্লের ল্যাম্পটা যদি সঙ্গে আনতে তাহলে তো আর এ গোল হতো না!

ঠিক। নিশিবাবু বললেন, -এই তুমি সহুরে হয়েছ?

ময়দানব কোনো কথা বললে না। তেওয়ারী লছমন তার পিছমোড়ার বাঁধন খুলে সরে দাঁড়ালো। মলয়বাবু কত দুঃখ করলেন। ময়দানবকে পরের দিন নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণও করলেন। তারপর ময়দানবকে নিয়ে নিশিবাবু বাড়ী ফিরলেন।

পরের দিন তোমরা ভাবচো, ময়দানব মলয়বাবুর নিমন্ত্রণ গেল? রাম বল! সেখানে ভুলু আছে, মোহনবাগানের প্লেয়ার, তার জারিজুরি সব ...লে যাবে, বিশেষ ভাগ্নে ফকিরচন্দরের সামনে,—সেও নেমন্তন্ন যাবে তো। কা...! ... দিন পেট ফেঁপেছে, চোঁয়া ঢেকুর উঠছে বলে সে বাড়ীতে পড়ে রইলো।

এর পর মোহনবাগানের নামও সে আর মুখে আনে নি, অন্তত ... যে কটা দিন রূপসীতে ছিল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ময়নামতীর মায়া-কানন

সাত

বিমলের বীরত্ব

আমরা দুজনে ছুটছি, ছুটছি, আর ছুটছি !

আমাদের পিছনে লাফাতে লাফাতে আসছে সাক্ষাৎ-মৃত্যুর মত সেই ভয়ানক জানোয়ারটা।

প্রতি লম্ফেই সে আমাদের বেশী কাছে এসে পড়ছে !

ছুটতে ছুটতে চেয়ে দেখলুম, তার সেই কুমীরের মত প্রকাণ্ড মুখখানা একবার খুলছে আর একবার বন্ধ হচ্ছে এবং তার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে, লাল-টকটকে হলহলে একখানা জিভ ও দুইসার ভীষণ দাঁত ! অত বড় দেহের পক্ষে তার চোখ দুটো খুব ছোট বটে, কিন্তু কি ক্রূর, কি নিষ্ঠুর সেই চোখের দৃষ্টি !

—হঠাৎ কিসে হোঁচট খেয়ে আমি ঘুরে প'ড়ে গেলুম ! দারুণ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ ক'রে তখনি আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম বটে,— কিন্তু ছুটতে গিয়ে আর ছুটতে পারলুম না !

বিমলও দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললে, 'ওকি বিনয়বাবু, হ'ল কি ?'

যাতনায় মুখ বিকৃত ক'রে আমি বললুম, "আমি আর ছুটতে পারচি না বিমল আমার ডান পা মুচড়ে একেবারে এলিয়ে পড়েচে !"

বিমল সভয়ে বললে, "সর্ব্বনাশ, তাহ'লে উপায় ?"

আমি আবার পিছনে চেয়ে দেখলুম ! সেই দানবটা তখন আমাদের কাছে এসে পড়েছে, আর কয়েকটা লাফ মারলেই সে একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপরে এসে পড়বে !

আমি প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে বললুম, "বিমল, শীগগির পালাও !"

বিমল বললে, "আপনাকে এখানে ফেলে ? এমন কাপুরুষ আমি নই !"

—"বিমল, বিমল, আমার জন্যে তুমি মরবে কেন? এখনো সময় আছে, এখনো পালাও!"

বিমল দৃঢ়স্বরে বললে, "মরতে হয়তো দুজনেই এক সঙ্গে মরব, কিন্তু আপনাকে ফেলে কিছুতেই আমি পালাতে পারব না" এই ব'লেই সে বন্দুক তুলে ফিরে দাঁড়াল।

তার অদ্ভুত সাহস ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে আমি বললুম, "কিন্তু বিমল, তোমার ঐ সামান্য বন্দুকের গুলিতে এত বড় ভীষণ জন্তুর কোন ক্ষতি হবে না,—এখনো পালাও, নইলে আমরা দুজনেই এক সঙ্গে মরব!"

"দেখা যাক" ব'লে সে বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করতে লাগল।

সেই ভয়াবহ কুমীর-কাঙ্গারু তার পিছনের দুই পা ও ল্যাজে ভর দিয়ে লাফের পর লাফ মারতে মারতে তখনো এগিয়ে আসছে। সেই অতি বিপুল দেহের উপরে একটা পাহাড় ভেঙে পড়লেও তার কোন আঘাত লাগে কিনা সন্দেহ, বিমলের এতটুকু বন্দুকের গুলিতে তার আর কি অনিষ্ট হবে?

এ যাত্রা আর বোধ হয় রক্ষা নেই—আমি তো মরবই, আমার জন্যে বিমলকেও প্রাণ দিতে হবে।

ভাবছি, এমন সময়ে বিমলের বন্দুক গর্জ্জন ও অগ্নি উদগার করলে!

— সঙ্গে সঙ্গে দানবটাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিমল আবার বন্দুক ছুঁড়লে।

দানবটা আকাশের দিকে মুখ তুলে বজ্রনাদের মতন দুইবার গর্জ্জন করলে, তার পর লাফাতে লাফাতে আবার যে পথে এসেছিল সেইদিকেই বেগে পলায়ন করতে লাগল!

বিমল মহা উল্লাসে ব'লে উঠল, "বিনয়বাবু, আর আমাদের ভয় নেই!"

আমি হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের ভিতরে টেনে নিয়ে বললুম, "বিমল, তোমার সাহসেই আমার প্রাণ রক্ষা হ'ল!"

বিমল বললে, "কিন্তু দুটো গুলি খেয়ে ঐ জানোয়ার যদি ভয় পেয়ে না

পালাত, তাহ'লে আমরা কেউই বাঁচতুম না! আপনি ঠিক কথাই বলেচেন, বন্দুকের গুলিতে ওর বিশেষ কিছুই ক্ষতি হবে না!"

আমি বললুম, "কিন্তু ওকে দেখে বুঝতে পারচ কি, ও একালের জীব নয়? প্রাগৈতিহাসিক কালের যে যুগকে পণ্ডিতরা সরীসৃপ-যুগ বলেন, ওর আকার সেই যুগের জীবের সঙ্গে অবিকল মিলে যাচ্চে। বিমল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা পৃথিবীর এমন কোন স্থানে এসে পড়েচি, যেখানে কোন অজানা কারণে পৃথিবীর সেকালের জীবরা এখনো বর্ত্তমান আছে। এ এক অভাবিত আবিষ্কার। এ সংবাদ জানতে পারলে সারা পৃথিবীতে মহা আন্দোলন জেগে উঠবে!"

বিমল বললে, "কিন্তু এই আবিষ্কারের বার্ত্তা নিয়ে আমরা কি আবার সভ্য-জগতে ফিরে যেতে পারব?"
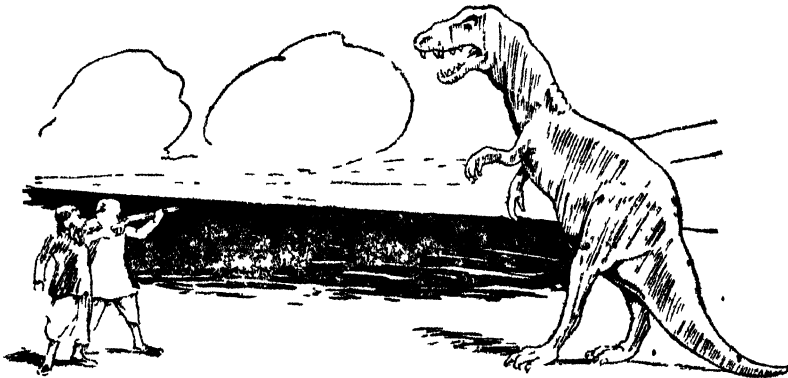
আমি বললুম, "আজ যে জীবটার বিরুদ্ধে তুমি একাই দাঁড়াতে ভরসা করলে, ও-জীবটা যদি হঠাৎ পৃথিবীর কোন সহরে গিয়ে হাজির হয়, তবে ওর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে সহরশুদ্ধ লোক নিশ্চয়ই সহর ছেড়ে পলায়ন করবে! তোমার মতন বীর যখন আমাদের মধ্যে আছে, তখন আমরা এদেশ থেকে দিগ্বিজয়ীর মতন ফিরতে পারব না কেন বিমল?"

বিমল সলজ্জ কণ্ঠে বললে, "বিনয়বাবু, আপনি বার বার ঐ কথা তুলে আমাকে লজ্জা দেবেন না! দেখি, আপনার পায়ের কোন্ খানটা মুচ্‌কে গেছে?"

আট

গরুড়-পাখী

সেদিন গুহায় ফিরে এসে দেখলুম, কুমার, কমল আর রামহরি রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হ'য়ে আছে!

রামহরি ভিজে মাটির তাল দিয়ে কতকগুলো ছোট বড় পাত্র তৈরী ক'রে সেগুলোকে পুড়িয়ে শক্ত ক'রে নিয়েছিল। উনুন তৈরি করতেও সে ভোলে নি। সমুদ্রের জল যখন আছে, তখন লবণেরও অভাব হয়-নি। কাজেই অন্য কোন মশলা না থাক্‌লেও এত বিপদের পরে কচ্ছপের সিদ্ধ মাংস আর ডিম আজ বোধ হয় নিতান্ত মন্দ লাগবে না!... ... ..

সত্যিই মন্দ লাগল না। বেশী আর কি বলব, রামহরির রান্না আজ এত ভালো লাগল যে আমার মনে হ'ল, সহরে নিশ্চিন্তভাবে ব'সেও এর চেয়ে ভালো সুস্বাদু খাবার আর বুঝি কখনো খাই-নি! .. ..

দিন-তিনেক আমরা কেউ আর পাহাড় থেকে নীচে নামলুম না, বেশীর ভাগ সময়েই গুহার ভিতরে ব'সে ব'সে গল্পগুজবে পরামর্শেই কাটিয়ে দিলুম।

আজ বৈকালে আমরা ঠিক করলুম, পাহাড়ের সব-উঁচু শিখরে উঠে দেখে আসব, যে-দেশে আমরা এসে পড়েছি তার চারিদিকের দৃশ্য কি-রকম দেখতে!

যথাসময়ে উপত্যকার ভিতর দিয়ে আমরা পাহাড়ের উপরে উঠতে সুরু করলুম। তখনো আমার পায়ের ব্যথা সারে নি, কাজেই আমার বেশ কষ্ট হ'তে লাগল। কিন্তু সে কষ্ট আমি মুখে প্রকাশ করলুম না।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে, উপত্যকার গর্ভ ছেড়ে আমরা পাহাড়ের একটা উঁচু শিখরের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম!

চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, সমস্ত দেশটা আমাদের পায়ের তলায় ঠিক যেন 'রিলিফ' ম্যাপের মতন প'ড়ে রয়েছে!

সর্ব্বপ্রথমেই একটি সত্য আমাদের চোখের সাম্‌নে জেগে উঠল,—আমরা যেখানে এসে পড়েছি, সেটি একটি দ্বীপ ! কারণ পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ,—আমাদের সব দিকেই আকাশের সীমা-রেখা পর্য্যন্ত অনন্ত সাগরের নীলজল খেলা করছে !

দ্বীপের প্রায়-পূর্ব্বদিকে সেই নিবিড় বন,—যেখানে এসে আমরা প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিলুম। আমরা বেশ বুঝলুম, দ্বীপের সমস্ত বিভীষিকা ঐ নিবিড় অরণ্যের ভিতরেই লুকানো আছে, কিন্তু এখান থেকে তার শ্যামলতা ছাড়া আর কিছুই আমাদের নজরে পড়ল না।

অরণ্যের এক পাশে মস্ত একটা হ্রদ। তার তীরে তীরে নানাজাতীয় পাখী বিচরণ করছে। দূর থেকে সেগুলো কি পাখী, তা কিন্তু বোঝা গেল না।

বিমল উৎসাহ-ভরে বললে, "কালকেই আমি বন্দুক নিয়ে ওখানে গিয়ে দু-একটা পাখী শিকার ক'রে আনব !"

কুমার হেঁট হ'য়ে নীচের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললে, "দেখ, দেখ, এখানে আবার কি বিট্‌কেল জীব ব'সে আছে !"

পাহাড়ের ধারে গিয়ে দেখি, আমাদের ঠিক নীচেই চারটে অদ্ভুত আকারের জীব ঠিক পাথরের মূর্ত্তির মত নিথর হয়ে চুপ করে পাশাপাশি ব'সে আছে ! তাদের গায়ের রং ধূসর, চোখগুলো ভাঁটার মত গোল গোল, রক্তবর্ণ ! তাদের আকার প্রায় পাঁচ ছয় ফুট লম্বা এবং তাদের দেহের দু-পাশে দু-খানা ডানা ও তলার দিকে একটা দড়ীর মত সরু ল্যাজ ঝুলছে ! মুখ দেখলে তাদের পাখী বলে মনে হয় বটে, কিন্তু কারুরই গায়ে পালোকের চিহ্নমাত্র নেই ! তাদের দেখতে এমন বিভৎস যে, আমার বুকের কাছটা থর থর্ ক'রে কেঁপে উঠল !

হঠাৎ তারাও আমাদের দেখতে পেলে ! বিশ্রী এক চীৎকার ক'রে তারা তখনি ডানা ছড়িয়ে উড়তে সুরু করলে। তাদের দুই ডানার বিস্তার অন্ততঃ পনেরো হাতের কম হবে না —আমার মনে হ'তে লাগল, যেন এক একটা চতুষ্পদ প্রকাণ্ড জন্তু চারপায়ে ডানা বেঁধে শূন্যে উড়ছে ! তাদের দীর্ঘ চঞ্চুর ভিতর থেকে ধারালো ও বড় বড় দাঁতের সারিও আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলুম !

রামহরি ব'লে উঠল, "এ কি গরুড়-পাখী ?"

রামহরির নাম দেবার শক্তি আছে বটে ! এই কিম্ভূতকিমাকার উড়ন্ত জীব-গুলোকে সত্য সত্যই অনেকটা গরুড়ের মতই দেখাচ্ছিল !

প্রথমটা তারা আমাদের মাথার উপরে চক্র দিয়ে একবার ঘুরে গেল,—তারপর হঠাৎ তাদের একটা তীরের মতন নীচের দিকে ঝাঁপ দিলে !

আমরা সাবধান হবার আগেই সে হুস্ ক'রে বিমলের ঘাড়ের উপরে এসে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকাণ্ড ডানা ও দেহের ধাক্কায় বিমল পাহাড়ের একদিকে ঠিক্‌রে চিৎ হয়ে প'ড়ে গেল ।

কাছেই কুমার ছিল, সে তার বন্দুকের কুঁদো দিয়ে সেই জীবটার গায়ের উপরে এক ঘা বসিয়ে দিলে ! জন্তুটা কর্কশ চীৎকারে চারিদিক কাঁপিয়ে সেই মুহূর্ত্তে ফিরে তাকে আক্রমণ করলে,—কুমার আবার তাকে মারবার জন্যে বন্দুক তুললে, সে কিন্তু তার আগেই কুমারের একখানা হাত কাম্‌ড়ে ধরলে এবং চোখের পলক না ফেল্‌তে কুমারকে মাটি থেকে টেনে তুলে শূন্যের দিকে উঠল !

এত শীঘ্র ব্যাপারটা ঘটল যে, আমরা সাহায্য করবার জন্যে একখানা হাত পর্য্যন্ত তোলবার সময় পেলুম না !

কুমার আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল, "বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও !"

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ঘুম-গুঞ্জন

১

ঘুম-পরী গো ! ঘুম-পরীরা ! মোর কুটিরে এসো,
ঘুমের কাঠী ছুঁইয়ে আমার খোকায় ভালবেসো !
স্বপন-ভরা অলস-চোখে খোকার দিকে চেয়ো
ঘুমেল্ সুরে মিষ্টি-মধুর নিদালী-গান গেয়ো !

তন্দ্রা তাহার মধুর করো মোহন-আবেশ চাকি,
স্বপ্ন তাহার উজ্জ্বল করো স্বরগ-ছবি আঁকি !
সুপ্তি তাহার গভীর করো সাগর ঊর্ম্মি রোলে,
ঘুম-পাড়ানী-দোলন দুলাও আপন স্নেহের কোলে !
ঘুম-পরী গো ! ঘুম-পরীরা ! নামবে কখন সবে ?
তোমরা এলে তবেই আমার খোকার যে ঘুম হবে !

* *

ঘুম-পরী গো ! ঘুম-পরীরা ! অস্তগিরির চূড়ে
গোধূল্-আলোয় ফাগ্ খেল কি লাল কুঙ্কুম ছুঁড়ে ?
নীল-আকাশে চাঁদের পাশে স্বর্ণ-মৃগ রূপে,
জ্যোৎস্না-সুধা পান কর'কি তোমরা চুপে চুপে ?
আঁধার-রাতে তোম্‌রাই কি এলাও নিবিড় চুল,
সন্ধ্যা-রাণীর কুন্তলে কি পরাও তারার ফুল ?
লজ্জারুণা উষার সিঁথায় অরুণ সিঁদুর দিয়া
প্রভাত হলেই লুকাও কি গো নিশার কুহক নিয়া ?
ঘুম-পরী গো ! ঘুম-পরীরা ! আজকে এসো ত্বরা
আমার খোকার ঘুম আসে না—গাওনা ঘুমের ছড়া !

ঘুম-ঘুম-ঘুম-ঘুম, ঘুম্‌তি দেশের হাওয়া !
নিত্যি সাঁঝে ধরার মাঝে তোমার আসা-যাওয়া,
সাগর-দ্বীপে শুক্তি গড়া শঙ্খ-ধবল পুরী,
ঘুম-রাজাদের ঘুম প্রাসাদে বাজ্‌ছে ঘুমের তূরী !
ঘুম-সভাতে ঘুম-সভাসদ্ ঘুমের কীরিট মাথে,
ঘুম রাণী ঘুম-সিংহাসনে ঘুমের দণ্ড হাতে !
ঘুমের বিচার করেন শুধুই ঘুম-ঢুলুনীর ঘোরে,
ঘুমের কোরক ঘুমিয়ে ফোটে সন্ধ্যা সকাল ভোরে !

ঘুম-সেতারে ঘুম-সখীদের ঘুম-সুরে গান গাওয়া,
ঘুম্-ঘুম্-ঘুম্—ঘুম, ঘুমতি দেশের হাওয়া !

* *

ঘুম-ঘুম-ঘুম—ঘুম, ঘুমতি-দেশের হাওয়া !
নিদ্-সাগরের নীল-স্বপনে সাঁতার কেটে নাওয়া !
ঘুমন্ত চাঁদ ঘুমিয়ে হাসে ঘুম-তড়াগের বুকে,
ঘুম-ঝিঁঝিরা ঘুম-গুঞ্জন গাইছে মনের সুখে !
ঘুম-জোনাকী ঝিলিক্ মারে ঘুমের কুঞ্জবনে,
ঘুম প্রদীপের ঘুমের আলো ঘুমায় ঘরের কোনে,
ঘুম শিশুরা ঘুমের দোলায় ঘুমিয়ে হলো হারা !
ঘুম কাতুরে মা'য়ের বুকের ঘুমের পীযূষ ধারা—
ঘুম অধরে ঘুমের সরস সুধার পরশ পাওয়া !
ঘুম্-ঘুম্-ঘুম্—ঘুম, ঘুমতি দেশের হাওয়া !

* *

ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্ ঘুম,—ঘুমতি দেশের হাওয়া ;
তন্দ্রা হালের বৈঠা টেনে সুপ্তি-তরী বাওয়া !
ঘুম সরসীর বক্ষে যেথায় ঘুমের কমল ফোটে,
ঘুম সুবাসে মাতাল অলি ঘুমের পায়ে লোটে !
ঘুমের বশে প্রভাত পশে, ত্বপুর হাসে ঘুমে,
ঘুম আদরে সন্ধ্যা ভরে, রাত্রি ঘুমের চুমে !
ঘুমের মাদল বাজায় বাদল, শরৎ ঘুমের বাঁশী,
ঘুমের মলয় বসন্তে বয়, ঘুমের পৌর্ণমাসী !
শূন্য, ক্ষিতি, গল্প, গীতি, ঘুমের ঘোরে ছাওয়া
ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্—ঘুম, ঘুমতি দেশের হাওয়া !

শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত

অদৃষ্টের ফল

নন্দ বিরক্ত হয়ে বল্লে—"কুঞ্জ, আব তো ভাই ভাল লাগে না—চল্ এবার অন্য কোথাও যাওয়া যাক্।"

কুঞ্জ বল্লে—"কেন, আমার তো বেশ লাগছে। এব মধ্যে মজা আছে, তার সবটা না নিয়ে এখান থেকে যাচ্ছিনে।"

দুই বাল্যবন্ধু নন্দ আর কুঞ্জব এখন নদীর ধারে সন্ন্যাসীর কুটিরে বাস। ইস্কুলে মাষ্টারদেব কাছে আর বাড়ীতে অভিভাবকদেব কাছে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা খেয়ে-খেয়ে বেচারাদেব জীবন-ই যখন বিস্বাদ হয়ে উঠেছিল তখন প্রত্যেক বছব একই ক্লাসে নতুন-নতুন বন্ধুদের আবির্ভাব হতে লাগল দেখে তাদেব সহ্যের বাঁধ একেবারে ভেঙে গেল। তারা বাড়ী থেকে পালিয়ে ঘুবে-ঘুবে এক সন্ন্যাসীর চেলা হয়ে তার কাছে হাত-গোনা শিখতে আরম্ভ কবলে।

দুজনেই এক সঙ্গে বছরেব পর বছব এক ক্লাসে কাটিযে দিয়েছে বটে এবং দুজনেই ছিল বুদ্ধিমান কিন্তু তাদের স্বভাবের কিছু তফাৎ ছিল।

নন্দ ছিল ভারি চঞ্চল। এক কাজে সে বেশীক্ষণ মন বাখতে পারত না। নইলে বুদ্ধিতে তার সঙ্গে পেরে ওটা শক্ত। তার সে-বুদ্ধি যে কত রকমে খেলতো তার ঠিক নেই—যার জন্যে ক্লাসে কোন দিন তুমুল হাসির বোল, কোন দিন কান্নার স্রোত বহে যেত। নন্দব এত বুদ্ধি, কিন্তু ইস্কুলেব পডাব সময়ে সে একেবারে বোকা হয়ে যেত।

কুঞ্জ কিন্তু অন্যরকম। সে ছিল ধীব স্থির। একটা কোন কাজে লেগে গেলে সেটা চট্ করে ছাড়তে চাইত না—যতক্ষণ না তার শেষ হয়। কিন্তু সে ঐ একটি মাত্র কাজ—ইস্কুলের লেখাপড়া ছাড়া। ইস্কুলেব পড়ায সে কিছুমাত্র মন দিতে পারত না। এই খানে নন্দর সঙ্গে তার একটা আশ্চর্য্য মিল ছিল তাই দুই জনে এত বন্ধুত্ব। এবং সেই জন্যে দুই জনে একসঙ্গে বাড়ী ছেড়ে পালাতে পেরেছে।

গনৎকারের কাছে কয়েকদিন গণনা শিখেই নন্দর মতো চঞ্চল ছেলের আর

তাতে মন লাগছিল না। সে কুঞ্জকে বল্লে—"দেখছিস্ ভাই, এই সেই ইস্কুলের আঁক কষা আর জিওগ্রাফির ম্যাপ মুখস্থ করাব মত হয়ে উঠেছে। চল্ অন্য কোথাও যাওয়া যাক্।"

কুঞ্জর কিন্তু মন এতে ভাবি বসে গেছে। সে একটা নতুন রকমের কাজ পেয়েছে—এখন তাকে পায় কে। হাতের অয় বেখার মার-প্যাঁচ ও শনি-মঙ্গলের ছায়ার মধ্যে কতখানি মজা আছে তাই আবিস্কাব কববাব নেশা তাব পূবো মাত্রায় লেগেছে। সে বল্লে—"দূব, এখন যাব কি? রোস্ বিদ্যেটা ভাল করে জেনে নিই।"

নন্দ বল্লে—"আরে আসল জিনিসটা তো শিখেই নিয়েছি, এখন মিথ্যে ঐ গুণ ভাগ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে বেশী কি গুণ বাড়বে?"

কুঞ্জ বল্লে—"এরই মধ্যে কি শিখলি রে?"

নন্দ উত্তর দিলে—"কেন, সবই শিখেছি। গুরু যেটা শেখান সেই-টে শেখাই তো গুরু-মারা-বিদ্যে শেখা। আমি সেই শেখা শিখে নিয়েছি বুঝ্লি।"

কুঞ্জ বল্লে—"তুই হাত গুণতে পারবি?"

নন্দ বল্লে "খুব পারব। শুধু গোণা নয়, কি করে গুণতে হয় তা শুদ্ধ শেখাতে পারি।"

কুঞ্জ বল্লে—"তবে যা। আমি এই গুপ্ত বিদ্যা ভাল করে না দখল করে যাচ্ছিনে।"

নন্দ বল্লে—"ঐ গুপ্ত বিদ্যার গুপ্ত রহস্যটি তুমি এখনো ধরতে পারনি, তাই এত হাঁকু পাঁকু করছ, আমি সেটা শিখে নিয়েছি।"

কুঞ্জ বল্লে—"যা যা, এসব তোর চালাকি। বিদ্যে না শেখবার ফন্দি।"

নন্দ হেসে বল্লে—"ভাই, বেশী বিদ্যে ভাল নয়; বিদ্যের ভারে বুদ্ধি শুদ্ধি সব চাপা পড়ে যায়!"

কুঞ্জ বল্লে—"তোর যেমন কথা।"

নন্দ বল্লে—"আচ্ছা দেখিস্ এই কথাতেই বাজি মাৎ যে বিদ্যে আমার আছে, তাইতেই তোকে হারাব।"

কুঞ্জ বল্লে - "দেখা যাবে।"

নন্দ বল্লে—"আচ্ছা দেখা যাবে।"

এই বলে দুজনের ছাড়াছাড়ি হলো।

* * *

কিছুদিন পরে নন্দ কুঞ্জদের গ্রামে বটতলায় ছাই-ভস্ম মা ওয়ালা এক সাধু এসে উপস্থিত।

নিমু-চাষা বটতলার পাশ দিয়ে মাঠে লাঙল দিতে যা "এ নিমাই ইধার আও।"

নিমাই তো অবাক! তার নাম সাধুবাবা যোগ-বলে আশ্চর্য্যি! নিমাই সাধুর কাছে গেল। সাধু নিমাই-এর পাল্টে বেশ করে দেখে বলে যেতে লাগলেন—তোর ঝগড়াটে বৌ, গাঁয়ের পশ্চিমে ঘর একবার ঘর পুড়ে গিয়েছিল—এম্‌নি সব খুঁটি নাটি ব্যাপার।

নিমাই অবাক হয়ে মনে মনে বললে—' হুবহু মিল!"

নিমাই তখন ব্যস্ত হয়ে তার ভবিষ্যৎ

সাধু বললেন—"বেশ ভালই দেখছি, খারাপ

বাস্, এর বেশী আশ্চর্য্য কথা গনৎকা

সারা গাঁয়ে রটে গেল অদ্ভুত গনৎকার এসে

কাতারে-কাতারে লোক ছুটলো পয়সা-ক

দেখতে-দেখতে গনৎকারের নাম যশ প্র

কিছুদিন পরে কুঞ্জ দেশে ফিরে এলো।

কুঞ্জ যখন তার এতদিন ধরে শেখা অদ্ভু

নে কুঞ্জ চম্‌কে উঠলো।

রে নিজের হাতটা সাধুর

ছেড়ে পালানোর কথা,

একে বলে যেতে

সল কথা বলেন নি,

তুই আকাল কুষ্মাণ্ড।

কাছে গণনা শিখছিস্

তাই সে পালিয়ে এসে

কত মান জানিস্!"

হাসিতে সাধুর মাথার

কটা বেঁধে গেল! তাই দেখে

বড় সাধু, যে তার নাড়ি-নক্ষত্রের

তার কেমন ভয় করতে লাগলো।

পনার বিদ্যেটা শেখাবেন?

! এ বিদ্যে শেখাতে এক মিনিটও

াড়ি ধরে মারলেন এক টান। মাথার

পষ্ট বাংলায় বললেন—"শিখলে তো

পারে নি।"

া ফাঁকির জোরে এত বড় সাধু হয়ে

ঘরবাড়ীর খবর বলে দিব্যি ঠকিয়ে

জানা নেই, শোনা নেই, হঠাৎ সাধুর মুখে নিজের নাম শুনে কুঞ্জ চম্‌কে উঠলো। ভাবলে এ তো সত্যিই গুণী পুরুষ। সে তখন ধীরে ধীরে নিজের হাতটা সাধুর কাছে বাড়িয়ে দিলে।

কুঞ্জর হাত দেখে সাধু তার আগেকার ইস্কুল জীবন, ইস্কুল ছেড়ে পালানোর কথা, গনৎকারের কাছে হাত গোণা শেখার কথা, সব ইতিহাস একে-একে বলে যেতে লাগলেন। কুঞ্জ শুনে শুনে চম্‌কে চম্‌কে উঠতে লাগ্‌লো।

সাধু এ পর্য্যন্ত কারো ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে একটুও অমঙ্গল কথা বলেন নি, কিন্তু কুঞ্জর বেলা ভাঙা চোরা হিন্দি কথায় বলতে লাগলেন—"তুই ত্রকাল কুষ্মাণ্ড। তোর কোন ভাল হবে না!' তারপর বললেন—'তুই যার কাছে গণনা শিখছিস্ সেটা অজবুক্, ভণ্ড তপস্বী!" তোর বন্ধু 'নন্দ'টা বুদ্ধিমান, তাই সে পালিয়ে এসে এখন কেমন দু পয়সা কোরে খাচ্ছে। তার এখন কত যশ, কত মান জানিস্!"

এই বলে সাধু হো-হো করে হেসে উঠলেন। সেই হাসিতে সাধুর মাথার কুণ্ডলী-পাকানো জটা হেলে পড়লো, লম্বা দাঁড়ি খানিকটা বেঁধে গেল! তাই দেখে কুঞ্জর কেমন একটু সন্দেহ হলো। কিন্তু এত বড় সাধু, যে তার নাড়ি-নক্ষত্রের খবর পর্য্যন্ত বলে দিলে তার উপর সন্দেহ করতে তার কেমন ভয় করতে লাগলো। সে হতভম্ব হয়ে বসে রইল!

সাধু বললেন -"কেয়া রে কেয়া ভাব্‌তা?"

কুঞ্জ বললে—"সাধু-মহারাজ, আমাকে আপনার বিদ্যেটা শেখাবেন?'

সাধু বললেন—"এই এখনই! এই মুহূর্ত্তে! এ বিদ্যে শেখাতে এক মিনিটও লাগবে না।"—এই বলে সাধু তাঁর চুল আর দাঁড়ি ধরে মারলেন এক টান। মাথার জটা আর দাড়ি খসে পড়ে গেল। তার পর স্পষ্ট বাংলায় বললেন—"শিখলে তো কুঞ্জ বিদ্যেটা! এ বিদ্যে তোমার গুরু শেখাতে পারে নি।"

কুঞ্জর রাগে গা জলে গেল—আঁ্যা, নন্দটা ফাঁকির জোরে এত বড় সাধু হয়ে পড়েছে। গাঁয়ের চেনা লোকদের ছেলেপিলে ঘরবাড়ীর খবর বলে দিব্যি ঠকিয়ে

পয়সা রোজগার করছে। আর সে এত কষ্ট করে যে বিদ্যে শিখে এলো তার কোন কদর হোল না।

নন্দ বললে—"কি ভাই, এখন হার হলো তো তোমার ?"

কুঞ্জর তখনও রাগ যায় নি, সে বললে—"বোস্, তোর পিণ্ডি চটকাচ্ছি আমি—সব জারি-জুরি ভেঙ্গে দিচ্ছি।"

নন্দ বললে—"কি আর পিণ্ডি চট্‌কাবি আমার। আমি এখন বেপরোয়া। আমার যে মামা আমাকে খেতে দিত, সে মারা গেছে শুনেছিস ত ? এখন তার বিষয় সম্পত্তির মালিক আমি। আর আমার সন্ন্যাসী সাজবার দরকার কি ? তোকে এই হাত দেখা বিদ্যেটা শেখাবার জন্যেই এতদিন অপেক্ষা করে ছিলুম, এইবার তুই এসেছিস, তোকে শেখালুম। এখন আবার আমি যে নন্দ সেই নন্দ।

নন্দকে জব্দ করতে না পেরে কুঞ্জ রাগে ফুলতে লাগলো। নন্দ তার হাত ধরে বললে—"রাগ করিস্‌নি ভাই। এমন তো ইস্কুলে কতদিন তোর সঙ্গে চাতুরী খেলেছি। মনে কর এও সেই রকম একটা খেলা।"

কুঞ্জ বললে—"তুই ষ্টুপিড আগে এ সব ফন্দি বলিসনি কেন ? তাহলে এক সঙ্গে বেশ ব্যবসা চালাতুম।"

নন্দ বন্ধুর হাতখানা টেনে নিয়ে ভালো-কোরো রেখাগুলো দেখে বললে-সে তোর অদৃষ্টে নেই।"

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

এমন কামড় খেলেন যে সর্ব্বাঙ্গ ফুলে ঢোল! না পারেন চল্‌তে, না পারেন বল্‌তে; খেয়ে সুখ নেই, শুয়ে সুখ নেই, কাজে মন দিতে গেলে মাথা ঘোরে: জানোয়ারদের মুল্লুকে রাজকার্য্য অচল হলো। শেয়াল-পণ্ডিত মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। বাঘা-কোটাল, ভালুক-মন্ত্রী এমনি সব রাজ্যের বড় বড় আমির-ওমরা গো-বদ্যিকে ডেকে রাজার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করতে লাগলেন, কিন্তু ঘুঁটে-ভস্ম গোবর-প্রলেপ এ-সবে কিছুই হলো না। তখন বকা-ধার্ম্মিক এসে ভোম্বলদাস মহারাজকে কৈলাস করবার ব্যবস্থা দিলেন। মহারাজও ভাগ্নে সিংহকে রাজ্যের ভার দিয়ে কিছুদিনের জন্যে কৈলাসের দিকে রওনা হতে প্রস্তুত হয়ে বললেন,— "আমি তো চলৎ শক্তি-রহিত, আমাকে কেউ যদি রেখে আসে তো কৈলাসে যাওয়া ঘটে—নচেৎ উপায় নাস্তি!"

বকা ধার্ম্মিককে রাজার সঙ্গে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ দেওয়া হলো। কিন্তু কৈলাসে দুরন্ত শীত, তার উপর সেখানে মাছ খাওয়া নিষেধ, কাজেই বকা পিছলেন। তিনি গেলে পশুদের ধর্ম্ম-কথা শোনায় কে? বাঘা-কোটালেরও ঐ একই কথা। তিনি না থাকলে গৃহস্থের গোরু-জরু সামলায় কে? ভালুক-মন্ত্রী যেতে পারতেন, কিন্তু নতুন রাজা সিংহকে নিয়ে রাজকার্য্য চালাবার জন্যে সদরে থাকা তাঁর বিশেষ দরকার। কাজেই তাঁরও যাওয়া হয় না। শেয়াল পণ্ডিতকে রাজা বললেন— "পণ্ডিত, তুমি কি বল?" পণ্ডিত কি-জানি কি ভেবে বললেন,— "জানোয়ারদের দেশে গায়ের জোরের চর্চ্চাই দেখেছি বেশী, বুদ্ধির চাষ কম, সুতরাং এ রাজ্য থেকে আমি চলে গেলে কোন কাজই আট্‌কাবে না। গর্দ্দভ রইলেন পাঠশালা-গুলোর তদারক করতে। আমি মহারাজকে স্বশরীরে কৈলাসে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

রাজা খুসি হয়ে শেয়ালকে কৈলাস-যাত্রার আয়োজন করতে তখনি হুকুম দিয়ে সভা ভঙ্গ করলেন।

কৈলাসে শীত বিষম, কাজেই রাজ্যের ভেড়া মেরে শেয়াল তাদের ছাল সংগ্রহ করতে লাগলেন; আর পথে খাবার জন্যে ভেড়ার মাংস, ছাগলের মাথাগুলোও বোঝা বাঁধা হলো। এ ছাড়া নানা সুস্বাদ পাখী, খরগোস এমন কি রাজার জন্যে

কচি কচি বাঘ ভাল্লুকের গা থেকে ছাল পর্য্যন্ত ছাড়িয়ে নেওয়া হলো। বকের পালকের বালিস লেপ, তোষক, গণ্ডারের ছালের প্যাঁটরা আর জুতো, মোষের শিঙের ছড়ি, গজদন্তের খড়ম—এমনি নানা সামগ্রী শেয়ালের কাছে দিনে দিনে স্তুপাকার হয়ে উঠলো।

এদিকে জানোয়ারদের ঘরে ঘরে কান্না উঠেছে, কিন্তু রাজার প্রয়োজনে এই সব সংগ্রহ করছেন শেয়াল পণ্ডিত কারো কথাটি বলবার সাধ্য নেই! ভালুক-মন্ত্রী বকা-ধার্ম্মিককে বলে কয়ে যাতে রাজার চট্‌পট্ যাওয়া হয় এমন একটা ভালো দিন পাঁজি পুঁথি দেখে স্থির করতে বলে দিলেন। সাম্‌নে অশ্লেষা-মঘা, সেই দিনই উত্তম বলে ঠিক হলো। প্রজারা সবাই রাজাকে বিদায় দিতে এলো। রাজার কৈলাস-যাত্রার সাজ সরঞ্জাম জুগিয়ে প্রজারা কেউ নুন-ছালের জ্বালায়, কেউ দাঁতের বেদনায়, কেউ বা ছেঁড়া-পালকের শোকে চোখ-মুখ ফুলিয়ে এসেছে দেখে, শেয়াল রাজাকে বুঝিয়ে দিলেন যে প্রজারা তাঁরই বিরহে ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন করছে। ভোম্বলদাস খুসি হয়ে সবাইকে আশীর্ব্বাদ কোরে রওনা হলেন। পিছনে শেয়াল আর তার দলবল রাজ্যের যা কিছু ধন-দৌলত আসবাব পত্র নিয়ে রাজার সঙ্গে কৈলাস করতে চল্লো।

এদিকে গ্রামে গ্রামে ঘাটিতে-ঘাটিতে খবর এসেছে ভোম্বলদাস কৈলাস চলেছেন। সবাই রাজা দেখতে পথের দুই ধারে ভিড় লাগিয়েছে। ভোম্বলদাস রয়েছেন রাম-ছাগলের চামড়ার কম্বলে ঢাকা ডুলির মধ্যে। আর শেয়াল চলেছেন আগে আগে বুক ফুলিয়ে। পাড়া গেঁয়ে জানোয়ার তারা কোনো দিন রাজাকে চোখে দেখেনি, শেয়ালকেই রাজা ভেবে তারা দুহাতে সেলাম দিতে লাগলো; সঙ্গের ডুলিতে কম্বল মুড়ি দেওয়া ভোম্বলদাসকে তারা ভাবলে রাণী!

সুন্দরবনের সিংহগড় থেকে শেয়াল পণ্ডিতের বাড়ি জম্বুকগড় হলো তিন হপ্তার পথ; আর কৈলাশ হলো তিন মাসেরও বেশী রাস্তা। বুড়ো ভোম্বলদাসের সঙ্গে দেশ ছেড়ে এতটা যাওয়া শেয়ালের আদপেই ইচ্ছা ছিল না। সে যত শীঘ্র পারে বুড়ো রাজার সঙ্গে তাঁর ধন দৌলত নিজের ঘরে এনে ফেলবার মতলবে আছে।

এদিকে কিন্তু ডুলির মধ্যে ঝাঁকানি খেতে খেতে রাজার প্রাণান্ত হবার জোগাড় হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা ঘাটিতে ঘাটিতে জিরিয়ে যাওয়া। যেখানে ভালো গ্রাম দেখেন সেইখানেই রাজা বলেন —"ওহে পণ্ডিত জায়গাটা তো ভালো বোধ হচ্ছে। দু-এক দিন এখানে থেকে গেলে হয় না ?"

শেয়াল অমনি বলে ওঠে—"না মহারাজ, এখানে থাকা চলবে না, এটা হলো মশা ভনভনানিব দেশ ! রাত্রে নিদ্রা মোটেই হবে না—এগিয়ে চলুন।"

আরো কতদূর গিয়ে রাজা বলেন —"ওহে এ স্থানটা কেমন ?"

"মহারাজ, এটা, হাড়মড়মড়ি সহর ! এক ঘণ্টা এখানে কাটালেই বাতে ধরবে !"

"ওহে পণ্ডিত এ জায়গাটা ?"

"সর্ব্বনাশ ! এটা পিঁপড়ে-কাঁদা গ্রাম। এখানে থাকা হতেই পারে না —না খেয়ে প্রাণ যাবে !"

এই ভাবে রাজাকে কখনো ভয় দেখিয়ে কখনো মিষ্টি কথায় তুষ্ট কোরে শেয়াল দিনরাত চলে এক হপ্তায় তিন হপ্তার পথ নিজের আড্ডায় এসে হাজির। কিন্তু শেয়ালের গর্ত্তে তো সিংহের মামা প্রবেশ করতে পারেন না, কাজেই বাইরে গাছ তলায় তাঁকে শোয়ানো হলো ; ধন দৌলত সমস্তই শেয়ালেব গর্ত্তে গিয়ে পৌঁছলো।

রাজা ডুলি থেকে কষ্টে মাটিতে নেমে বলেন —"ওহে পণ্ডিত, কৈলাস আর কত দূর ?"

"কাছে মহারাজ ! ঐ যে কৈলাসের চূড়ো দেখা যায় !" রাজাকে কিছু দূরে একটা উই-ঢিবি দেখিয়ে দিলেন।

রাজা খুসি হয়ে বললেন—"তাহ'লে এই গাছ তলায় দিন কতক আরাম করা যাক ! একটু সুস্থ হয়ে পাহাড়ে ওঠা যাবে।"

শেয়াল বললে—"মহারাজ, এই খানে বসে কিছুদিন তপস্যা করেন ; পশুপতির কৃপায় দুদিনেই রোগের শান্তি হবে।" এই বোলে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে শেয়াল নিজের গড়ে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছায়া-বিচার

গাঁয়ের মধ্যে ভটচাজ্ মশায়ের মত এমন চমৎকার লোক বোধ হয় আর দুটি নেই। তিনি যখন প্রাতঃকালে স্নান-আহ্নিক সেরে, তাঁর কালো-কোলো নাদুস্-নুদুস্ গায়ের উপর একটি শাদা ধব্-ধবে পৈতে ফেলে চণ্ডী-মণ্ডপে চণ্ডী পাঠ করতেন, তখন গাঁয়ের চাষাভূষো—সেই পথে যাওয়া-আসা করবার সময় তাঁকে বোধ হয় দেবতা মনে করেই গড় হয়ে প্রণাম করে যেত ; ভটচাজ্ মশায় আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতেন আর মিটি-মিটি হাসতেন। গ্রামের সবাইকে তিনি ভালো বাসতেন, গ্রামের সকলেও তাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। এমন হয়ে পড়ছিল যে তাঁকে নইলে কারো যেন চলত না। কেউ যদি কোন মুস্কিলে পড়তো সে অমনি ভটচাজ্ মশায়ের কাছে ছুটে আসতো, তিনি পাঁজি-পুঁথি, শাস্তর-তন্তর খুলে তার মুস্কিল আসান করে দিতেন। ঝগড়া হলে তিনি মিটমাট করে দিতেন, রোগ হলে তিনিই মন্ত্র পড়ে আরাম করাতেন। তিনি একাধারে—মোড়ল, ডাক্তার বদ্যি, রোজা, পণ্ডিত—সব !

সেদিন ভটচাজ্ স্নান-আহ্নিক সেরে সবেমাত্র চণ্ডীপাঠ করতে সুরু করেছেন, এমন সময় নিতাই কৈবর্ত্ত এসে 'ঢিপ্' করে তাঁর পায়ের ধূলে নিয়ে আকাশের দিকে একবার চোখ তুলে বল্লে—"বাবা! আমার দিকে কাল রাতে "ওনারা" একটু নজর করেছিলেন! ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করি—কি হবে আমার !"

ভট্চাজ্ পুঁতি থেকে মুখ তুলে বললেন—"কি হলো আবার তোর ?"

নিতাই ফ্যাল-ফ্যাল কোরে চেয়ে বললে—"আজ্ঞে ঠাকুর, কি হলো তাতো কিছুই জানি না!"

ভটচাজ্ হেসে বললেন—"জানিস না কিরে! তবে কি বলতে এসেছিস্ তুই ?"

নিতাই বল্লে—"আজ্ঞে, বলছিলুম তুমি একটা উপায় করে দাও।"

"কিসের উপায় রে ?"

"আজ্ঞে, 'ওনারা' যাতে আর আমার দিকে কিপা-দিষ্টি না করেন।"

ভটচাজ্ একটু বিরক্ত হয়ে বললেন—"ওনারা কারা ?"

"আজ্ঞে, তাঁদের নাম করব—এই ভর সন্ধ্যে-বেলা ?"

ভটচাজ্ বললেন—"তোর কোন ভয় নেই, তুই নাম কর্।"

নিতাই বললে - "তবে নাম করি ? কিন্তু আমার কোন দোষ নেই দাদাঠাকুর !"

ভটচাজ্ তাকে অভয় দিলেন। নিতাই তখন বললে—"আজ্ঞে, আপনারা ম'নে যা হ'ন তেনারাই কাল রাত্রে আমার সঙ্গে একটু পরিহাস্য করেছিলেন !" বলেই নিতাই আকাশে একটা নমস্কার ঠুকলে।

নিতাইয়ের কথা ভটচাজ ঠিক বুঝতে পারছিলেন না ; তার পাশে একজন ছোকরা শিষ্য দাঁড়িয়ে ছিল, সে বললে—"ও বুঝেছি, নিতাই ব্রহ্মদৈত্যের কথা বলেছে !"
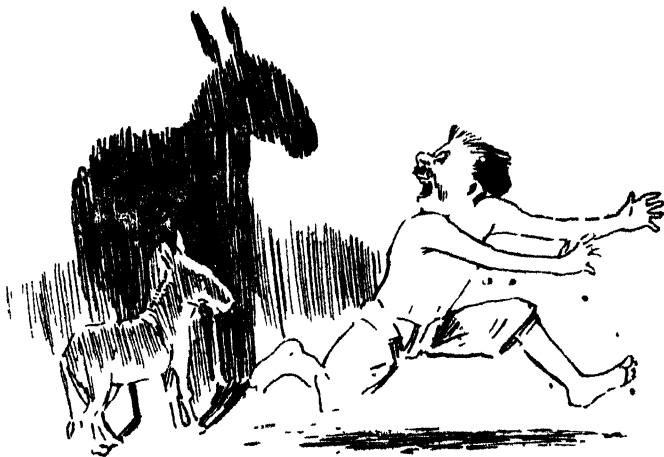
নিতাই এক গাল হেসে বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ কর্ত্তা !"

ভটচাজ্ বললেন,—"ও, তুই কাল ভূত দেখেছিস্ ? কি রকম শুনি।"

নিতাই উৎসাহ পেয়ে বলে যেতে লাগল—"জানেন তো কর্ত্তা, আজকাল কাজের বড় টানাটানি। কাল সেই সকাল বেলা দুটি ভিজে চাল চিবিয়ে মাঠে

জ গিয়েছিলুম সারাদিন আর ফুরসৎ পাইনি, এদিকে রাত হয়ে এল, আমি সেদিনের কাজ সেরে বাড়ী মুখো হলুম। পূবদিকে ঝোপ্-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে তখন উঁকি দিচ্ছে—ঠিক আমার হাতের কাস্তেটির মত—”

ভটচাজ্ বললেন—“তারপর ?”

নিতাই বললে—“তারপর কর্ত্তা, বলতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে—পিছনে শুনি বিকট শব্দ—ধপ ধপ্ ধপ্ ধপ। মনে হলো কে যেন আমার পিছু নিয়েছে। ভাবলুম একবার পিছন ফিরে দেখি কে ? কিন্তু ভয়ে পিছনে চাইতে পারলুম না। সামনেও এগোতে পারলুম না—দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলুম। সত্যি বলছি ঠাকুর, যে নাম করলে বেম্ভাণ্ডের বেম্মদত্যি পালায় সেই রাম নামই ভুলে গেলুম। ঐ ওনাদেরই মায়ায় !”

ভটচাজ্ বললেন—“তারপর ?”

নিতাই বললে—“তারপর ঠাকুরদাদা, আমার চৈতন্য হলো। নিজের ঘাড়টায় হাত দিয়ে দেখলুম যেমন ঘাড় তেমনি আস্ত আছে। পিছনে আর সেই বিকট ধপ্ ধপ্ শব্দ হচ্ছে না। মনে একটু সাহস করে পিছন দিকে মিটিমিটি চেয়ে দেখলুম—ওরে বাপরে।’

ভটচাজ্ বললেন—“কি দেখলিরে নিতাই ? কি দেখলি ?”

নিতাই বললে—“ওরে বাপরে। যা দেখলুম তা বললে না পেত্যয় যাবে কর্ত্তা ! সেই অন্ধকারে দেখলুম দুটো ভাঁটার মত চোখ জ্বল্-জ্বল্ করে জ্বলছে—আগুনের চকির মতো ঘুরছে।”

ভটচাজ্ জিজ্ঞেস করলেন—“কিন্তু কি করে বুঝলি যে সেটা ব্রহ্ম-দৈত্য ?”

নিতাই বললে—“আজ্ঞে, যে দেখলুম আপনার ঐ দেহের মত কালো কুচ্‌কুচে নধর গা, আপনার ঐ পেতের মতন গলায় এক-গাছা মোটা দড়ি ! ঠিক যেন ব্রাহ্মণ ঠাকুরটি !”

ভটচাজ্ হেসে বললেন—“তা বেশ, কিন্তু কি করে বুঝলি সেটা ভূত—আর কিছু নয় ?”

নিতাই বললে—"আজ্ঞে ভূত না হলে কুলোর মতন অমন লম্বা-লম্বা কান কার হবে ?"

ভটচাজ্ আরো হেসে বললে—"তা বটে ! তারপর কি হলো, শুনি !"

নিতাই বললে— 'তারপব আর কি কর্ত্তা ! তার দিকে ফিরে চাইতেই সে ল্যাজ তুলে ছুটে পালালো—দেখতে-দেখতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আমি এক ছুটে বাড়ি পালিয়ে এলুম। দাদা-ঠাকুর সবতো শুনলে, এখন একটা উপায় করে দাও। আমায় ঐ পথ দিয়ে রোজ আসতে-যেতে হয়—কোন দিন কি হবে শেষে!" বলে নিতাই গল-বস্ত্র হয়ে দাঁড়ালো।

ভটচাজ্ খানিক্ চিন্তা কোরে গম্ভীব ভাবে বললেন—"ওরে নিতাই, তোর কোন ভয় নেই। ও ভূত নয়।"

"তবে ও কি কর্ত্তা ?"

"ও তোব ভ্রম !"

'-ভ্রম কি কর্ত্তা ?"

"অমন হয়, বুঝলি রে ! নিজের ছায়াতে অনেকে অমন ভূত দেখে—আমি ঢের শুনেছি। শাস্ত্রে বলে রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হয়—তোর তাই হয়েছে—ছায়াতে কায়া-ভ্রম হয়েছে !"

নিতাই বললে—"তা নিশ্চয়। শাস্ত্র যখন বলছে তখন কি ভুল হবার যো আছে।"

কিন্তু তবুও মন থেকে তার ভূতের ভয় গেল না।

ভটচাজ্ বললেন—"অমন করে দাঁড়িয়ে রইলি যে ?"

নিতাই বললে—"কর্ত্তা, একটা তাবিজ পোরলে হয় না ?"

ভটচাজ আর-একটু ভেবে নিয়ে বললেন—"কোনো দরকার নেই।"

নিতাই বললে—"একটা মাদুলি ?"

—"কি দরকার ?"

—"কি জানি আবার যদি উৎপাত করে।"

ভটচাজ্ বললেন,—"আমি বলছি—তোর কোন ভয়্ নেই।"

নিতাই মুখ কাঁচুমাচু করে বললে—"তবে কাল রাতে যা দেখেছি—"

ভটচাজ্ বাধা দিয়ে বললেন—"সে তোর নিজেরই ছায়া!"

নিতাই জিভ্ কেটে বললে—"অমন কথা বোলো না ঠাকুর! আপনারা বেরাম্ভণ পণ্ডিত থাকতে, তেনাদের সঙ্গে আমার মতো গরীব গেরস্তর তুলনা?—এতে আমার অকল্যাণ হবে।"

ভটচাজ্ জোর গলায় বললেন—"হ্যা সে তোরই ছায়া!"

নিতাই কাঁদ কাঁদ সুরে বললে—"কিন্তু আমার ছায়া কি অমনিতর?'

ভটচাজ্ এক ধমক দিয়ে বললেন—''অমনিতর নয়তো আবার কি! তোর ছায়া ভূতের মতন্ হবে, না তো কি রাজ-পুত্তুরের মতন হবে?''

নিতাই আমতা-আমতা সুরে বললে,—''তা বটে! কিন্তু ঠাকুর আমার যে এখনো পেত্যয় হচ্ছে না। আমি ঠিক দেখেছি—আপনার মতন কালো কুচকুচে নধর দেহ—আপনার ঐ পৈতের মতন এক গাছা দড়ি গলায়—সে তো কৈবর্ত্তর চেহারা নয়।''

ভটচাজ্ রেগে বললেন—"না তো কি, সে ব্রহ্মদৈত্যের চেহারা না কি? সে মূর্ত্তি দেখলে তুই দাঁত কপাটি খেয়ে পড়ে যেতিস্ না! তুই ব্যাটা শূদ্র হযে যে সজ্ঞানে দাঁড়িয়েছিলি, এইতেই প্রমাণ হচ্ছে যা দেখেছিস তা আসল জিনিষ নয় মেকি—ছায়া মাত্র।

নিতাই ধমক খেয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বললে—''তাই হবে কর্ত্তা!" কিন্তু তখনও তার ধাঁধা কাটলো না। সে ছোটবার সময় না হয় ছায়াটাও ছুটেছে, কিন্তু ঐ যে ল্যাজ তুলে ছুটে গেল—সেটা কি? তার নিজের তো ল্যাজ নেই। এটা ঠাকুরকে বলবে কিনা ভাবছে, এমন সময় বিশু ধোবা ছুটে এসে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে—"কর্ত্তা, সর্ব্বনাশ হয়েছে! কাল রাত থেকে আমার গাধাটা কোথায় গেছে খুঁজে পাচ্ছিনা। কি হবে ঠাকুর! আমার বড় আদরের গাধা—কি হবে ঠাকুর!"

শুনেই ভটচাজ্ নিতাইয়ের দিকে চেয়ে একবার মাথা চুলকোলেন। তারপর গাধার বিচার সুরু হলো।

শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

জলার পেত্নী

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অপূর্ব্বর কথা

অতি অল্প দিনের মধ্যেই বাবা মা তুজনেই মারা গেলেন। এত বড় পৃথিবীটার মধ্যে আমার আপনার বলতে কেউ নেই। বিশ্বে আমি একা! চোখের সামনে দেখি, লোকে ভাই, বোন, মা, বাবা সকলকে নিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছে; তাদের দেখি আর ভাবি, যদি আমার ছোট্ট একটি ভাই কি বোন থাক্‌ত! বাংলা দেশের কোথায় কালীগ্রাম, আর কোথায় এই আগ্রা শহর। মার মুখে শুনেছি সেখানে নাকি আমাদের দেশ। কিন্তু সেখানে আমার কে আছে বা না আছে তাও জানি না। আজ যদি সেখানে ফিরে যাই তা হোলে তারা হয়ত আমাকে চিনতেও পারবে না। এখানে আমাকে চিরদিন একাই দিন কাটাতে হবে।

নানারকম ভেবে-চিন্তে চাকরী ছেড়ে দিলুম। কি হবে চাকরী কোরে! বাবা আমার জন্য সামান্য যা কিছু রেখে গেছেন তাতে আমার বেশ সুখেই চলে যাবে! সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি বাড়ী বসে থাকি, তারপরে তাজমহলের একটি কোনে গিয়ে বসি। বড় নির্জ্জন সেই জায়গাটি, আমার বড় ভাল লাগে।

এমনি কোরেই আমার দিন কেটে যাচ্ছিল এমন সময় একদিন একখানা ইংরেজী খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে এটর্নী জন্‌সন্ কোম্পানীর বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়্‌ল।

বিজ্ঞাপন দেখেই মনে হোলো এরা নিশ্চয় আমারই খোঁজ করছে। মার মুখে শুনেছিলুম যে, বাবা ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে ঝগড়া কোরে চলে এসেছিলেন, আর সেই থেকে তাঁর সঙ্গে দেশের সমস্ত সম্বন্ধ চুকে গিয়েছিল।

সেই দিনই জন্‌সন কোম্পানীকে একখানা চিঠি লিখে দিলুম। দিন সাতেক পরেই তাদের কাছ থেকে জবাব এল। তারা লিখেছে -- তুমি যে হরিনারায়ণ চৌধুরীর ছেলে তা যদি প্রমাণ করতে পার তা হোলে এ জমিদারী তুমিই পাবে। সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে অবিলম্বে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।

তাইতো এখন কি করি ? আমি যে হরিনারায়ণ চৌধুরীর ছেলে সে কথা এদের কাছে প্রমাণ করি কি কোরে ! অনেক ভেবে শেষকালে বাবা যে আপিসে চাকরী করতেন সেই আপিসের সাহেবদের গিয়ে ধরলুম। তারা বল্লে—এ আর এমনি শক্ত কথা কি ? তুমি এক কাজ কর। তোমার বাবা আগ্রায় যে বাড়ী তৈরি করেছিলেন এবং ব্যাঙ্কে যে টাকা রেখে গিয়েছেন তুমি তো সে সবের মালিক হয়েছ।

আমি বল্লুম—তা তো হয়েছি।

তারা বল্লে—বেশ ! এ সব বিষয় পাবার সময় তুমি আদালতে দরখাস্ত করেছিলে তো ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা তারা তোমাকে হরিনারায়ণের ছেলে বলেই তোমার হাতে তার বিষয় দিয়েছে তো !

—তা তো দিয়েছে !

—ব্যস্। তা হোলেই হোলো। তুমি সেই সরকারী চিঠিগুলো নিয়ে যাও। আর তাদের বলো গিয়ে এর চেয়ে বেশী প্রমান যদি চাও তো আগ্রার আদালতে খোঁজ নাও গিয়ে।

সেখান থেকে চলে এসে যতদূর সম্ভব প্রমাণ জোগাড় কোরে তো কলকাতায় চলে এলুম। পরের দিন জন্সন কোম্পানীর সাহেবের সঙ্গে দেখা কোরে তাকে সব কথা খুলে বল্লুম। সাহেবটী অতি ভদ্রলোক। সে আমায় খুব খাতির কোরে বসিয়ে অনেক প্রশ্ন করলে। তারপরে বল্লে—আচ্ছা বাবু, তুমি পনেরো দিন পরে এস। ইতিমধ্যে আমরা খোঁজ খবর নিয়ে দেখি।

দু সপ্তাহ পরে আবার একদিন জনসন কোম্পানীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সে দিন তারা আমায় প্রথম দিনের চাইতে বেশী খাতির করতে লাগল। বড় সাহেব এসে আমাকে জানালেন যে, তাঁরা আগ্রায় আমার সম্বন্ধে খোঁজ নেবার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন। আমিই যে হরিনারায়ণের ছেলে এবং বিষয়ের প্রকৃত অধিকারী

সে বিষয়ে আর তাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সেদিন তাঁরা আমায় খুব আদর আপ্যায়িত কোরে বিদায় করলে। তারপরে প্রায় তিনমাস ধরে আদালতে ছোটাছুটি করার পর বিষয় সম্পূর্ণরূপে আমার হাতে এল।

আমার পূর্ব্বপুরুষের জমিদারী আমার হাতে এল। বিষয় হাতে আসবার আগে আমি স্বপ্নেও ভাবি-নি যে এতবড় সম্পত্তির একমাত্র মালিক আমি। কিন্তু এই এত বড় সম্পত্তি, এত টাকা কড়ি সুখ ও সৌভাগ্যের মধ্যে জন্মে আমার বাবা কেন বাড়ী থেকে চলে গিয়ে দীন ভিখিরীর মত জীবন কাটিয়েছিলেন তার কারণ বুঝতে পারলুম না। দেশ থেকে আমাদের দেওয়ান চিঠি লিখলেন আমি যেন অবিলম্বে কালীগ্রামে যাই, কিন্তু কি জানি কেন সেখানে যেতে আমার মন ধরছিল না। কিন্তু তবুও যেতে হোলো। দেওয়ানজীকে কিছু না জানিয়েই একদিন কালীগ্রামে যাত্রা করা গেল।

ট্রেনের একটি কামরায় আমি একলা বসে আছি। দু পাশে মাঠ, সবুজ শস্যে ভরা—যতদূর চোখ যায় সমতল ভূমি। বাংলা মায়ের এই শ্যাম-শোভার কথা চিরদিন বাবা ও মায়ের মুখে শুনেছি। দেশের কথা বলতে-বলতে তাঁদের চোখ জলে ভরে উঠ্‌ত। আমি বাঙালীর ছেলে হোলেও বাংলা দেশ আমার মাতৃভূমি হোলেও এতদিন সে দেশ আমি দেখি-নি, তাই বাবা মায়ের সে দুঃখ এতদিন আমি বুঝতে পারতুম না। আজ তাঁদের সেই মুখ মনে পড়ে মনে হোতে লাগ্‌ল যে, এই বিশাল সম্পত্তির বদলে একবার যদি তাঁদের ফিরে পেতুম! কিন্তু তা হবার উপায় নেই!

এক রাত্রি ও এক দিন ট্রেনে ও ষ্টিমারে কেটে যাওয়ার পরদিন সন্ধ্যার সময় আমি কালীগ্রামে গিয়ে পৌঁছলুম। কলকাতা থেকে বেরুবার সময় কারুকে জানাই-নি বলে আমার জন্য ষ্টেশনে কোনো লোক ছিল না, আমার পূর্ব্বপুরুষের লীলাভূমিতে, নিতান্ত অপরিচিতের মতন এসে দাঁড়ালুম। ষ্টেশনে জিজ্ঞাসা করলুম—কালীগ্রামের বাবুদের বাড়ী কোথায়?

তারা বলে দিলে—এখান থেকে মাইল চারেক দূরে হবে।

ধীরে ধীরে বড় রাস্তা দিয়ে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চল্লুম। গ্রামের চার দিকের দৃশ্যে আমার মন ভুলে গেল। চারিদিকে নীল পাহাড়ের শ্রেণী নীল আকাশের বুক ফুড়ে উঠেছে। সূর্য্য তখন অস্ত যাচ্ছিল, অস্তোন্মুখ সূর্য্যের সোণালী ছটা একটা পাহাড়ের মাথায় পড়ে সেটা এত ঝকঝক্ করছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন সেটা মাথায় সোণার মুকুট পরে বর সেজে দাঁড়িয়ে আছে।

চারিদিকের এই প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখ্তে-দেখতে এগিয়ে চলেছি। ক্রমে সূর্য্য ডুবে গেল, পথ আঁধার হোলো। আর কিছু দেখা যায় না। আর কতদূরে গেলে বাড়ী পৌঁছব তাও জানি না, এমন সময় কিছুদূরে রাস্তার ধারে একখানা বাড়ীতে আলো দেখে আমি সেই বাড়ীতে দরজা নাড়া দিলুম।

একটু পরেই একটি সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাই?

আমি তাঁকে বল্লুম—আমি বিদেশী পথিক, অনেক দূর যাব। অন্ধকারে পথ চিনতে পারছি না, আজকের রাত্রির মতন এখানে একটু আশ্রয় পেতে পারি কি?

ভদ্রলোক কোনো কথা না বলে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। বোধ হয় আমার মুখে হিন্দী-সুরে বাংলা কথা শুনে আর এই লম্বা-চওড়া চেহারা দেখে তাঁর মনে সন্দেহ হচ্ছিল যে, বোধ হয় লোকটা বিশেষ সুবিধার নয়।

আমি আবার বল্লুম - দেখুন আমি ভদ্রলোকের ছেলে, বিশেষ বিপদে পড়েছি। আমি চোর কিংবা —

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি আমার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠলেন - না না কি আশ্চর্য্যি! আপনি আসুন, সচ্ছন্দে আমার এখানে থাকুন। তাই তো কি আশ্চর্য্যি!

ভদ্রলোক তো আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসবার ঘরে বসালেন। সুন্দর সাজান ছোট্ট ঘরখানি! ঘরের চারদিকে আলমারী ভর্ত্তি থাকে-থাকে সব বই সাজান রয়েছে। আমি আসবার আগে পর্য্যন্ত বোধ হয় তিনি বই পড়ছিলেন। তিনি চেয়ারে বসে বইখানা বন্ধ কোরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

আমি নাম বল্লুম। তিনি শুনে বল্লেন—আমার নাম সদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই গ্রামেই আমার বাড়ী। তবে চাকরীর জন্য আমি প্রায় ত্রিশ বছর বি কাটিয়ে বছর পাঁচেক হোলো এইখানে এসে বাস করছি।

আমি জিজ্ঞাসা না করতেই ভদ্রলোক গড়্‌গড়্‌ কোরে তাঁর নিজের কাহিনী যেতে লাগ্‌লেন আর আমি চুপ কোরে বসে তাঁর কথা শুনে যেতে লাগ কথা বলতে-বলতে একবার হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন—তাই তো কি আশ্চর্য্যি! আমি নিজের কথাই বলে যাচ্ছি। আপনি কোথায় যাবেন সে কথা তো জিজ্ঞাসা করা হয়-নি। কি আশ্চর্য্যি!

আমি বল্লুম—আমি এখানকার চৌধুরী-বাড়ীতে যাব। সে এখান থেকে কতদূর ?

সদাশিব বল্লেন—কি আশ্চর্য্যি! আপনি চৌধুরী বাড়ী যাবেন? সে তো কাছেই এখান থেকে আধ মাইলও নয়। সেখানে কার কাছে যাবেন ?

আমি বল্লুম—সেই খানেই আমার বাড়ী। আমি হরিনারায়ণ চৌধুরীর ছেলে, এখানে এই নতুন এসেছি—

আমার কথা শুনে সদাশিব বাবু একেবারে লাফিয়ে উঠে বল্লেন—আরে তুমি হরিনারায়ণের ছেলে! কি আশ্চর্য্যি, তোমায় এতক্ষণ চিন্‌তে পারি নি! কি আশ্চর্য্যি! আরে হরিনারায়ণ, জয়নারায়ণ এরা দুই ভাই আমার বাল্যবন্ধু! হরি যখন বাপের সঙ্গে ঝগড়া কোরে বাড়ী থেকে চলে যায় তখন আমি বিদেশে চাকরী করি। যাবার সময় আমার সঙ্গে তার আর দেখা হোলো না! আরে আমি থাকলে কি সে যেতে পারত! আরে তুমি তার ছেলে! তোমাকে এতক্ষণ চিনতে পারি-নি, কি আশ্চর্য্যি!

আমি বল্লুম—এতে আর কি হয়েছে। আমাকে তো আপনি আগে দেখেন-নি ?

সদাশিব মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে আমার কথা শুনতে লাগলেন। তারপর ডাক দিলেন—অনু—অনু মা—

তখুনি ঘরের মধ্যে একটি পনেরো ষোল বছরের মেয়ে এসে দাঁড়াল। সদাশিব তাকে বললেন—অণু এই দেখ অপূর্ব্ব এসেছে। অপূর্ব্বকে চিনতে পারছ না—

আশ্চর্য্যি! ও আমার বাল্যবন্ধু হরিনারায়ণের ছেলে। ঐ যে তোমার দৃশ্যে ায়ণ কাকা ছিলেন তাঁরই বড় ভাইয়ের ছেলে!

বুক দাশিবের কথা শুনে মেয়েটি হাসতে-হাসতে বল্লে—কেমন কোরে চিন্‌ব একা? ওঁকে তো আগে কখনো দেখি-নি।

মেয়ের কথা শুনে সদাশিবও হেসে উঠলেন—তিনি বল্লেন—তাই তো, তুমি কি কোরেই বা চিন্‌বে? কি আশ্চর্য্যি! ওকে যে কখনো দেখি-নি সে কথা আমার মনেও ছিল না।

অনু আমাকে ছোট একটি নমস্কার কোরে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি বুঝি আজই এসেছেন?

আমি বললুম—হ্যাঁ এখুনি এসেছি, এখনও বাড়ী যাইনি।

সদাশিব বল্লেন, আরে বাড়ী যাবে কি? আজ এখানে থাক, কি আশ্চর্য্যি।

অনু খাবার যোগাড় কর, -হরিনারায়ণের ছেলে তুমি কি আশ্চর্য্যি!

অনু চলে গেল। সদাশিব বলতে লাগলেন—আমার দুটি মেয়ে বাবা। বড়টার নাম মনু, বছর চারেক হোলো তার বিয়ে হোয়ে গেছে, আর ছোট এই অনু। ওদের মা নেই, মনুর বিয়ের বছরখানেক আগে তিনি মারা গেছেন। তিনি মারা যেতেই চাকরী-বাকরী ছেড়ে পেন্সন নিয়ে এসেছি। এখন অনুর এক জায়গায় বিয়ে দিতে পারলেই হয়।

সদাশিব আমার বাবা ও মার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা আর এই পৃথিবীতে নেই জেনে অনেক দুঃখ করতে লাগলেন। অনু এসে একবার চা দিয়ে গেল। চা খাওয়ার পর আমাদের আবার গল্প চল্‌ল। রাত্রি প্রায় দশটার সময় অনু এসে বল্লে —খাবার তৈরি হয়েছে। সদাশিববাবু আমাকে খাবার জায়গায় নিয়ে গেলেন। খাওয়া দাওয়ার পর সে রাত্রির মতন সেইখানেই শুয়ে রইলুম।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

ডেম্প্‌সির প্রস্থান ও টুনির প্রবেশ

গোড়ার কথা

এতদিন পরে জ্যাক ডেম্প্‌সির পতন হ'ল। ডেম্প্‌সির কথা "মৌচাকে" তোমরা অনেকবার পড়েছ। সে একজন পৃথিবীবিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা। আজ আট বৎসরের মধ্যে কেউ তাকে হারাতে পারে নি। ঘুসি লড়ে এত টাকা রোজগার করাও আর কারুর ভাগ্যে ঘ'টে ওঠে নি। কিন্তু এইবারে টুনি নামে এক মুষ্টি-যোদ্ধার কাছে তার দর্প চূর্ণ হয়েছে।

টুনির সঙ্গে ডেম্প্‌সির এই ঘুসির লড়াই দেখবার জন্যে খেলার মাঠে কত লোক জড়ো হয়েছিল জানো?—এক লক্ষ ত্রিশ হাজার! টিকিট বিক্রী হয়েছিল প্রায় ষাট কি সত্তর লাখ টাকার! সুতরাং ঘুসির লড়াই দেখবার সখ যে ওদেশে কতখানি তা বুঝতে পারছ তো?
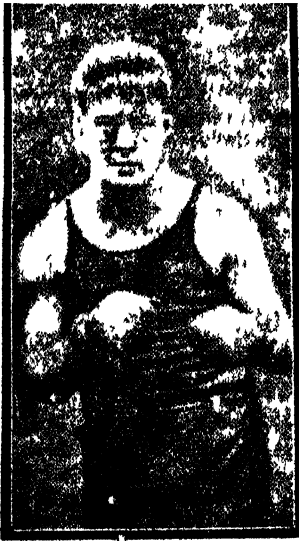
মুষ্টিযোদ্ধা টুনি

ডেম্প্‌সি যে খালি ঘুসির জোরেই এতদিন অদ্বিতীয় হয়ে ছিল, এটা কিন্তু মনে কোরো না। যার কাছে হারবার ভয়, তার সঙ্গে সহজে সে লড়তে রাজি হ'ত না। আমেরিকায় হ্যারি উইল্‌স্ ব'লে আর মুষ্টিযোদ্ধা আছে। সে কাফ্রি। আজ পর্য্যন্ত প্রায় সত্তরটা যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। কোন বড় পালোয়ানই তার সুমুখে দাঁড়াতে পারে নি। ডেম্প্‌সিকে সে বার বার যুদ্ধে আহ্বান করেছে। ডেম্প্‌সি কিন্তু তার ভয়ে ডাকে সাড়া দেয় নি! সাহেবরাও এ যুদ্ধে ডেম্প্‌সিকে তেমন উৎসাহিত করে নি এবং তার কারণও আর কিছু নয়,—কি জানি বাবা, শেষটা কালা

আদমির কাছে সাদা-চামড়া সত্যিই যদি হেরে যায়! একবার কাফ্রি জ্যাক জনসনের কাছে সাহেবদের যে মার খেতে হয়েছিল, তারা তা কখনো ভুলবে না!

অন্যান্য বড় পালোয়ানের কাছেও ডেম্প্‌সি এমন অসম্ভব টাকা চেয়ে বসত যে, পাকে-প্রকারে লড়াই করা আর ঘটে উঠত না। এই ভাবে আজ আট বৎসর সে পালোয়ানদের রাজা হয়ে ছিল। তার অন্যায় ব্যবহারের জন্যে সাহেবরা পর্য্যন্ত তাকে ভু-চোখে দেখতে পারত না। কিন্তু এত ক'রেও ডেম্প্‌সি আর মান বাঁচাতে পারলে না —তার মাথা থেকে আজ গৌরবের মুকুট খ'সে পড়েছে।

দুই যোদ্ধার পরিচয়

কাফ্রি জনসনকে আট বৎসরের মধ্যে হারাতে না পেরে সাহেবরা যখন ক্ষেপে গিয়ে বললে, "জনসন, তুমি যদি এখনো হার না মানো, তা'হলে আমরা তোমাকে খুন ক'রে ফেলব।"—জনসন-বেচারা তখন প্রাণের দায়ে জেস্ উইলার্ড নামে এক দ্বিতীয় শ্রেণীর যোদ্ধার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল। জনসনের যুদ্ধের গল্প "মৌচাকে" আমি আগেই বলেছি।

ঐ উইলার্ডকে মাত্র তিন মণ্ডলের মধ্যে হারিয়ে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জ্যাক ডেম্প্‌সি "পৃথিবীবিজয়ী" উপাধি লাভ করে।

অবশ্য, ডেম্প্‌সি যে একজন উঁচু-দরের মুষ্টিযোদ্ধা, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। কারণ পৃথিবী-বিজয়ী ব'লে পরিচিত হবার আগে সে বাহান্নোটি বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল, এবং হেরেছিল মাত্র তিনটি যুদ্ধে। উইলার্ডকে হারাবার পরেও সে সাতবার লড়াই করেছে, কিন্তু একবারও হারে নি। গানবোট স্মিথ, জিম ফ্লিন, ফ্রেড ফুলটন, ব্যাট্‌লিং লেভিনস্কি, বিলি মিস্ক্, জর্জ্জেস্ কার্পেনটিয়ার, টমি গিবন্‌স্ ও লুইস ফার্পোর মতন পৃথিবীবিজয়ী পালোয়ানও তার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। ডেম্প্‌সির ঘুসির জোর ছিল এতই বেশী যে, প্রায় কেউই তার সামনে দুই তিন চার মণ্ডলও দাঁড়াতে পারত না! কিন্তু "পৃথিবী-বিজয়ী" খেতাব পাবার পর থেকেই প্রচুর অর্থের দাবি ক'রে সে আর কারুর সঙ্গে সহজে লড়তে

রাজি হ'ত না এমন কি, গত প্রায় তিন বৎসরের মধ্যে একবারও সে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নি! ঘোড়াকে যেমন বসিয়ে রাখলে অকেজো হয়ে যায়, পালোয়ানদের পক্ষেও আলস্য তেমনি মারাত্মক। পায়া ভারি ক'রে ব'সে থেকে ডেম্পসি আজ নিজের সর্ব্বনাশকে নিজেই ডেকে এনেছে।

ডেম্প্‌সির বড় বড় রোজগারের একটা হিসাব দিচ্ছি।

উইলার্ডের সঙ্গে যুদ্ধে ডেম্প্‌সি পেয়েছিল কিছু বেশী বিরাশি হাজার টাকা। মিস্কের সঙ্গে যুদ্ধে, কিছু বেশী এক লাখ পঁইষট্টি হাজার টাকা। কার্পেনটিয়ারের সঙ্গে যুদ্ধে, কিছু-বেশী নয় লাখ টাকা। ফাপোর সঙ্গে যুদ্ধে, কিছু-বেশী পনেরো লাখ টাকা। বর্ত্তমান যুদ্ধে, পঁচিশ লাখ টাকার চেয়েও বেশী।

অথচ তাকে হারিয়েও টুনি পেয়েছে কিছু বেশী ছয় লাখ টাকা মাত্র!

এ-ছাড়া অন্যান্য প্রায় সত্তর-আশীটা যুদ্ধেও ডেম্প্‌সি অনেক্ লাখ টাকা পেয়েছে। এক বায়োস্কোপেই নিজের যুদ্ধের ছবি প্রকাশ করতে দিয়ে সে আজ পর্য্যন্ত যে কত লক্ষ টাকা পেয়েছে, তার আর হিসাব নেই। মোট কথা, মুষ্টিযোদ্ধা ডেম্প্‌সি যে আজ কোটি টাকার মালিক, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়!

ডেম্প্‌সি আমেরিকান হ'লেও জাতে স্কচ আইরিস। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে জুন তারিখে তার জন্ম—অর্থাৎ তার বয়স এখন বত্রিশ চলছে। মাথায় সে ছয় ফুট দেড় ইঞ্চি উঁচু। দেহের ওজন দুই মণ পনেরো সের।

টুনির নাম কিছু দিন আগেও আমেরিকার বাইরে কেউ জানত না। কিন্তু স্বদেশে সে অল্প-বিস্তর নাম কিনে ছিল। ডেম্প্‌সির সঙ্গে লড়ায়ের আগে সে একচল্লিশটি যুদ্ধে জয়লাভ ক'রেছিল এবং হেরে ছিল মাত্র একবার। আজ পর্য্যন্ত ঘুসি মেরে কেউ তাকে অজ্ঞান করতে পারে নি, মুষ্টিযোদ্ধার পক্ষে এ একটা মস্ত গৌরবের কথা।

ব্যাট্‌লিং লেভিন্‌স্কিকে হারিয়ে আগে সে আমেরিকার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, "লাইট হেভি-ওয়েট" যোদ্ধা ব'লে গণ্য হয়েছিল। তারপর হ্যারি গ্রেবের কাছে টুনির প্রথম ও শেষ হার হয়। ঐ হ্যারি গ্রেব তার কাছে পরে-পরে দুই দুইবার হার মানে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সে বিখ্যাত কার্পেনটিয়ারকে পরাজিত ক'রে নামজাদা হয়ে ওঠে।

তারপর এই বৎসরেই টুনির হাতে আর এক বিখ্যাত যোদ্ধা টমি গিবন্স্ পরাজিত হয়েছে। ডেম্প্‌সির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তিন বৎসর আগে একমাত্র এই গিবন্সই সুদীর্ঘ পনেরো মণ্ডল লড়াই ক'রেও ঘুসি খেয়ে অজ্ঞান হয়-নি। টুনি কিন্তু তাকেও অজ্ঞান ক'রে ফেলতে পেরেছিল।

কাজেই সকলেই বুঝলে যে ডেম্প্‌সিকে যদি কেউ হারাতে পারে, তবে তা এই টুনিই পারবে। তখন ডেম্প্‌সির সঙ্গে টুনির যুদ্ধের ব্যবস্থা হ'ল।

টুনির জন্ম নিউ ইয়র্ক সহরে, ১৮৯৮ অব্দের ২৫শে মে তারিখে,—অর্থাৎ আটাশ উৎরে সবে সে ঊনত্রিশে পা দিয়েছে। তার মাথার উচ্চতা সাড়ে ছয় ফুট। দেহের ওজন দুই মণ আড়াই সেরের কিছু বেশী।

ডেম্প্‌সি লড়াই সুরু করে ১৯১৫ অব্দে। টুনির যোদ্ধা জীবন আরম্ভ হয় ১৯১৯ অব্দ থেকে—অর্থাৎ ডেম্প্‌সি যে বৎসরে "পৃথিবী-বিজয়ী' উপাধিতে ভূষিত হয়।

যুদ্ধ

আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া সহরে ১৯২৬ অব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বরে এই স্মরণীয় যুদ্ধ হয়।

খোলা মাঠের ভিতরে এই মুষ্টিযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। দর্শকদের সমস্ত আসনই পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বিদেশ থেকে এত বেশী লোক যুদ্ধ দেখতে এসেছিল যে, সহরের মধ্যে স্থানাভাব ঘটেছিল। লড়ায়ের সময় থেকেই বাদল নেমেছিল, কিন্তু বৃষ্টির মধ্যেই লড়াই আরম্ভ ও শেষ হয়।

যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে ইংলণ্ডের বেতার যন্ত্রের সংযোগ ক'রে দেওয়া হয়। ফলে আটলাণ্টিক মহাসাগরের ওপারে হাজার হাজার মাইল দূরবর্ত্তী লণ্ডন সহরে বসেও অনেকে বেতার যন্ত্রে কাণ পেতে উন্মত্ত দর্শকের চীৎকার ও ঘুসি মারার শব্দ পর্য্যন্ত শুনতে পেয়েছিল! এমন কি প্রায় লড়ায়ের সঙ্গে সঙ্গেই লণ্ডনের একখানি সান্ধ্য সংবাদপত্রে যুদ্ধের দৃশ্য বেতার আলোক-চিত্রের দৌলতে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল!

ডেম্প্‌সি ও টুনি রণক্ষেত্রে এসে দাঁড়াবামাত্র সেই এক লক্ষ ত্রিশহাজার দর্শক একসঙ্গে জয়ধ্বনি ক'রে উঠল।

প্রথম মণ্ডলেই ডেম্প্‌সি বেগে টুনিকে আক্রমণ করলে এবং টুনিও হাত দিয়ে ডেম্প্‌সিকে জড়িয়ে ধরলে, তারপর গোটা কতক শক্ত ঘুসির আদান-প্রদান হ'ল। টুনি ডেম্প্‌সির মাথায় দুই হাতেই সজোরে এমন কয়েকটা ঘুসি বসিয়ে দিলে যে, ডেম্প্‌সি দড়ির বেড়ার উপরে কাবু হয়ে প'ড়ে গেল। এই বিষম মারের ধাক্কা ডেম্প্‌সি শেষ পর্যন্ত আর ভালো ক'রে সামলাতে পারে নি। যদি প্রথম মণ্ডল শেষ হবার ঘণ্টা না বেজে উঠত, তাহ'লে এইখানেই ডেম্প্‌সিকে অজ্ঞান হয়ে পড়তে হ'ত।

দ্বিতীয় মণ্ডলে ডেম্প্‌সি নিজেকে কতকটা সামলে নিলে বটে, কিন্তু টুনির কাছ থেকে তাকেই মার খেতে হ'ল বেশী।

ইতিমধ্যে টুনিও বেশ বুঝে নিলে যে, ডেম্প্‌সিকে আর ভয় করবার কোন দরকার নেই। তখন সেও দরাজ বুকে লড়তে সুরু করলে। ডেম্প্‌সিও ভীষণ বিক্রমে লড়াই করতে লাগল এবং টুনিকে একটা অজ্ঞান-করা ঘুসি মারবার সুযোগ খুঁজতে লাগল, কিন্তু তৃতীয় মণ্ডলে টুনির মুখে রক্তপাত করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলে না। টুনিকে সে একবার ঘুসি মেরে প্রায় দড়ির বেড়ার উপরে ফেলেও দিয়েছিল, টুনি কিন্তু বিশেষ কৌশলে তাল সামলে ডেম্প্‌সিকেই উল্টে বেড়ার উপরে নিয়ে গিয়ে ফেললে। এইভাবে ষষ্ঠ মণ্ডল শেষ হ'লে সকলেই বুঝতে পারলে যে, ডেম্প্‌সির চেয়ে টুনি সর্বদিকেই শ্রেষ্ঠ।

পরের মণ্ডলে ডেম্প্‌সি প্রাণপণে লড়াই ক'রে টুনিকে গোটাকয়েক দারুণ ঘুসি মারলে বটে, কিন্তু টুনির কবলে তার নিজের অবস্থাই হয়ে উঠল অধিকতর শোচনীয়। ডেম্প্‌সির পা তখন কাঁপছিল এবং মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠছিল।

দশম মণ্ডলে সকলেই দেখলে, ডেম্প্‌সির মুখের উপরে পরাজয়ের ছায়া এসে পড়েছে! ডেম্প্‌সি পাগলের মতন টুনিকে আক্রমণ ক'রে প্রবল বেগে মুষ্টি বৃষ্টি করতে পারল বটে, কিন্তু টুনির ঘুসিতে তার ডান চোখ তখন একেবারে মুদে গে

এবং বাম চোখও বন্ধ হয়ে যাবার মত হয়েছে। ডেম্প্সির বাম চোখ ও দেহের উপরে টুনি দুটো কঠিন ও যাতনাদায়ক ঘুষি মারবার পর দশম মণ্ডল সমাপ্ত হ'ল।

মধ্যস্থ ঘোষণা করলেন, এ যুদ্ধে টুনিরই জিৎ। চারিদিক থেকে নূতন পৃথিবী বিজয়ী বীরের নামে সুগম্ভীর সাগর-গর্জ্জনের মত জয়ধ্বনির পর জয়ধ্বনি উঠতে লাগল।

আর এক মণ্ডল লড়াই চললেই ডেম্প্সিকে জ্ঞান হারাতে হ'ত—কারণ ইতিমধ্যেই সে এমন কাবু হয়ে পড়েছিল যে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেই পারছিল না, তার দুই চোখ প্রায় অন্ধ এবং ক্ষতবিক্ষত মুখের অবস্থা এমন ভয়ানক যে, দেখলে আতঙ্ক হয়!

যুদ্ধের পরে

নিজের পরাজয়ের ঘোষণা শুনেই ডেম্প্সি তাড়াতাড়ি উঠে সাদরে টুনির গলা জড়িয়ে ধরলে এবং করমর্দ্দন করে তাকে সংবর্দ্ধনা করলে। রণক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে ডেম্প্সি বললে, "এ সেই একই পুরোনো গল্প, শ্রেষ্ঠের জয় হল।"

সকলের সামনে ডেম্প্সি কোনরকমে নিজেকে সামলে রেখেছিল, কিন্তু হোটেলে নিজের ঘরে ঢুকে সে একেবারে ভেঙে পড়ল এবং শিশুর মতন কাঁদতে লাগল। আজ তার গৌরব-মুকুট অন্যের মস্তকে,—দীর্ঘ আট বৎসরের সিংহাসনে আজ আর তার কোন অধিকার নেই।

ডেম্প্সি নিবেদন জানিয়েছে, টুনির সঙ্গে সে আর একবার লড়াই করতে চায়। টুনির ম্যানেজার উত্তরে বলেছেন, টুনি ফের লড়তে রাজি আছে, তবে এই যুদ্ধে ডেম্প্সি যত টাকা নিয়েছে, তার এক পয়সা কম হলে সে লড়াই করবে না।

হয়তো আবার লড়াই হবে। এর মধ্যেই বিলাত থেকে সেজন্যে আমন্ত্রণ এসেছে। দেখা যাক, ডেম্প্সি তার নষ্ট-সম্মান আবার ফিরিয়ে আনতে পারে কি না।

আজ পর্য্যন্ত "পৃথিবী-বিজয়ী" উপাধি যাঁরা পেয়েছেন, তাদের নামের তালিকাও এখানে দেওয়া গেল।—

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার জন হিনানকে হারিয়ে ইংলণ্ডের কিং সর্ব্বপ্রথমে শুং উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৯ অব্দে কিলারিনকে হারিয়ে জে, এল, সলিভান, সংর উপাধির দাবি করেন। তাঁর দাবি অনেকে মানেন, অনেকে মানেন ১৮৯২

অব্দে সলিভানকে হারিয়ে জেম্‌স্‌ কর্বেট ঐ উপাধি পান। ১৮৯৭ অব্দে কর্বেটকে হারিয়ে বব ফিয্‌সিমন্স ঐ উপাধি পান। ১৮৯৯ অব্দে ফিয্‌সিমন্সকে হারিয়ে জেমস জেফরিস্‌ ঐ উপাধি পান। ১৯০৫ অব্দে অপরাজিত জেফ্‌রিস রণক্ষেত্র ছেড়ে সসম্মানে বিদায় নিলে, মারভিন হার্টকে হারিয়ে টমি বার্ন্‌স ঐ উপাধি পান। ১৯০৮ অব্দে বার্নসকে হারিয়ে জ্যাক জন্‌সন ঐ উপাধি পান। ১৯১০ অব্দে অপরাজিত 'পৃথিবী বিজয়ী' জেফ্‌রিস আবার রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে জনসনের নিকটে পরাজিত হন। এইসময়ে নিয়ম হয় 'পৃথিবী বিজয়ের' প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণাঙ্গ আর অবতীর্ণ হতে পারবে না। কাজেই এই সময়ে য়ুরোপ-বিখ্যাত কার্পেনটিয়ার, আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা গানবোট স্মিথকে ১৯১৪ অব্দে হারিয়ে ঐ উপাধির দাবি করেন। ১৯১৫ অব্দে মিথ্যা যুদ্ধে জনসনকে হারিয়ে জেস উইলার্ড ঐ উপাধি পান। ১৯১৯ অব্দে উইলার্ডকে হারিয়ে জ্যাক ডেম্প্‌সি ঐ উপাধি পান। ১৯২৬ অব্দে ডেম্প্‌সিকে হারিয়ে টুনি ঐ উপাধি পেয়েছেন।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

কাব্য-লেখা

ভাবছ বুঝি কাব্য লেখা মস্তবড় শক্ত কিছু ?
পা তুলে সে হাঁটার মতো মাথাটারে কোরে নীচু।
মোটেই তাহা নয়কো। আমি চুপে চুপে বলে রাখি
অতিই সহজ কাব্য সেটা ব্যাধের যেমন ধরে পাখী।
 কবি আমি দেখেছি ঢের, কেমন কোরে লেখে তারা
 তাও দেখেছি দু চোখ ভরে গাঁথে সকল মালার ধারা।
 ত্রৈরাশিকের অঙ্ক যেমন তেমনতর কঠিন বুঝি ?
 খেলার বাঁশী খোকার যেমন ভাবের বাঁশী কবির পুঁজি।
ছন্দ আছে স্বাকার কবি—নয়কো শুধু কবির লেখায়।—
বন্ধু, তোমার কান্না-হাসি দোলে নানান ছন্দ-দোলায়।
মিলের পরে মিলটি যেমন দিলের পরে দিলটি লাগে।
খেলাঘরের মেলায় যখন বন্ধু তোমার মিলন মাগে।
 এই নিয়ে তো কাব্য লেখা ? কবির কিবা বাহাদুরি ?
 আজ সে বড় মহামান্য, তোমার ঘরে কোরে চুরি !

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

৭ম বর্ষ] অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ [অষ্টম সংখ্যা

শিশির

অমল-ধবল-স্ফটিক-বিন্দু !
শ্যামল-আকাশে তরল-ইন্দু !
আঁধার করিয়া ক্ষীরোদ-সিন্ধু
এলে কি শিশির উঠিয়া ?

এলে শরতের শূন্য-কক্ষে—
বেদনার ফুল ধরণী-বক্ষে !
বিদায়-অশ্রু ফুটিলে চক্ষে
নিশির মরম টুটিয়া !

এলে তৃণে-তৃণে চমকি' দীপিকা !
নব-হেমন্তে' হিমানীর টিকা
তরুপল্লবে ওগো তরলিকা,
দিয়েছ যে তুমি আঁকিয়া ।

তুমি পরায়েছ মুকুতার সাজ !
সবুজে দিয়েছ মণিময় তাজ !
সোণালা ধানের শিষ্‌গুলি আজ
উঠেছে গরবে বাঁকিয়া !

বনস্পতির ললাটের পাতে
তুমি কি গো টিপ্‌ যমুনার হাতে ?
জোনাকী-প্রদীপ দীপালার রাতে
নেবে'নি কি আজও প্রভাতে ?

নৃত্য-চপল চরণ-লীলার —
দোদুল-দোলায় ছিঁড়ে গিয়ে কার
গজ-মতি-মালা নীবি, মেখলার,
মুকুতা খসেছে সভাতে ?

কোন্ অপ্সরী কোজাগরী রাতে
জোছনা-মত্তা কানন-সভাতে
নেচে গিয়েছে গো বনরাজ সাথে
বাহু-বেষ্টনে জড়ায়ে—

উষার আভাসে শিহরিয়া উঠে
চকিত-চরণে পলাইতে ছুটে,
তারই নূপুরের ঘুঙুর কি টুটে
পড়েছে এমন ছড়া'য়ে ?

সারা নিশি জাগি আকাশের পথে
কোটি তারকার আঁখি-তারা হ'তে
অগণিত এ কি প'ড়েছে মরতে
জ্যোতির বিন্দু ঝরিয়া ?

এ কি ধরণীর বক্ষ টুটিয়া
আনন্দ-রস মর্ম্ম-লুটিয়া
কোটি বুদ্বুদে উঠেছে ফুটিয়া
নিখিল-বিশ্ব ভরিয়া ?
চন্দ্রলোকের সুর-সভাতলে
সুধাকর যেথা সুধাপানে টলে,
তারই কি শিথিল করে—পলে-পলে
অমৃত-পাত্র নড়িয়া—
উছলি' উথলি' সারানিশি ধ'রে
আকাশের তলে বারে বারে ঝরে
আজি কি সকল ভুবনের পরে
শিশির-কণা এ পড়িয়া ?

শ্রীনরেন্দ্র দেব

জলার পেত্নী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অপূর্ব্বর কথা

পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে কিছু জলযোগ কোরে সদাশিব বাবুর সঙ্গে চৌধুরী বাড়ীতে চললুম। আমাদের বেশীক্ষণ হাঁটতে হোলো না। কিছুদূর গিয়েই সদাশিব বাবু বললেন— ঐ দেখ' তোমাদের বাড়ী। আমি চেয়ে দেখলুম দূরে একখানা প্রকাণ্ড থামওয়ালা বাড়ী দেখা যাচ্ছে। আগ্রা, দিল্লী ও পশ্চিমের আরও অনেক জায়গায় নবাব বাদশাদের বড় বড় পাথরের প্রসাদ দেখেছি কিন্তু

এ বাড়ী সে রকমের নয়। এত মোটা আর উঁচু গোল গোল থাম সেখানে কোথাও দেখি-নি। জলার সামনে একটা উঁচু জায়গার ওপরে বাড়ীখানা তৈরি করা হয়েছে। সকাল বেলাকার সূর্য্যের কিরণ বাড়ীটার ওপর এসে পড়ায় দূর থেকে সেটা ঝক্-ঝক্ করছিল। এমন সুন্দর বাড়ী আমার, এ কথা মনে হোয়ে মনটা একবার আনন্দে ও গর্ব্বে ফুলে উঠ্‌ল। কিন্তু তখুনি মনে হোলো, এ সময়ে যদি বাবা ও মা বেঁচে থাকতেন! অমনি আমার সমস্ত আনন্দ নিমেষের মধ্যে দুঃখে পরিণত হোলো।

একটু পরেই বাড়ীর সামনে এসে পৌঁছলুম। প্রকাণ্ড সিংহ-দরজা পেরিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলুম। সদাশিব বাবু আমাদের দেওয়ান মশায়কে ডেকে পাঠালেন। জমিদার এসেছে শুনে বৃদ্ধ দেওয়ান দীননাথ চাটুয্যে ছুটতে ছুটতে এসে হাতজোড় কোরে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন! চাটুয্যে মশায় আমার ঠাকুরদার আমলের কর্ম্মচারী, তাঁর মতন পাকা লোক আমাদের জমিদারীতে একটিও ছিল না। আমাকে পেয়ে ভদ্রলোক একেবারে আনন্দে আটখানা হোয়ে উঠলেন। দেখতে দেখতে গ্রামময় রাষ্ট্র হোয়ে গেল যে জমিদার এসেছে। গ্রামের লোকেরা দলে দলে আমাকে দেখতে আসতে লাগ্‌ল।

দেওয়ান মশায় আমাকে নিয়ে বাড়ীর সমস্ত জায়গা দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন। পুরোনো ধরণের বাড়ী, এক একটা ঘর তেমনি উঁচু। ঘরের দেওয়ালে আমার পূর্ব্ব পুরুষের ছবি টাঙান। একটা ঘরের দেওয়ালে খালি অস্ত্র সাজান। সে যে কত রকমের অস্ত্র তার ঠিকানা নাই। শোবার মহলে প্রত্যেক ঘরে বড় বড় খাট বিছানা পাতা। বাড়ীতে শোবার লোক একজনও নেই কিন্তু বিছানা যে কত তার আর ঠিকানা নেই। বাড়ী থেকে খানিকটা দূরে, বাড়ীর হাতার মধ্যেই জেলখানার মতন একটা বাড়ী, সেটা হচ্ছে কয়েদ ঘর। সেখানে বিদ্রোহী কিম্বা দুষ্টু প্রজাদের ধরে এনে বন্ধ কোরে রাখা হয়। আর এক দিকে প্রকাণ্ড কাছারী বাড়ী। সেখানে জমিদারী দপ্তরের সমস্ত কাজ হয়! দেওয়ান মশায় প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে আমাকে বাড়ী দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালেন।

বেলা যখন প্রায় বারোটা তখন সদাশিব বাবু আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমিও ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত হোয়ে পড়েছিলুম তাই তখনকার মতন ঘোরা বন্ধ কোরে স্নানাহার সেরে বিশ্রাম করা গেল।

বিকেল বেলা দেওয়ানজী আমাকে কাছারী বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে সন্ধ্যে অবধি বসে আমাকে জমিদারী চালানো সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। সন্ধ্যের পর কাছারী বাড়ী থেকে ফিরে এসে আমরা বৈঠকখানায় বসলুম, দেওয়ানজী আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। তিনি এই বাড়ীরই এক কোণে কয়েক খানা ঘরে থাকেন। সংসারে স্ত্রী ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই, একটি ছেলে ছিল সে অনেক দিন হোলো মারা গেছে! এই সব দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে রাত হোয়ে গেল। সেদিকার মত খাওয়া-দাওয়া শেষ কোরে আমি ঘুমোতে গেলুম।

বিছানায় শুয়ে কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। একে নতুন জায়গা তার ওপরে অত বড় ঘরে শোয়া আমার কোনো কালে অভ্যাস ছিল না। গা-টা কি রকম ছম্ ছম্ করতে লাগল। ঘুম না হোলেই যত রকম ভাবনা এসে জুটতে থাকে। আমার মগজে নানা রকমের ভয় আর ভাবনা তালগোল পাকিয়ে লাফালাফি করতে সুরু কোরে দিলে। ভাবনাগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু ঘুম কি ছাই আসে! সেগুলো যেন আমায় পেয়ে বসেছিল, কিছুতেই ছাড়তে চায় না। একটা যায়, ঠিক তার পেছনে পেছনে আর একটা ভাবনা এসে জোটে। শেষকালে আর উপায় না দেখে আমি উঠে বসলুম। ঘরের এক কোনে 'গোটা' চারেক আলমারী বোঝাই বই ছিল, সেখান থেকে একখানা বই নিয়ে রাত্রিটা কাটিয়ে দেব মনে কোরে বাতি জ্বাললুম। বাতি নিয়ে ধীরে ধীরে আলমারীর দিকে এগিয়ে চলেছি এমন সময় খট্ কোরে কিসের একটা শব্দ শুনে আমি চমকে দাঁড়ালুম। একবার যেন মনে হোলো আমার ঘরের পাশের বারান্দা দিয়ে কে যেন পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছে। মনের মধ্যে ভয় ও সন্দেহের জোটপাক লেগে গেল। তাড়াতাড়ি হাতের বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে বারান্দার দিকের একটা দরজার কাছে এসে দাঁড়ান গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলুম, কিন্তু কৈ! আর কোথাও

কিছু শব্দ নেই! হয়ত কি শুনতে কি শুনেছি মনে কোরে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে বিছানার দিকে অগ্রসর হচ্ছি এমন সময় আবার সেই শব্দ! আমি পা টিপে-টিপে আবার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। এবার বেশ মনে হোলো কে একজন দরজার কাছ দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। আমি অতি সন্তর্পণে জানলার ঝিলমিলির একটা পাখা তুলে স্পষ্ট দেখলুম একজন লোক বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেল।

সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে নেয়ে উঠ্‌ল। কে এই লোক! কিসের জন্য এত রাত্রে সে আমার ঘরের কাছে ঘোরাফেরা করছে? একবার মনে হোলো লোকটা নিশ্চয় চুরি করতে এসেছে! কিন্তু ভেবে দেখলুম যে, চুরি করতে এলে সে এদিকে আস্‌ত না। কারণ সকলেই জানে যে টাকা কড়ি যা কিছু তা সবই কাছারী বাড়ীতে থাকে। নানা রকম চিন্তায় মাথা গরম হোয়ে উঠতে লাগ্‌ল। ঘরের একটা দেওয়ালে দুটো বড় টাঙ্গি ও একটা ঢাল সাজান ছিল, তাড়াতাড়ি একটা টাঙ্গি নামিয়ে নিয়ে আবার সেই ঝিলিমিলির কাছে এসে দাঁড়ালুম। বোধ হয় মিনিট দুই তিন পরে দেখা গেল আবার একজন সন্তর্পণে বারান্দা দিয়ে সামনের দিকে চলে গেল। এবার যে গেল সে পুরুষ নয় স্ত্রীলোক। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত রহস্যময় বলে বোধ হোতে লাগ্‌ল। আমি সেইখানে টাঙ্গি হাতে নিয়ে স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যখন আর কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না তখন আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লুম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম কি কোরে এ রহস্য ভেদ করা যায়? এখানে আমার এমন কে বন্ধু আছে যার কাছে এ কথা প্রকাশ করি; অনেক চিন্তার পর স্থির করা গেল যে আরও দু'এক দিন না দেখে এ সম্বন্ধে কিছু করা হবে না। টাঙ্গিটা মাথার কাছে রেখে ঘুমোবার চেষ্টায় মন দিলুম।

সারারাত্রি জেগে থাকায় ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। দেওয়ানজী আমাকে তুলে দিলে। বিছানায় অত বড় একটা টাঙি দেখে তিনি আশ্চর্য্য হোয়ে

আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাঁকে কারণ বল্লাতে তিনি আমার চেয়েও বেশী আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তিনি বল্‌লেন—আজ পঞ্চাশ বছর এই বাড়ীতে বাস করছি কিন্তু চোর ডাকাত কিংবা অন্য কিছু দেখি-নি। তবে লোকে বলে যে, এই সামনের জলাতে একটা পেত্নী থাকে। আপনার কাকা একবার তাকে দেখেছিলেন, কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত ও সব কিছুই দেখি নি।

একে তো কাল রাত্রে ঐ সব দেখেছি তার ওপরে আবার পেত্নীর কথা শুনে আমার রক্ত একেবারে জল হোয়ে গেল। কিন্তু পাঁছে দেওয়ানজী কিছু মনে করেন এই জন্য তাঁকে কিছু বল্লুম না। মুখ ধুয়ে কাছারীতে গিয়ে বসা গেল। সকাল বেলা কাছারীতে কাটিয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে দুপুর বেলা বেশ এক ঘুম দিলুম। বিকেল বেলা ঘুম থেকে উঠে সদাশিব বাবুর বাড়ী গেলুম। সদাশিব বাবু বাড়ী ছিলেন না। অনু আমাকে নিয়ে গিয়ে তাদের বৈঠকখানাতে বসালে। অনুকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—সদাশিব বাবু কোথায় গিয়েছেন?

অনু বল্‌লে—তিনি স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—স্বামিজী! তিনি আবার কে?

অণু বল্‌লে—তিনি একজন সন্ন্যাসী। ঐ জলার মধ্যে থাকেন।

আমরা কথাবার্ত্তা বল্‌ছি এমন সময় সদাশিব বাবু এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে সেখানে দেখে বলে উঠলেন—এই যে অপূর্ব্ব, কি আশ্চর্য্য! তুমি এখানে, আর আমি তোমার বাড়ীতে গিয়েছিলুম কি আশ্চর্য্য!

আমি সদাশিব বাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম—কেন?

তিনি বল্‌লেন—আরে, স্বামিজী যে তোমায় দেখতে চেয়েছেন! তাঁকে তোমার কথা আজ বললুম কিনা।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম—স্বামিজীর কথাই এতক্ষণ হচ্ছিল। কে তিনি?

সদাশিব বাবু বললেন—স্বামিজীকে চেন না! কি আশ্চর্য্য! তিনি একজন মস্ত সাধু লোক, নাম হরিহরানন্দ স্বামী। তোমাদের ঐ জলায় থাকেন।

আমি বললুম—জলার মধ্যে কি থাকবার জায়গা আছে নাকি?

সদাশিব বাবু বললেন—কি আশ্চর্য্য! তা জান না বুঝি? ওখানে অনেক পোড়ো ঘর আছে তারই একটা পরিষ্কার কোরে নিয়ে স্বামিজী থাকেন। তোমার কাকা স্বামিজীকে তোমাদের বাড়ীতে এসে থাকতে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু তিনি চান-নি।

স্বামিজীর বিষয়ে সদাশিব বাবু আরও অনেক কথা বললেন। তিনি নাকি অনেক রকমের অলৌকিক কাণ্ড করেন। এমন কি মরা লোক পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আমি পশ্চিমে অনেক সন্ন্যাসী দেখেছি, তাদের অধিকাংশই ভণ্ড। সেইজন্য সাধু সন্ন্যাসীদের উপর আমার খুব বিশ্বাস ছিল না। তবুও সদাশিব বাবুর অনুরোধে একবার এই সন্ন্যাসীর কাছে যাব বলে কথা দিলুম! গল্প করতে করতে সন্ধ্যা উৎরে গেল। সেদিনকার মত সদাশিব বাবুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলুম।

বাড়ীর দিকে চলেছি। রাস্তায় একটি লোক নেই। একপাশে সেই জলা আর এক পাশে ধানের ক্ষেত, এরই মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছি। কত রকমের চিন্তা মনের মধ্যে উদয় হচ্ছে তার ঠিকানা নাই। এমন সময় একটা বিরাট গর্জ্জন শুনে চমকে উঠলুম! কিসের এই গর্জ্জন! জলার মধ্যে কি বাঘ ভাল্লুক থাকে নাকি? মনের মধ্যে কি রকম ভয় ভয় করতে লাগল। কয়েক পা যেতে না যেতে আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে আবার সেই গর্জ্জন! এবার যেন আওয়াজটা অনেক কাছে বলে মনে হোলো। সেখানে আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয় মনে কোরে বাড়ীর দিকে দৌড় দিলুম। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

আলিপুরের চিড়িয়াখানা

তোমাদের মধ্যে যারা কলকাতায় থাকো বা কখনো কলকাতায় বেড়াতে এসেছো, তারা নিশ্চয়ই আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখেছ। যারা দেখেছ তারা যে আমোদ পেয়েছ খুবই, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। এক সঙ্গে সারা পৃথিবীর এত জন্তু-জানোয়ার পাখী মাছ সাপ প্রভৃতি দেখা একটা ভাগ্যের কথা। নগদ চারটি পয়সা দর্শনী দিয়ে আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখে অনেকে শুধু মজাই পায়, কিন্তু এ কথা কজন বোঝে যে চার পয়সায় এত বেশী মজার সঙ্গে কত শিক্ষাও এতে হয়।

এই চিড়িয়াখানাটি প্রথম তৈরী হয় ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে। সে আজ প্রায় ষাট বৎসরের কথা। গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগে এবং পয়সায় এর সৃষ্টি; সাধারণ ভদ্রলোকও এ ব্যাপারে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছিলেন এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড এর দ্বার উন্মোচন করেন। সপ্তম এডোয়ার্ড তখন ছিলেন প্রিন্স অফ্ ওয়েল্স্। তাঁর মা মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তখন ভারত-সম্রাজ্ঞী। সাধারণের জন্য এ চিড়িয়াখানার দ্বার প্রথম খোলা হয় ঐ বছরেরই ১লা মে তারিখে। বাঙলার ছোটলাট তখন স্যর রিচার্ড টেম্পল্। এ ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগ-যত্নও বড় সামান্য ছিল না। এ চিড়িয়াখানার নাম Alipore Zoological Gardens. আমরা কেউ বলি 'জু', কেউ বলি চিড়িয়াখানা; অবার কেউবা বলে, আলিপুরের বাগান।

চিড়িয়াখানা খোলার উদ্দেশ্য সকলকে আমোদ আর শিক্ষা দেওয়া। প্রকাণ্ড একখানি গ্রামের মত বিস্তীর্ণ জায়গা, চারিধার রেলিঙে বেড়ায় ঘেরা—মধ্যে বিস্তর বাগান, দীঘি, ঘর-বাড়ী, তার মধ্যে কত দেশ-বিদেশের পশু-পাখী সরীসৃপ বাস করছে। কোথায় সেই আফ্রিকা আমেরিকা, অথচ সে সব দেশের জন্তু জানোয়ার এখানে দেখবো এ কথা কে ভেবেছিল! তার উপর শিক্ষা নানা জীবজন্তুর চেহারা স্বভাব—এ সবও তো চিড়িয়াখানায় এসে শেখা যায়। প্রাণিতত্ত্ব শেখার-দিকে যাদের সখ, বই পড়ে সে সখ কি তেমন মেটানো যায়—যেমন যায় এই সব

প্রাণীদের স্বচক্ষে দেখে। তার উপর এমন জন্তু-জানোয়ারও পৃথিবীতে আছে যারা খুব শীতের দেশেই বাস করে—গরম হাওয়ায় যারা বাঁচতে পারে না, বা বাঁচাবার চেষ্টা করলেও তারা কাহিল হয়ে পড়ে। এখানে তাদের এই আব-হাওয়ায় কেমন সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, দেখে তা কি তারিফ করার বস্তু নয়! তবে সব পশুকেও যে বাঁচাতে পারা গেছে তা বলা যায় না। সাদা ভালুক—তারা থাকে সেই মেরুপ্রদেশে। সেখানকার শীতের নাম শুনলেই হাত-পা হিম হয়ে আসে! সেই সাদা ভালুককে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় বহুবার আনা হয়েছে—কিন্তু কোনো বারেই বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখা যায়নি। তার পরে, Sea-lion—এই সেদিনের কথা। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় এনে রাখা হয়েছিল। তাদের কি যত্ন-পরিচর্য্যাই কম হতো। পুরী থেকে সমুদ্রের মাছ এনে তাদের খাওয়ানো হতো,—তবু বাঁচানো গেল না।

এ ব্যাপারে টাকাও কি কম খরচ হয়! এই খাওয়ার ব্যাপার—কার ধাতে কি খোরাক সয় তা দেখে ব্যবস্থা—তাছাড়া এদের তদ্বির তদারকের জন্য লোকজন রাখা। এ সব কথা মনে হলে চার পয়সা দর্শনী একেবারে অতি-তুচ্ছ হাসির ব্যাপার বলে মনে হয়। ফুট্‌বল খেলার ক্লাবের চাঁদাও যে চার পয়সা নয়! চার পয়সা দর্শনী করবার উদ্দেশ্য এই যে অতি-দরিদ্র লোকের পক্ষেও চিড়িয়াখানা দেখে আমোদ আর শিক্ষা পেতে কোনো অসুবিধা ঘটবে না!

অত বড় ফুলের বাগান, মস্ত পুকুর, তার মধ্যখানে দ্বীপ, আর এই জীব-জন্তুর মেলা!—মনের শ্রান্তি ঘুচোবার এমন ঠাঁই কলকাতায় আর কৈ!

ভোর থেকে সূর্য্যাস্তের পরও এক ঘণ্টা চিড়িয়াখানা খোলা থাকে প্রতিদিন এবং দর্শনী চার পয়সা। চার বছরের ছেলে মেয়েদের জন্য পয়সা দিতে হয় না। শুধু রবিবারে বেলা ১০টা অবধি দর্শনী চার আনা; ১০টা থেকে ২টা অবধি চার পয়সা; এবং ২টা থেকে সন্ধ্যা অবধি এক টাকা। ঘোড়ার গাড়ী থেকে নেমে যাঁরা বাগানে ঘুরতে চান্ না, অমনি গাড়ী-শুদ্ধ বাগান দেখতে চান তাঁদের গাড়ীর জন্য দিতে হয় এক-টাকা এবং যে কজন গাড়ীতে থাকবেন, তাঁদের প্রত্যেকের দর্শনী ঐ চার পয়সা। পালকীর দর্শনী আট আনা। এর উপর আরো ব্যবস্থা,—প্রতি ইংরাজী

মাসের প্রথম, কিম্বা দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় কি চতুর্থ সোমবারে দর্শনী দিতে হয় না। সকলেই ফ্রী। অর্থাৎ প্রতিমাসে একদিন বিনা পয়সায় সকলকে বাগানে ঢুকতে দেওয়া হয়। কোন সোমবারে ফ্রী, সেটা বিজ্ঞাপনে জানানো হয়।

চিড়িয়াখানায় ঢোকবার তিনটি ফটক আছে—একটি বেলভেডিয়ার রোডে, দ্বিতীয়টি খিদিরপুরের দিকে অর্ফানগঞ্জ রোডে এবং তৃতীয়টি কালীঘাট থেকে আলিপুরে ঢুকেই কালিঘাট ব্রিজ রোডের উপর।

এবার পূজার ছুটিতে একদিন আমরা চিড়িয়াখানা দেখতে গেছলুম। সেই কথা বলি। বেলভেডিয়ার রোড দিয়ে ঢুকে পশ্চিমে এগিয়ে প্রথমেই পাই ডুমরাও হাউস। মস্ত ঘর। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ডুমরাওয়ের মহারাজা এটি তৈরী করিয়ে দেন। পরে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এ ঘরের আগাগোড়া সংস্কার হয়। এ ঘরে রাখা হয়েছে, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, মলয় উপদ্বীপ, শ্যাম নানাদেশের নানামূর্ত্তির নানা আকারের বানর। তার মধ্যে সবুজ বানর (Green monkey), Bonnet monkey, horn-tailed grivet monkey প্রভৃতি দেখতে মজার। grivet monkey আকারে ছোট, আধ-হাত লম্বা—আফ্রিকা থেকে আমদানী। এদের বাচ্ছা হয়েছে—দেখতে ঠিক ইঁদুরের মত

ডুমরাও হাউসের পশ্চিমে 'গরের হাউস।' এটিও কপির আস্তানা। অর্থাৎ চিড়িয়াখানায় ঢুকে প্রথমেই পড়ে কিষ্কিন্ধ্যা-লোক। গরের হাউসে বনমানুষ আছে, বানর আছে, হনুমান আছে। আমরা যখন যাই, তখন দেখি, বনমানুষটি গম্ভীর ভাবে একখানি ইট সরাতে ব্যস্ত, কোনোদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই আমরা তাঁকে প্রলুব্ধকর কদলী

দেখালুম, কিন্তু তিনি ঐ ইট তোলায় এমনি তন্ময় যে, সে কদলীর দিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না! যেন খুব ভালো ছেলে! স্কুলের পড়ার বইয়ের মধ্যে মগ্ন—দুনিয়ায় আর কোনোদিকে তিনি চাইতেও জানেন না! এই ঘরে আরব দেশের বানর দেখলুম—মুখ লম্বা, গায়ের লোম রেশমের মত নরম আর ল্যাজের কাছে পিছন-দিকটা টক্‌টকে লাল। তা ছাড়া আছেন বেবুন (আফ্রিকা) ও কালো বানর (Black monkey). কালো বানরের আদিম নিবাস Celebes দ্বীপে। এখানে আফ্রিকার বানর, ভারতের বানর, আমেরিকার বানর একই ঘরে -অবশ্য বিভিন্ন খাঁচায় বেশ সুখে বাস করছে। দর্শক দেখলে অতি-পরিচয়ের ভঙ্গীতে হাত পাতে—অর্থাৎ খেতে দাও হে বাবু! যেন যে মাসবে দেখতে, তাকে কদলী দক্ষিণা দিতেই হবে!

গরের হাউসের পর খোলা জায়গায় দুটি হাতী! চিনের বাদাম একটি ফেলে দাও, শুঁড়ে কুড়িয়ে মুখে দেবে! পয়সা ফেল, শুঁড়ে তুলে মাহুতকে উপহার দেবে। আর তাকে বল, হপ্ হপ্, হাতী অমনি প্রকাণ্ড হাঁ করবে। তখন দাও ছুড়ে তার মুখে কলার একটি বড় কাঁদি! তিনি তখনি তা গলাধঃকরণ করবেন। হাতীর ডাহিনে লালমোহন, হীরামোহন প্রভৃতি পাখী; বাঁয়ে উষ্ট্র। পশ্চাতে শূকর গোষ্ঠী—এঁদের মধ্যে Wild boar আছেন, এবং Pig আছেন। Wild boar এর পুরুষদের মুখের দুদিকে দুটি ধারালো দাঘ দাঁত। এঁদের মেজাজ খারাপ, একটুতেই গরম হয় এবং মেজাজ গরম হলে ঐ দন্ত দ্বারা গাছপালা, মানুষের উদর বিদীর্ণ করে দেন!

শূকরের ঠিক সামনে গণ্ডার। দুটী গণ্ডার আছে। তাঁরা কর্দ্দম ও জলে গা ডুবিয়ে আরাম উপভোগ করছিলেন—আমরা ক্যামেরা নিয়ে বহু ভাবে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করলুম। একজনের কৃপা হলো—জল ঝেড়ে তিনি উঠলেন কিন্তু উঠে কি স্থির থাকেন, পরিভ্রমণ সুরু করলেন। তারি ফাঁকে ছবি নেওয়া হলো। গণ্ডারের উত্তর দিকে পিঞ্জরে অষ্ট্রেলিয়ার এক পাখী দেখলুম—নাম, Cassoway। দেখতে সারসের মত—তবে সারসের মত 'রোগা' নয়, বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট দেহ এবং সারসের চেয়ে বাঁটুল। গায়ের পালক ঝাড়লণ্ঠনের ঝালরের

ময়নামতীর মায়াকানন

নয়

উড়ন্ত সরীসৃপ

ঠিক আমার সুমুখ দিয়েই কুমারের দেহটা শূন্যে উঠে যেতে লাগল।

কুমার আবার আর্ত্তস্বরে চীৎকার করলে, "বাঁচাও, বাঁচাও!"

আমার বিস্ময়ের চমকটা ভেঙে গেল! তখনো কুমারের দেহ নাগালের বাইরে গিয়ে পড়ে-নি,—সাম্‌নের দিকে এক লাফে এগিয়ে হাত বাড়াতেই আমি কুমারের পা দুটো মুঠোর ভিতরে পেলুম এবং প্রাণপণে তাই ধ'রে টানতে লাগলুম।

কিন্তু এই গরুড়-পাখীর গায়ে কি ভয়ানক জোর! সে কুমারের সঙ্গে আমাকেও প্রায় উপরে টেনে তোলবার উপক্রম করলে, ভাগ্যে আমি বাম হাতে পাহাড়ের একটা গাছের ডাল চেপে ধ'রে আর ডান হাতে কুমারের পা ধ'রে দেহের সমস্ত শক্তি এক ক'রে টান্‌তে লাগলুম, নইলে আমাকেও কম মুস্কিলে পড়তে হ'ত না!

এদিকে আবার বিপদের উপরে নূতন বিপদ! আমি যখন কুমারকে আর নিজেকে নিয়ে এম্‌নি বিব্রত হয়ে আছি, তখন আর-একটা গরুড়-পাখী হঠাৎ তীরের মতন আমার উপরে ছোঁ মেরে পড়ল। সে তার প্রকাণ্ড ডানা দিয়ে আমাকে এমন প্রচণ্ড এক ঝাপ্‌টা মারলে যে, কুমারের পা তো আমার হাত থেকে ফস্‌কে গেল বটেই, তার উপরে আমি নিজেও দুই চোখে সর্ষেফুল দেখে তিন চার হাত দূরে ছট্‌কে গিয়ে পড়লুম!

— সেই সঙ্গেই গুড়ুম্ ক'রে বন্দুকের আওয়াজ হ'ল।

তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে দেখি, খানিক তফাতেই একটা গরুড়পাখী দুই ডানা ছড়িয়ে পাহাড়ের উপরে নিশ্চেষ্ট হয়ে প'ড়ে আছে এবং তার পাশেই রয়েছে কুমারের দেহ। সে দেহ মড়ার মতন স্থির।

বিমল আর রামহরি তাড়াতাড়ি কুমারের কাছে ছুটে গেল। বিমল তাকে পরীক্ষা ক'রে বললে, "না, কোন ভয় নেই। কেবল অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

মাথার উপরে তাকিয়ে দেখলুম, বাকি তিনটে গরুড়-পাখী তখনো শূন্যে চক্র দিয়ে আমাদের কাছে কাছেই ঘুরছে-ফিরছে।

কুমারের বন্দুকটা আমার সামনেই প'ড়ে ছিল, আমি তখনি সেটা তুলে নিয়ে লক্ষ্য স্থির ক'রে ঘোড়া টিপলুম! লক্ষ্য ব্যর্থ হ'ল না। আর-একটা পাখী ঘুরতে ঘুরতে নীচে প'ড়ে পাহাড়ের ভিতরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! বাকি পাখীদুটো ভয় পেয়ে বিশ্রী চীৎকার করতে করতে ক্রমেই উপরে উঠে যেতে লাগ্‌ল।

খানিক পরেই কুমারের জ্ঞান হ'ল। গরুড়-পাখীর কামড়ে তার বাম হাতখানা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, এছাড়া তার আর বিশেষ কিছু অনিস্ট হয়-নি।

বিমল মরা গরুড়পাখীটার দিকে অনেকক্ষণ ধ'রে অপলক-চোখে তাকিয়ে থেকে বললে, "কি আশ্চর্য্য জীব!"

আশ্চর্য্য জীবই বটে। অতি বড় দুঃস্বপ্নেও এমন কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দেখা যায় না!

কুমার বললে, "এটা কি জীব বিনয়বাবু? এর ডানা আছে বটে, কিন্তু দেহের আর কোন জায়গাই পাখীর মতন নয়! এর চঞ্চুতে কত বড় বড় দাঁত দেখুন! দেহটা প্রায় গিরগিটির মতন, আর গায়ের কোথাও পালোকের চিহ্নমাত্র নেই!"

বিমল বললে, "আকারেও এ জীবগুলো প্রায় মানুষের মতই বড় আর ডানা দুখানাও প্রায় পনেরো হাত লম্বা! সিন্দবাদের গল্পে রক্‌পাখীর কথা পড়েচি। সেও মানুষকে ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে পারত। এটা রক্‌পাখী নয় তো?"

আমি বললুম, "না। আসলে এটা পাখীই নয়। এদের উপরে দুখানা হাত আর নীচে দুখানা পা আছে। প্রত্যেক হাতে চারটে ক'রে আঙুল। চতুর্থ অঙ্গুলীটা লম্বা হয়ে গেছে, আর তাতেই জালের মতন ডানাখানা ঝুলচে। পাখীর ডানার গড়ন এ-রকম হয় না।"

কুমার বললে, "পাখী নয়তো এটা কি?"

আমি বললুম, "উড়ন্ত সরীসৃপ। এও একরকম সেকেলে জীব।' পণ্ডিতরা এর নাম দিয়েচেন, Pterodactyl। কিন্তু আমরা একে গরুড়-পাখী ব'লেই ডাকব।"

সেই দিন সন্ধ্যাবেলাতেই কুমারের কম্প দিয়ে জ্বর এল—গরুড়পাখীর দাঁতে নিশ্চয়ই কোনরকম বিষ আছে!' তার হাতখানাও বিষম ফুলে উঠল। একে এই অজানা দেশ, তায় সঙ্গে কোন ঔষধ নেই, কাজেই কুমারের জন্যে প্রথমটা আমাদের মনে বড় ভাবনা হ'ল।

যা হোক্, প্রায় দিন-পনেরো ভুগে কুমার সে-যাত্রা প্রাণে প্রাণে বেঁচে গেল, আমরাও আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

দশ

ডাইনসরের পাল

গুহার বাইরে একখানা পাথরের উপরে আমি আর বিমল চুপ ক'রে ব'সেছিলুম।

সন্ধ্যা হয়-হয়; পশ্চিমের মেঘে মেঘে থরে থরে আবার সাজিয়ে সূর্য্যদেব আজ্‌কের মতন ছুটি নিয়েছেন এবং সেই রঙিন মেঘগুলির ছায়া সমুদ্রের নীলপত্রের উপরে দেখাচ্ছিল যেন ঠিক জলছবির মতন!

চারিদিকের স্তব্ধতার ভিতরে আমার মন আজ কেমন কেমন করতে লাগল! কোথায় আমাদের শ্যামলা বাংলাদেশ, আর কোথায় আমরা প'ড়ে আছি! এমন শান্ত সন্ধ্যার সময়ে বাংলাদেশের পল্লীতে পল্লীতে কত শঙ্খের সাড়া জেগে উঠেছে, বধূরা তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করছে, ছেলের দল ঠাকুরঘরে ভিড় ক'রে আরতির সময়ে কাঁসর বাজাবার জন্যে পরস্পরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিয়েছে!

এমন সময়ে বিমল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, "বিনয়বাবু, একটা কথা ভেবে দেখেছেন কি?"

আমার চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়ল। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কি বিমল?"

—"কাছিমের ডিম আর মাংস দুইই ফুরিয়ে গেছে। এবার কি খেয়ে আমরা বাঁচব?"

—"আবার কাছিম ধরতে হবে।"

বিমল খানিকক্ষণ পূর্ব্বদিকে তাকিয়ে রইল। সেখানকার নিবিড় অরণ্য তখনো অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছিল।

বিমল আঙুল দিয়ে সেই দিকটা দেখিয়ে বললে, "তার চেয়ে ঐদিকে চলুন।"

—"কেন?"

—"ওখানে কোন নতুন শিকার মেলে কিনা দেখা যাক্। রোজ রোজ কাছিমের মাংস আর ভালো লাগে না। সেদিন পাহাড়ে উঠে দেখেছিলেন তো, ঐ বনের পাশে মস্ত-একটা হ্রদ আছে? ঐ হ্রদের আশেপাশে নিশ্চয়ই নতুন কোন শিকারের সন্ধান পাওয়া যাবে।"

—"সঙ্গে সঙ্গে নতুন কোন বিপদেরও সন্ধান মিলতে পাবে।"

—"বিনয়বাবু, বিপদ এ দ্বীপের কোথায় নেই? কাছিম ধরতে গেলেও তো আবার সাগর-দানবের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিশেষ, এ দ্বীপের কোথায় কে আছে না আছে, সেটা আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। নইলে এখানে আমাদের বেঁচে থাকা সহজ হবে না।"

বিমলের কথা যুক্তিসঙ্গত বটে! কাজেই আমি সায় দিয়ে বললুম, "আচ্ছা, তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি!"

পরদিন সূর্য্য ওঠবার আগেই আমি, বিমল আর রামহরি গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লুম। কুমার তখনো ভালো ক'রে সেরে ওঠেনি ব'লে তাকে কমলের তত্ত্বাবধানে গুহাতেই রেখে গেলুম। বাঘা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চল্ল। কুমারের বন্দুকটা নিলুম আমি।

সমুদ্রের জলে স্নান ক'রে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া সেই নিস্তব্ধ মাঠের ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল, সে হাওয়া আমার বড়ই মিষ্টি লাগল। খানিক পরেই সুদূরের সবুজ বনের মাথায় স্বর্গীয় মুকুটের মতন সূর্য্যের মুখ জেগে উঠল।

রামহরি বললে, "খোকাবাবু, তুমি কি আবার ঐ ময়নামতীর মায়াকাননে যেতে চাও?"

বিমল হেসে বললে, "যদি যাই, তাহ'লে কি হবে রামহরি?

রামহরি মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "এবারে ওখানে গেলে তুমি আর প্রাণে বাঁচবে না।"

—"কেন রামহরি, তুমি থাকতে আমাকে প্রাণে মারে কে ?"

—"আমি বেঁচে থাকলে তবে তো তোমাকে বাঁচাব ? ও বনে ঢুকলে আমরা কেউ আর জ্যান্ত ফিরব না !"

—"ভয় নেই রামহরি, আজ আমরা বনের ভেতরে আর ঢুকব না। বনের পাশে একটা হ্রদ আছে, আমরা সেইখানেই যাচ্চি।"

এম্‌নি নানান কথা কইতে কইতে খানিক দূর এগিয়ে যেতেই দেখলুম, হ্রদের জল সূর্য্যের কিরণে ইস্পাতের মতন চক্‌চক্ ক'রে উঠছে !

আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়েই বুঝলুম, সেই হ্রদের আকার কি বিপুল ! তার এপার থেকে ওপারের বিস্তার অন্ততঃ কয়েক মাইলের কম হবে না ! তার জলের ভিতরে মাঝে মাঝে কতকগুলো ছোট-বড় পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই পাহাড়গুলোর উপরে সাদা সাদা পাখীর মতন কি যেন ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে আর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে।

তারপর আমরা যখন একেবারে হ্রদের ধারে গিয়ে পড়লুম তখন দেখা গেল, সেগুলো হাঁস ছাড়া আর কিছু নয় !

বিমল আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "কিন্তু এ কি-রকম হাঁস ? এদের একটারও যে ডানা নেই !"

আমি বললুম, "বিমল, এ দ্বীপের কোন জীব দেখেই তুমি আর আশ্চর্য্য হোয়ো না। কারণ তোমাকে আগেই বলেছি যে, এ হচ্ছে সেকেলে জীবের রাজ্য !"

—"সেকেলে হাঁসের কি ডানা ছিল না ?"

"না। দরকার হয়-নি ব'লে সেকেলে হাঁসের ডানা গজায় নি। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মই হচ্ছে এই, দরকার না থাকলে কোন কিছুর সৃষ্টি হয় না। বিশেষ, প্রকৃতির পরীক্ষা-কার্য্য তখনো ভালো ক'রে জমে ওঠেনি, কোন জীবের কি আবশ্যক আর কি অনাবশ্যক প্রকৃতি তখনো তা নিশ্চিতরূপ বুঝতে পারেন নি,

তাই সেকেলে জীবজন্তুদের দেহে অনেক বাহুল্য, আবার অনেক অভাব আর অপূর্ণতাও থেকে গিয়েছিল। এই, মানুষের কথাই ধর না কেন! সেকেলে মানুষদের মস্তিষ্ক, চোখ, মুখ, নাক, দাঁত, ঘাড়, বুক, হাত, পা—কিছুই একেলে মানুষদের মতন ছিল না,—সেকালে—"

হঠাৎ আমার কথায় বাধা দিয়ে বাঘার গজ্জনের সঙ্গে রামহরি চেঁচিয়ে উঠল—"ও কি ও!"

ফিরে দেখি, খানিক তফাতে মহিষের চেয়েও উঁচু একটা জীব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্য করছে!

আমি ব'লে উঠলুম- "এণ্টেলোডণ্ট, এণ্টেলোডণ্ট!"

বিমল বললে, "এণ্টেলোডণ্ট! সে আবার কি?"

—"সেকেলে দানব-শূকর!"

বিমল তখনি বন্দুক ছুঁড়লে এবং পর-মুহূর্ত্তেই শূকরটা মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

আমরা সবাই তার দিকে দৌড়ে গেলুম। কিন্তু শূকরটা মরেনি, আহত হয়েছিল মাত্র। কারণ আমরা তার কাছে যাবার আগেই সে আবার দাঁড়িয়ে উঠে তাড়াতাড়ি সাম্‌নের জঙ্গলের দিকে ছুটল।

সব-আগে বাঘা, তারপর বিমল, তারপর আমি আর রামহরি—এই ভাবে আমরা শূকরটার পিছনে ছুটতে লাগলুম। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই শূকরটা বনের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রামহরি চেঁচিয়ে বললে, "বনের ভেতরে ঢুকোনা খোকাবাবু, বনের ভেতরে ঢুকোনা!"

কিন্তু বিমলের মাথায় তখন শিকারীর গোঁ চেপেছে—হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সেই নিবিড় অরণ্যে মধ্যে সে প্রবেশ করল! কাজেই তার পিছনে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর উপায়ান্তর রইল না।

বন যখন ক্রমে অত্যন্ত ঘন হয়ে উঠল, তখন আমিও বল্‌তে বাধ্য হলুম, "বিমল, আর নয়; এইবারে আমাদের ফেরা উচিত !"

বিমল বললে, "এই যে, শূওরের রক্তের দাগ এখনো দেখা যাচ্চে !"

এম্‌নি ক'রে ঘণ্টা দুয়েক ছুটাছুটির পর রক্তের দাগও আর পাওয়া গেল না ! বিমল হতাশ ভাবে একটা গাছের তলায় বসে পড়ল। আমরাও বিষম হাঁপিয়ে পড়েছিলুম, সেইখানেই এক-একটা গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলুম।

প্রায় আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পর আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, "চল, এইবারে ফেরা যাক্ !"

বিমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "কাজেই।"

খানিক দূর অগ্রসর হয়েই বুঝলুম, আমরা ভুল পথ ধরে চলেছি। সেদিক থেকে ফিরে এসে আবার অন্য পথ ধরলুম, কিন্তু তবু বন থেকে বেরুবার পথ খুঁজে পেলুম না।

তখন বেলা দুপুর হবে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে উপরে, নীচে, চার পাশে এমন বিষম জঙ্গল আর গাছপালা যে, দুপুরের সূর্য্যালোকও সে বনের ভিতরে যেন ঢুকতে সাহস করেনি !

আমি দমে গিয়ে বললুম, "বিমল, আমরা পথ হারিয়েচি !"

বিমল বললে, "পথ আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে। এই দিকে আসুন।"

বিমলের পিছনে পিছনে আবার চললুম। কিন্তু মিনিট-কয়েক পরেই হঠাৎ চম্‌কে উঠে বিমল থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল !

আমি সুধলুম, "কি হ'ল বিমল, হঠাৎ দাঁড়ালে কেন ?"

কোন জবাব না দিয়ে, বিমল স্বধু হাত তুলে ইসারায় বললে, চুপ !

আমি পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমার পাদুটো যেন অসাড় হয়ে মাটির ভিতরে বসে গেল ! তেমন অভাবিত দৃশ্য জীবনে আর কখনো আমি দেখিনি !

পথের পাশেই জঙ্গলের ভিতর থেকে খানিকটা খোলা জমি দেখা যাচ্ছে সেই জমির ভিতরে দলে দলে ভীষণ-দর্শন জীব বিচরণ করছে—তাদের অধিকাংশই মাথায় প্রায় ষাট-সত্তর ফুট—অর্থাৎ তালগাছের সমান উঁচু।

'সেদিন যে কুমীর-কাঙ্গারু আমাদের তাড়া ক'রেছিল, এ জানোয়ারগুলোকে দেখতে প্রায় তারই মতন, তফাৎ খালি এই যে, এগুলো লম্বায়-চওড়ায় তার চেয়েও প্রায় দু'গুণ বড়।

আমি তাড়াতাড়ি গুণে দেখলুম, দলের ভিতরে প্রায় নব্বইটা জানোয়ার রয়েছে। কোন কোনটা ল্যাজ ও পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, মস্ত-উঁচু গাছের আগডাল সামনের দুই পা বা হাত দিয়ে ভেঙে নিয়ে চর্ব্বণ করছে। কোন কোনটা কাঙ্গারুর মত লাফিয়ে এদিকে ওদিকে যাচ্ছে। আবার কোন-কোনটা চুপ ক'রে বসে আছে। কতকগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট জীব পরস্পরের সঙ্গে খেলা করছে—নিশ্চয়ই সেগুলো বাচ্চা! কিন্তু বাচ্চা হলেও মাথায় তারা প্রায় হাতীর মতই উঁচু!

আমি চুপি চুপি বললুম, "বিমল, এগুলো ডাইনসর!"

বিমল বললে "বন থেকে বেরুতে গেলে এদের সুমুখ দিয়ে যেতে হয়। এখন উপায়?"

—"যতক্ষণ না এরা বিদায় হয়, ততক্ষণ আমাদের বনের ভেতরেই বসে থাকতে হবে। তা ছাড়া আর কোন উপায় তো দেখি না!"

বাঘা এতক্ষণ ভয়ে বোবা হয়ে পেটের তলায় ল্যাজ গুটিয়ে জীবগুলোকে দেখছিল—হঠাৎ সে বনের ভিতর দিকে ফিরে গোঁ গোঁ ক'রে উঠল! আমরাও পিছন ফিরে দেখলুম বনের অন্ধকারের ভিতর থেকে বড় বড় গাছ দুলিয়ে আর-একটা প্রকাণ্ড কি জানোয়ার আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে!

রামহরি মড়ার মতন ফ্যাকাসে মুখে বললে, "খোকাবাবু, এবারে আর আমাদের রক্ষা নেই।"

সত্য কথা! বনের ভিতরে আর বাইরে—দুদিকেই সাক্ষাৎ মৃত্যু আমাদের চোখের সামনে বিরাজ করছে, পালাবার কোন পথই আর খোলা নেই! এবারে বন্দুকের সাহায্যেও আত্মরক্ষা করতে পারব না, কারণ বন্দুকের শব্দে সমস্ত জীব-গুলোই ক্ষেপে গিয়ে এক সঙ্গে আমাদের আক্রমণ করতে পারে!

হতাশ হয়ে মরণের অপেক্ষায় আমরা তিনজনে পাথরের মূর্ত্তির মতন দাঁড়িয়ে রইলুম।

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

রতা-শেয়ালের কথা

শেয়াল নিজের গড়ে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আরাম করুন, এদিকে হিমে গাছতলায় পড়ে ডোম্বল দাস তপস্যা করতে থাকুন! ওদিকে হয়েছে কি, রাজার চর টিক্‌টিকি, সে নতুন রাজা সিংহের কাছে শেয়ালের এ সব খবর প্রকাশ কোরে দিয়েছে; আর অমনি সিংহ হুহুঙ্কার ছেড়েছেন!

তখন ফাল্গুন মাস; হিমালয়ের চূড়োয় বরফ জমাট বেঁধেছে কিন্তু সুন্দর বনে বসন্তকাল নতুন দেখা দিয়েছে ফুলে-ফলে পাখীর গানে মধুর গন্ধে জলস্থল মাতিয়ে তুলেছে। সবুজ পাতার চাঁদোয়ার তলায় দাঁড়িয়ে সিংহ-সিংহিনী ডাক ছাড়লেন;—নিমন্ত্রণ চিঠি পেতে কারো আর দেরী হলো না। জীব-জন্তু যে যেখানে ছিল সব কাজ ফেলে সভায় এসে হাজির হতে লাগলো। বকা-ধার্ম্মিক সব-আগে এসে লম্বা পায়ের ধুলো রাজা-রাণী ছাড়া আর সবার মাথায় বুলিয়ে দিয়ে, ঠোঁটে কোরে একটুখানি আঁস-জল ছিটিয়ে রাজা-রাণীকে "জয় জীব—স্বস্তি স্বস্তি" বোলে আশীর্ব্বাদ কোরে বসলেন। হরবোলা পাখী রাজার বিদূষক, ময়না রাণীর সেঙ্গাৎনী--

---

পূর্ব্ববৃত্তান্ত—কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত "ডোম্বল দাসের কৈলাস যাত্রা"।

দুজনে এসে ভাঁড়ামো জুড়ে দিলে। ভালুক মন্ত্রী বাঘা-কোটাল, সেনাপতি গজপতি, খড়্গ-সিং বরকন্দাজ, মহিষ-মহিষী, গোরু-গাধা-ছাগল-ভেড়া ছোট-বড় পাত্র-মিত্র সবাই একে-একে এসে জুটলো।

সিংহ শেয়ালের কথা পাড়লেন— এক যে ছিল শেয়াল তার বাপ একদিন আমার মামার বাড়ীর সদর আর অন্দর দুই মহলের মাঝে একটা দেয়াল দেবার হুকুম পেয়ে রাজ মজুরের কাজ করতে এলো। তার নাম ছিল রতা বা রতন। শেয়াল-পণ্ডিত তখন খুবই ছোট, রতার বৌ তাকে কোলে নিয়ে চুণ-সুর্কির ঝুড়ি বইতে এসেছিল। তখন তাদের অতি দৈন্য দশা।

"রতা-মিস্ত্রি তো দেয়াল তুলে দিলে। গজগীর কোরে গাঁথা মোটা দেওয়াল মামার সদর-অন্দরকে দুই ভাগ কোরে মেঘ ছাড়িয়ে উঠলো। মামা তো দেখে ভারি খুসি। কিন্তু মামা সেই দেওয়ালের মধ্যে অন্ধকারে পচে মরবার জোগাড়। ওদিকে মামারও অন্দরে যাবার পথ বন্ধ। কি উপায় করা যায়? মামা দেয়াল ভাঙবার হুকুম দিলেন। কিন্তু পর্ব্বত প্রমাণ দেয়াল, তাকে ভেঙে ফেলা তো সহজ নয়! হাতী এলেন দেয়াল ভাঙতে, কিন্তু দেওয়াল যেমন তেমনিই রইলো, লাভের মধ্যে হাতী দাঁত ভেঙে ফোগলা হয়ে ফিরে এলেন। ওদিকে ক্ষিদের জ্বালায় অন্দরের মধ্যে মামী এমন চীৎকার সুরু করলেন যে রাজ্যের লোকের কানে তালা ধরে গেল। ছোট ছোট জানোয়ার তো ভয়েই মারা যাবার জোগাড়। রাজ্যে হুলুস্থূল!

"সবাই মামার দুর্ব্বুদ্ধির নিন্দে করতে লাগলো। পশুদের মধ্যে সদর অন্দর— বাড়ির মধ্যে বাহির—এ সব কোনো কালে ছিল না, হঠাৎ নতুন-রকম কেতা করতে গিয়ে এ কি বিপদই মামা ঘটালেন! মামা রতা-শেয়ালকে ডেকে বল্লেন— "তিন-দিনের মধ্যে এর উপায় কর, না হলো তোমার প্রাণদণ্ড করবো।" কিন্তু হায়, রতা-শেয়াল দেয়াল দিতে-দিতেই বুড়ো হয়ে গেছে! দেয়াল তুলতেই সে পাকা, দেয়াল-সরানো বিদ্যেতে সে একেবারেই মজবুত ছিল না। যে দেওয়াল সে একবার তুলেছে, তাকে নামানো তার সাধ্য হলো না। মামা মামীর দেওয়ালের মধ্যেই মরে রইলেন!

"অন্দরের মধ্যে মামার চাৎকার বন্ধ হলো কিন্তু বাইরে থেকে মামা ভোম্বলদাস এমন হাঁক-ডাক কান্না কাটি তম্বি-তম্বা সুরু করলেন যে বতা-শেয়াল ভয়েই মরে যায় বুঝি! আর তাকে ধোরে ছাল ছাড়িয়ে মাথা গুঁড়িয়ে একটু একটু কোরে মারবার সুবিধে হয়না দেখে বাঘা কোটাল ভারি দুঃখিত হয়ে রাজাকে চুপ করবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলো। সেই অবসরে বতার ছেলেটা বাপকে বুদ্ধি দিলে। কোটাল এসে বতাকে যখন ধরলে তখন দেখা গেল বতা মরেছে আর তার বৌ আর এই আমাদের বতা-শেয়ালের ব্যাটা শেয়াল-পণ্ডিত মাথায় হাত দিয়ে কাঁদছে। রতাকে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবার সুবিধে হলো না কিন্তু বাঘা কোটাল রতার ল্যাজের চামরটা কেটে নিয়ে পতাকার মতো কোরে সেটাকে ধাসি-কাঠে লটকে দিয়ে তবে শান্ত হলো।

'ছেলের বুদ্ধি নিয়ে বতা ল্যাজটা মাত্র দিয়ে সে-যাত্রা প্রাণ নিয়ে—রাতা-রাতি কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে সবে পড়লো বটে কিন্তু ল্যাজ তুলে সে দৌড় মারতে পারলেনা—এর জন্যে শেয়ালের দলে সে ভারি লজ্জা পেলে। সবাই বল্লে—এর চেয়ে যে মরাও ভালো ছিল! রতা-বুড়ো কাঁদতে কাঁদতে তার ছেলেকে এসে বল্লে—তোরই জন্যে আমার এই লাঞ্ছনা! তখন শেয়াল-পণ্ডিত গম্ভার মুখে ভাবতে বসলেন—কি কোরে সব শেয়ালকে জব্দ করা যায়।

'ছেলেটার অগাধ বুদ্ধি। ভাবতেই তার মাথায় একটা ফন্দি এলো। সে চট্-কোরে তার বাপকে সাহেবদের নীল কুঠিতে নিয়ে এক পোঁচ নীল রং মাখিয়ে কানে ফুস্-ফুস্ কোরে মন্তর দিয়ে ছেড়ে দিলে।

'রতা-শেয়াল ছিল লাল, এখন সে নীল হয়ে বনে ফিরে এসে মহা হৈচৈ বাধিয়ে দিলে—রাজা-উজির মেরে বেড়াতে আরম্ভ করলে। শেয়ালে বোলে তাকে আর চেনাই যায় না!' মামা ভোম্বল দাস পর্য্যন্ত ভয়ে তাকে সিংহাসন ছেড়ে দিতে পথ পান না। কৈলাস-পর্ব্বত থেকে পশুপতি ভোম্বলদাসের বোকামোর খবর পেয়ে এই নতুন রাজাকে রাজ্য শাসন করতে পাঠিয়েছেন—এই কথাই বনে-বনে রাষ্ট্র হয়ে গেল।

"মামা একে মামার শোকে অস্থির, তার উপর সিংহাসন হারিয়ে একেবারে পাগলের মতো হলেন। এদিকে বৃত্তা, যে একদিন মামার চাকর ছিল, মাইনের জন্যে দু-বেলা ভাল্লুক-মন্ত্রীর কাছে দু'বেলা ধন্না দিতো, মারের ভয়ে বাঘা-কোটালের বাড়ি এঁটো-কাঁটা ফেলে ত্রি-সন্ধ্যা খেটে মরতো, বকা-পার্ষ্মিকের জন্যে মাছ কুটে-কুটে হাত খইয়ে ফেলতো -সেই হলো হুকুম-হাকামের কর্তা! সবার যে কি দুঃখে দিন যাচ্ছে বলা যায় না কিন্তু বাঙা বর্তা—সে বং বদলে বেশ সুখেই আছে। সবাই তার কাছে জোড়-হস্ত।

"সেই সময় বর্তা যদি আরো দিন-কতক নিজের বুদ্ধি না প্রকাশ কোরে তার পণ্ডিত ছেলেটার, কথা-মতো চল্‌তো তবে কোনো গোলই হতো না। কিন্তু সিংহাসন পেয়ে রতার মাথা গরম হয়ে গেল। সেই সঙ্গে যে-টুকু বুদ্ধি মগজে ছিল, সেটুকুও তার গায়ের রঙের মতো বদ্‌লে—বাঁকা-চোরা উল্টো-পাল্টা হয়ে বর্তা যা-তা করতে আরম্ভ করলে।

"সব জানোয়ারের ল্যাজ থাকবে, কেবল তারই থাকবে না—এটা তার আর সইছে না। তার পণ্ডিত ছেলের উপরই রাগটা বেশী। তারই কথাতেই তো সে ল্যাজ দিয়ে প্রাণ নিয়ে সরে ছিল। এখনো সেই ল্যাজ ফাঁসি-কাঠে ঝুলচে। সেটাকে নামিয়ে এনে নিজের পিঠে যে জোড়া দেবে তারও উপায় ছেলেটা রাখেনি!—নীল গায়ে লাল ল্যাজ মেলানো শক্ত! যত দোষ হলো শেয়াল পণ্ডিতের আর সেই অপরাধে সে রাজ্যের জানোয়ারদের ল্যাজ কেটে ফেলবার হুকুম দিয়ে বসলো।

"জানোয়ারের দলে সোরগোল পড়ে গেল। সিংহ বেঁকে বসলেন—কিছুতেই ল্যাজ দেবনা! দেখা-দেখি বাঘও গোঁ ধরলে,—ল্যাজ আপ্‌সে বল্লে—যাক্ প্রাণ, থাক ল্যাজ! মোষও চোখ রাঙিয়ে বাঘের কথায় সায় দিলে। ভালুকের ল্যাজ ছিল না বল্লেই হয়, সে বল্লে -রাজার হুকুম না মানলে নয়, মুস্কিল! বানর তাকে দাবড়ি দিয়ে বোলে উঠলো—তোমার চাকরি বজায় রাখতে ল্যাজ কাটতে চাও, কাটো কিন্তু আমরা তোমায় এক-ঘরে করব, মনে থাকে যেন! ভালুক ভয়ে চুপ

হয়ে গেল। ভালুক যখন চুপ করলেন, তখন খরগোস, কচ্ছপ, হরিণ—যাদের ল্যাজ নজরেই পড়ে না তারা আর উচ্চবাচ্য করতে পারলে না।

'এদিকে রাজার ইস্তাহার জারি হলো পয়লা তারিখে শেয়ালদের, দোসরা তারিখে সিংহ-বাঘ এমনি সব হোমরা-চোমরাদের, তেসরা তারিখে গোরু গাধা মোষ এদের, চৌঠো বাকি সব প্রজার ল্যাজ কাটা চাই, নচেৎ প্রাণদণ্ড!

'সব জানোয়ার ধম্মঘট কোরে এমন রাজার বন ছেড়ে মানুষের রাজত্বে গিয়ে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় থাকবার মতলব করছে, এমন সময় শেয়াল-পণ্ডিত নাপিত-ধর্ত্তর পাঠশালা থেকে নাকুর বদলে নরুণ, নরুণের বদলে হাড়ি, হাড়ির বদলে ধুচুনি আর ধুচুনির বদলে বাড়ির গিন্নী কেমন কোরে আনতে হয়, সেই বুদ্ধি শিখে, বৌ-সঙ্গে ধুচুনি-মাথায় ঢোল পিটতে-পিটতে বনে এসে হাজির! সব জানোয়ার তার বুদ্ধির তারিফ কোরে ল্যাজ বাঁচাবার একটা উপায় করতে তাকে ধরে পড়লো।

"পণ্ডিত শুনলেন প্রথমেই শেয়ালদেরই ল্যাজ নামাবার হুকুম হয়েছে। তিনি খানিক গম্ভীর হয়ে থেকে বল্লেন—তোমরা সবাই নিশ্চিন্ত থাক, এর উপায় আমি করবো। পয়লা-তারিখে সব শেয়াল আর জন্তু-জানোয়ার যে যেখানে আছ, ঠিক সময়ে রাজ-সভায় হাজির হবে;—এদিক ওদিক না হয়। রাজা যখন বলবেন—ল্যাজ কাটো! অমনি সবাই নিজের ল্যাজ দাঁতে চেপে ধোরে সিংহাসনের দিকে মুখ ফেরাবে, আর যা করতে হয়, আমি করবো। কিন্তু কথা যেন ঠিক থাকে। আর পয়লা তারিখে ছেলে-বুড়ো সব শেয়ালের এক "রা" হওয়া চাই। না হলে সব মাটি!

সবাইকে এই বুদ্ধি দিয়ে শেয়াল পণ্ডিত বৌ নিয়ে ঘরে যান, এ দিকে ভোম্বলদাস, বাঘা-ভাল্লুক এরা আনন্দ করছে; গাধা আর গোরু এরা ঘাড় নেড়ে বলাবলি করতে লাগলো—ভাই, শেয়াল পণ্ডিতের যুক্তি তো ভালো বোধ হয় না। দাঁতে তো ল্যাজ কামড়ে, ধরলেম, সেই সময় যদি রাজা এক হুঙ্কার ছাড়েন, তবে দাঁত-কপাটি তো লেগে বসে আছে! তখন যদি ল্যাজের গোড়ায় দাঁত একটু চেপে বসে তবে ল্যাজ খসে না-পড়ে যায় না! আমাদের তো ভাই ভালো বোধ হচ্ছে না। শেষে না ঠকতে হয়! ভোম্বলদাস দুজনকে ধমক দিয়ে বিদায় কোরে

দিলেন। তারা দুই জনে দল ছাড়া হয়ে এক জন গেল গোয়াল-ঘরে বাঁধা পড়তে, এক জন গেল ধোবার বাড়ী মোট বইতে।

"পয়লা তারিখে নল বনে নীল রাজা কাটা ল্যাজে জরির ঝুঁপি আর ময়ূরের পালকের এক রাখী বেঁধে গোম্‌সা মুখ কোরে ল্যাজ ভাসান্ দেখবার জন্যে ঘাড় উঁচু কোরে রাঙা মাটির সিংহাসনে উঠে বসলেন। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। নদীর জলে যেন রক্তের ঢেউ খেলচে। ধারে-ধারে শর বনগুলোর মধ্যে জানোয়ারেরা গুঁড়ি মেরে বসে রাজার দিকে চেয়ে রয়েছে—কখন্ কি হুকুম হয়! এমন সময় শেয়াল-পণ্ডিত রাজ্যের খ্যাঁকশেয়াল নিয়ে সভায় উপস্থিত হয়ে হাত জোড় কোরে দাঁড়ালেন। নীল রাজা এ পর্য্যন্ত কারো সঙ্গে কথা বলেন নি, পাছে মুখ খুললে শেয়ালের রা ধরা পড়ে যায়। ইসারায় শুধোলেন—কি হলো? পণ্ডিত নিজের ঝাঁটা ল্যাজ নিশেনের মতো আকাশে তুলে হেঁকে বললেন—হুয়া! অমনি চারিদিকে শেয়ালের পাল ডেকে উঠলো- হুয়া হুয়া! রাজা তাদের ল্যাজের দিকে আঙুল ইসারা করলেন—কি হুয়া?—কিছুই হয় নি! কিন্তু শেয়াল-পণ্ডিত কেবল বলতে লাগলো—হুয়া হুয়া হুয়া উচ্চা হুয়া উচ্চা হুয়া!

"এক শেয়াল ডাকলে সব শেয়ালকেই ডাকতে হবে—এটা বিধাতার নিয়ম। ডাকবার জন্যে রতার প্রাণ আইঢাই করতে লাগলো, তবু সে দু-হাতে মুখ চেপে বসে রইলো দেখে শেয়াল-পণ্ডিত দল-বলকে ইসারা করলেন। ঠিক সেই সময় সূর্য্যও অস্ত গেলেন। অন্ধকারে শেয়ালের পাল চারিদিক থেকে ডেকে উঠলো—হুয়া হুয়া হোতা হুয়া হোতা হুয়া! রতার মুখ আর বন্ধ থাকল না। সে মোটা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো—ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া? না হুয়া না হুয়া! "আরে শেয়াল!"—বোলে ভোম্বলদাস অমনি তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে এক থাপ্পড়ে রতাকে সিংহাসন থেকে জলে ফেললেন। সেখান থেকে বাঘ তাকে মুখে কোরে তুলে দেখালে—নীল রং ধুয়ে বেরিয়েছে—ল্যাজ-কাটা রতা-শেয়াল, রাজ-মিস্ত্রি!

সেই অবধি শেয়াল-পণ্ডিতকে মামা সভা-পণ্ডিত কোরে রাখলেন আর তারই বুদ্ধিতে চলতে লাগলেন। ছিল সে রাজমজুরের ছেলে, হলো সে রাজার প্রধান

মন্ত্রী। অহঙ্কারে আর মাটিতে তার পা পড়েনা। তার পর বুদ্ধির জোরে সে কি না করলে? তার বাড়ি হলো, ঘর হলো—মামার দৌলতে তার সব হলো। এখন সেই মামাকেই সে নিজের গড়ে নিয়ে বন্ধ করবার জোগাড় করছে—টিকটিকি এই খবর আমাকে দিয়ে গেল। কোন দিন সে মামাকে সারিয়ে-সুরিয়ে ফুস্‌লে-ফাস্‌লে নিয়ে আমারই বা সিংহাসন আবার কেড়ে নিতে আসে!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিকারী-শিকার

পূর্ব্ব-আফ্রিকার ইংরেজ-রাজত্বের মধ্যে অত্যন্ত সিংহের দৌরাত্ম! সেখানকারই একটি সত্য ঘটনা আজ তোমাদের কাছে বলব।

পূর্ব্ব আফ্রিকার কিমা নামে জায়গায় ছোট্ট একটি রেল স্টেশন আছে। সে-অঞ্চলের এক সিংহের মনে হঠাৎ রেলকর্ম্মচারীদের মাংস খাবার জন্যে যার-পর-নাই লোভের সঞ্চার হ'ল!

দুদিন পরেই দেখা গেল, স্টেশনের ভিতরে সিংহ-মহাশয় যখন-তখন যাতায়ত সুরু করেছেন। তার ভাব দেখে এটাও বেশ বোঝা গেল যে, কুলী-মজুর থেকে ষ্টেশন-মাষ্টার পর্য্যন্ত কারুর তোয়াক্কাই সে রাখতে রাজি নয় এবং যাকে বাগে পাবে তাকেই ফলার ক'রে ফেলতেও সে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করবে না!

একরাত্রে ফলারের লোভে সে ষ্টেশন-ঘরের ছাদের উপরে লাফিয়ে উঠল এবং দাঁত ও থাবা দিয়ে ছাদের করগেটের লোহার তক্তাগুলোকে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল!

ব্যাপার দেখে টেলিগ্রাফ-বাবুর পিলে গেল চমকে! তিনি ভারতবাসী ছিলেন,—পেটের দায়ে চাকরী করতে সুদূর আফ্রিকায় গিয়েছেন — সিংহ-টিংহের কোনই

ধার ধারেন না। তিনি ছাদের উপরে সিংহের আস্ফালনে ভয় পেয়ে ট্রাফিক-ম্যানেজারকে তাড়াতাড়ি 'তার' ক'রে দিলেন—"সিংহ স্টেশনের সঙ্গে লড়াই করছে (Lion fighting with Station)! শীঘ্র সাহায্য পাঠান!" যদিও ষ্টেশনের সঙ্গে লড়াই ক'রে সিংহ সে যাত্রা বিজয়ী হ'তে পারলে না, কিন্তু তার পরেই একে একে সে অনেকগুলো লোককে পেটের ভিতরে অনায়াসে পূরে ফেললে!

কিমা স্টেশনের কর্ম্মচারী ও কুলি মজুরদের মধ্যে অনেকেই ছিল ভারতবাসী। সিংহের ভয়ে তারা কাজকর্ম্ম প্রায় বন্ধ ক'রে দিলে!

ব্যাপার গুরুতর দেখে সেখানকার পুলিসের সুপারিনটেণ্ডেট রিয়াল সাহেব, দুই বন্ধুর সঙ্গে সিঙ্গিমামাকে একেবারে নিশ্চিন্তপুরে পাঠিয়ে দিতে এলেন।

ষ্টেশনে নেমেই তিনি শুনলেন, এই মাত্র সিংহ-মহাশয় স্টেশনের চারিদিকে সান্ধ্য ভ্রমণ ক'রে গেছেন।

সিংহটা কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে বুঝে রিয়াল-সাহেব স্থির করলেন, আজ স্টেশন থেকে এক পা নড়বেন না! তিনি হুকুম দিলেন, তার কামরাটি যেন রেলগাড়ী থেকে আলাদা ক'রে, লাইনের ওপারে বন-জঙ্গলের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়।

সাহেবের হুকুম মত কাজ করা হ'ল। কিন্তু লাইন তখন মেরামত করা হচ্ছিল ব'লে কামরার গাড়ীখানা ঠিক সমান ভাবে দাঁড় করানো গেল না।

রিয়াল সাহেবের দুই সঙ্গীর একজনের নাম মিঃ হুবনার, আর-একজনের নাম মিঃ পেরেণ্টি। তারা তিনজনে বন্দুক হাতে ক'রে চারিদিকে একটা চক্র দিয়ে এলেন। কিন্তু সিংহের নাম-গন্ধও না দেখে "ডিনার" খাবার জন্যে আবার গাড়ীর ভিতরে ফিরে এসে বসলেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'ল। তারপর তিন জনেই কামরার জান্‌লার কাছে ব'সে পশুরাজের যথোচিত অভ্যর্থনার জন্যে রীতিমত প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

অন্ধকার রাত্রি. চারিদিকে জঙ্গল আর ঝোঁপঝাপ। কিন্তু সিংহের কোন

পাত্তাই নেই! কেবল এক জায়গায় দেখা গেল, দুটো অত্যন্ত-উজ্জ্বল জোনাকী সমান ভাবে দপ্‌দপ্ ক'রে জ্বলছে!'

পরের ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছিল, সাহেবরা যা জোনাকী ভেবে অবহেলা করলেন, তা হচ্ছে স্বয়ং পশুরাজেরই দুটো জ্বলন্ত চোখ! কারণ বিড়ালের মত বাঘ ও সিংহেরও চোখ অন্ধকারে জ্বল্-জ্বল্ করতে থাকে!

সাহেবরা যখন সিংহের অপেক্ষায় ব'সেছিলেন, সে নিজেই তখন অন্ধকারে থাবা পেতে ব'সে সাহেবদের সমস্ত গতিবিধি লক্ষ্য করছিল এবং বোধ হয় মনে মনে মানুষের নির্বুদ্ধিতা দেখে হাসছিল! এই ব্যাপারেই বোঝা যায়, মানুষ-শিকারে সিংহটা কত-বড় পাকা!

সিংহের সাড়া না পেয়ে রিয়াল-সাহেব তাঁর বন্ধুদের বললেন, "ওহে, সবাই মিলে রাত জেগে কি হবে? ততক্ষণ তোমরা ঘুমিয়ে নাও, আমিই এখানে পাহারায় ব'সে আছি!"

কথাটা সঙ্গত বুঝে বন্ধুরাও বললেন, "সেই ঠিক!"

কামরার ভিতরে শয্যাস্থান ছিল দুটি,—একটি টঙের উপরে, আর একটি জানলার ধারে। উপরের বিছানায় শুলেন হুবনার। পেরেণ্ট বললেন, "রিয়াল, তুমি নীচের বিছানাটা দখল কোরো। আমি কামরার মেঝেতেই আজকের রাতটা বেশ কাটিয়ে দিতে পারব।"—এই ব'লে তিনি মেঝের উপরেই বিছানা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর পাদুটো রইল কামরার ভিতরে আসা-যাওয়া করবার পাশে-ঠেলা-দরজার দিকে।

রিয়াল একলাটি ব'সে ব'সে পাহারা দিলেন—অনেক রাত পর্য্যন্ত। কিন্তু কোথায় সিংহ? শেষটা হতাশ ও বিরক্ত হয়ে তিনিও জান্‌লার ধারের বিছানায় শুয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করতে লাগলেন। রেল-লাইন থেকে কামরার জান্‌লা ছিল অনেক উঁচুতে, কাজেই তাঁর মনে কোনরকম বিপদের ভয়ও হ'ল না।

যে-মুহূর্ত্তে রিয়াল ঘুমিয়ে পড়লেন, বাইরের অন্ধকার থেকে সিংহটাও যে তখনি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছিল, পরে তার প্রমাণের অভাব হয় নি। সে সোজা

তুটো উঁচু সিঁড়ির ধাপ দিয়ে গাড়ীর উপরে উঠল। পাশে-ঠেলা দরজাটা খুব-সম্ভব একটুখানি খোলা ছিল, সিংহটা থাবা দিয়ে দরজাটা সন্তর্পনে সম্পূর্ণরূপে খুলে ফেলে একেবারে কামরার ভিতরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু আগেই বলেছি, লাইনের দোষে গাড়াখানা ঠিক সমান ভাবে দাঁড় করানো ছিল না। সিংহের বিপুল দেহ কামরার ভিতরে ঢুকবামাত্র তার ভারে সমস্ত গাড়ীখানা আর একদিকে কাৎ হয়ে পড়ল, ফলে পাশে-ঠেলা দরজাটা আবার আপনা-আপনি বন্ধ হ'য়ে গেল। তখন একই কামরার ভিতরে বন্ধ হ'য়ে রইল বিশালাকায় সেই সিংহটা এবং একজন ঘুমন্ত মানুষ! ভাবতেও কি তোমাদের গা শিউরে উঠছে না ?

সিংহ কামরায় ঢুকে সর্ব্বাগ্রে রিয়ালকেই লক্ষ্য করলে। সে বোধ হয় অন্ধকারে ব'সে ব'সে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছিল যে, রিয়ালই তার সব চেয়ে বড় শত্রু! কারণ তার পায়ের তলাতে মুখের কাছেই শুয়েছিলেন পেবেণ্টি, সুতরাং সে খুব সহজেই তাঁকে আক্রমণ করতে পারত, কিন্তু তা না ক'রে সে ঘুমন্ত পেরেণ্টির উপরে পা তুলে দাঁড়িয়ে রিয়ালের উপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল!

তীব্র এক আর্ত্তনাদে উপরের বিছানায় হুব্‌নারের ঘুম গেল ভেঙে! তড়াক্ ক'রে উঠে ব'সে তিনি স্তম্ভিত নেত্রে দেখলেন, প্রকাণ্ড এক সিংহ পিছনের তুই পা পেরেণ্টির বুকের উপরে এবং সাম্‌নের তুই পা রিয়ালের দেহের উপরে স্থাপন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে!

হঠাৎ ঘুম ভেঙে এমন দৃশ্য দেখলে হুবনারের মনের ভাব কি-রকম হওয়া উচিত, তা বোধ হয় তোমরা বুঝতেই পারছ? হুবনার আতঙ্কে একেবারে পাগলের মতন গেলেন! তিনি সভয়ে আরো দেখলেন, তাঁরও পালাবার কোন উপায়ই নেই! একমাত্র যে পথ আছে তা হচ্ছে দ্বিতীয় একটা পাশে-ঠেলা দরজা - যা দিয়ে চাকরদের মহলে যাওয়া যায়। কিন্তু সে পথ তো সিংহের নাগালের মধ্যেই! সে পথে পালাতে গেলে এক থাবায় সে তো তাঁর মাথাটাই উড়িয়ে দেবে!

পেরেণ্টির অবস্থাও আরও শোচনীয়! ঘুম ভেঙেই তিনি দেখলেন তাঁর

বুকের উপরে কয়েক মণ ওজনের এক ভীষণ সিংহ, তাঁর আর নড়বার-চড়বার উপায় পর্য্যন্ত নেই! চোখ কপালে তুলে তিনি আড়ষ্ট হয়ে রইলেন!

রিয়াল তখন সিংহের কবলে ইঁদুরের মতন ছট্‌ফট্‌ ও বিষম যাতনায় পরিত্রাহি চীৎকার করছেন!

হুবনার দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে উপর থেকে পালাবার জন্যে লাফ মারলেন। কিন্তু পড়লেন গিয়ে একেবারে সিংহের পিঠের উপরে! তা ভিন্ন আর উপায়ও ছিল না, কারণ তার বিপুল দেহ সমস্ত পালাবার পথটা জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভয়ে পাগলের মতন না হ'লে হুবনার কখনোই এমন বোকার মতন সাক্ষাৎ-মৃত্যুর কবলে ঝাঁপ দিতে পারতেন না! সৌভাগ্যক্রমে সিংহটা তখন রিয়ালকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল, তার পিঠের উপরে কে একটা তুচ্ছ মানুষ লাফিয়ে পড়ল কি না পড়ল এটা সে খেয়ালের মধ্যেই আনলে না!

হুবনার সিংহের পিঠ থেকে নেমে ওদিককার পাশে-ঠেলা দরজাটার কাছে নিরাপদে গিয়ে পৌঁছলেন বটে, কিন্তু হতাশভাবে দেখলেন যে, ষ্টেশনের ভয়বিহ্বল ভারতীয় কুলিরা বাহির থেকে দরজাটা প্রাণপণে চেপে আছে—পাছে সিংহটা কোনগতিকে বেরিয়ে প'ড়ে তাদের ঘাড় ভাঙতে চায়! কিন্তু হুবনার দেহের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে দরজাটা কোন রকমে একটুখানি খুলে সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কুলিরা দরজাটা তৎক্ষণাৎ আবার বন্ধ ক'রে পাগড়ী, কাপড় দিয়ে খুব শক্ত ক'রে বেঁধে ফেললে!

পর-মুহূর্ত্তে ভয়ানক একটা শব্দ হ'ল এবং গাড়ীখানা আবার আর এক দিকে হেলে পড়ল! সবাই বুঝলে, হতভাগ্য রিয়ালকে মুখে ক'রে সিংহ জানালা গ'লে বাইরে বেরিয়ে গেল!

পেরেণ্টি তখনি টপ্‌ ক'রে উঠেই অন্য পাশের জান্‌লা দিয়ে লাফিয়ে পড়লেন এবং এক দৌড়ে ষ্টেশনের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। প্রচলিত বিবরণের মুখ থেকে যে-ভাবে এ-যাত্রা তিনি পার পেয়ে গেলেন, বাস্তবিক তা গল্পের মতই আশ্চর্য্য!

শিশুর ইতিহাস

পরদিন সকালে দেখা গেল, গাড়ীর ভিতরটা, ও যে জানলা দিয়ে সিংহ বেরিয়ে গেছে, তার চারপাশের কাঠের তক্তা ভেঙে-চূরে তছনছ হয়ে আছে এবং সমস্ত কামরাটা রক্তে যেন ভেসে যাচ্ছে!

গাড়ী থেকে খানিক তফাতেই, জঙ্গলের ভিতরে অভাগা রিয়ালের দেহের খানিক খানিক অংশ পাওয়া গেল।

....

কিন্তু এই দুর্দান্ত পশুরাজকে বনের ভিতরে আর বেশীদিন রাজত্ব করতে হয়-নি। কারণ ঐ ঘটনার অল্পদিন পরেই, রেলকর্ম্মচারীরা ফাঁদ পেতে তাকে বন্দী করে। দিনকতক খাঁচার ভিতরে পূরে তাকে জীবন্ত অবস্থায় সকলের সামনে রেখে দেখানো হয়। তারপর তার পশুলীলা সাঙ্গ হয় বন্দুকের গুলিতে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বাঘিনীর মেয়ে

আজ একটি গল্প শোনো। রূপকথা নয়, সত্য কথা।

মেদিনীপুরের সীমান্তে একটি জায়গা আছে, সেখানে অনেক টোডা বাস করে। টোডারা হচ্ছে কোল ভিল সাঁওতালদের মতন অসভ্য।

এই টোডার দল প্রায়ই গভীর জঙ্গলের ভিতরে কাঠ কাটতে যায়। সে জঙ্গলের ভিতরে মানুষ থাকে না, থাকে শুধু বাঘ, ভাল্লুক, বরাহ আর হরিণের পাল।

একদিন তারা কাঠ কাটছে, এমন সময়ে হঠাৎ এক অদ্ভুত দৃশ্য তাদের চোখের সামনে জেগে উঠল! খানিক তফাতেই রয়েছে মস্ত বড়, একটা উইঢিবি, তার

পূর্ব্বে বিখ্যাত সিংহ-শিকারী প্যাটার্সন সাহেবের গ্রন্থ থেকে উপরের ঘটনাটি সংগৃহীত হয়েছে।

কিন্তু মেয়েদুটি তা চুপ ক'রে সয়ে থাকত না, ছুটে গিয়ে সেই দুষ্ট বালক বালিকাদের সর্ব্বাঙ্গ আঁচড়ে ও কামড়ে এমন ভাবে ক্ষতবিক্ষত করে দিত যে, আর কেউ তাদের পিছনে লাগতে ভরসা পেত না!

একদিন একটা খেঁকি নেড়ে-কুকুর পাড়ায় এসে হাজির। তাকে দেখে আর সব ছেলে-মেয়ে ভয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু ঐ কুড়িয়ে-আনা বড় মেয়েটি নির্ভয়ে তার কাছে গেল এবং খানিক পরে কুকুরটার সঙ্গে তার এত বেশী ভাব হল যে, তা আর বলবার নয়! ভূত বা অন্য যে-সব কারণে সাধারণ ছেলে-মেয়েরা ভয় পায়, তারা সে-সব আতঙ্কেরও কোন ধারই ধারত না।

তাদের এই বিচিত্র আচরণের কারণ কি জানো? এই মেয়েদুটি নিশ্চয়ই কোন অসভ্য জাতের ঘরে জন্মেছিল। কিন্তু খুব অল্পবয়সে নেকড়ে-বাঘ এদের চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। হয়তো বাঘিনীর বাচ্চা অসময়ে মারা যায়, তাই সে এদের প্রাণে না মেরে নিজের ছানার মতই মানুষ করেছিল। কিংবা অন্য যে কারণেই হোক, বাঘিনী এদের হত্যা করে নি। তবে এরা যে বাঘের ঘরেই পালিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে আর কোনই সন্দেহ নেই।

বছর দুই পরেই ছোট মেয়েটি অসুখে মারা পড়ে। বড় মেয়েটির বয়স এখন প্রায় চৌদ্দ বৎসর। তার নাম রাখা হয়েছে কমলা। এখন সে জামা-কাপড়ও পরে, অল্পস্বল্প কথাবার্ত্তাও কইতে পারে। মিঃ সিংহ ও তাঁর সহধর্ম্মিণীর যত্নে আর চেষ্টায় কমলা এখন প্রায় সাধারণ মানুষের মতই হয়ে উঠেছে। আরো কিছুকাল পরে নেকড়ে, মায়ের শিক্ষা যে সে সম্পূর্ণরূপেই ভুলে যেতে পারবে, একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর নানাদেশে একটা প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, নেকড়ে-বাঘরা মানুষের শিশু পালন করে। প্রবাদ আছে, যাঁর নামে প্রাচীন রোমের নামকরণ হয়েছে, তিনিও নেকড়ে-বাঘের দ্বারা লালিত পালিত হয়েছিলেন।

ভারতে আরও কতকগুলি নেকড়ে-পালিত শিশুর ইতিহাস শোনা যায়।

অনেক বৎসর আগে ডা. ভ্যালেনটাইন নামে আগ্রা সহরের এক মিসনারি সাহেব নেকড়ে-বাঘের গর্ত্তে একটি দশ বারো বৎসরের বালককে পেয়েছিলেন। বালকটি পরে বড় হয়েও কিন্তু কথাবার্ত্তা কইতে শেখে নি। বৎসর-কয়েক আগে তার মৃত্যু হয়েছে।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে রেওয়ার রাজ্যে এই রকম আর একটি যুবকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এমনি আরো অনেক গল্প আছে।

বিলাতের বিখ্যাত পশুতত্ত্ববাদ প্রফেসর জুলিয়ান এম, হক্সলি সাহেবের মতে, এ রকম ব্যাপার অসম্ভব নয়। বাচ্চা মারা গেলে পর শোকাতুরা নেকড়ে-মায়ের পক্ষে মানুষের শিশু পালন করা অস্বাভাবিক বলা যায় না।

যাঁরা এই ব্যাপারটাকে গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতে চান, তাঁরা মেদিনীপুরে গিয়ে কমলাকে দেখে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে আসতে পারেন। কমলার কাহিনী এ সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ দূর করে দিয়েছে। আমরা এখানে কমলার একখানি ফটো দিলুম।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়
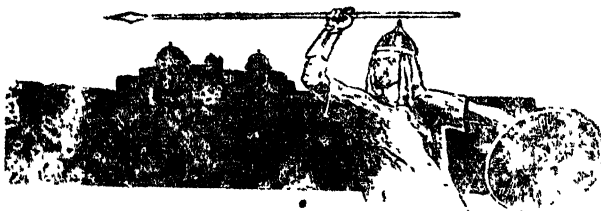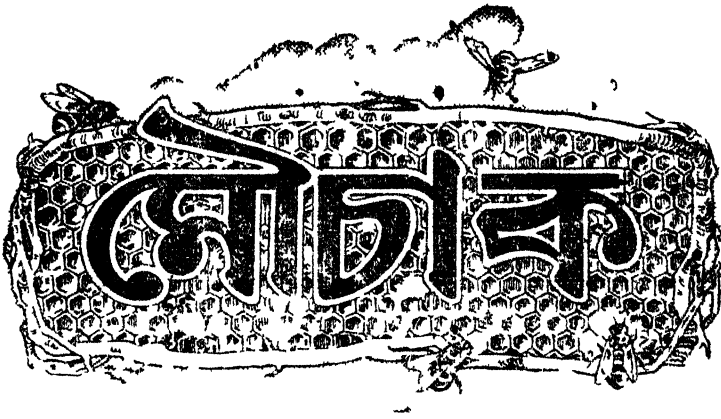
৭ম বর্ষ । পৌষ, ১৩৩৩ । নবম সংখ্যা

খোকার স্বপন

খোকন মনি ঘুমালো

খেয়ে মায়ের চুমালো

*　　　*　　　*

স্বপন তরী বায় খোকনে স্বপন রাজার দেশ
রাজকন্যা থাকেন সেথা কাজল পারা কেশ।
কঁচ-পারা রং তার কাজল পারা কেশ
রাজকন্যা আলো করেন স্বপন রাজার দেশ।
ঘুম নদীতে স্বপনতরী, আমার যাদু বায়
সোনার খাটে রাজকন্যা, টনক লাগে তায়।
পাল খাটান তরী আসে, ঐ যে দেখা যায়
রাজকন্যা জানলা খুলি দেখেন বসি তায়।

ম' বলে এরা কারো
এরা গোলামের মতো
খাটে যে পাঁচ-ছ-
র গোলাম থাকে।

স্বপনতরী লাগল এসে রাজকন্যার ঘাটে
রাজকন্যা প্রাসাদ ছাড়ি নেমে এলেন বাটে।
রাজকন্যা বাটে নেমে ঘাটের পানে যান
হাতে রেখে ফুলের মালা, কণ্ঠে নিয়ে গান।
রাজকন্যা করেন গান, খোকন মণি শোনে
যাদু আমার বর হইল, রাজকন্যা ক'নে।
রাজকন্যা মালা দিল খোকন সোণার গলে
বরকনেকে নিয়ে তরী ঘরের পানে চলে।

* *

এমন সময় ঘুম ভাঙ্গিল খোকনমণি কাঁদে
রাজকন্যা গেল কোথায় ফেলে সোণার চাঁদে ?
কেঁদোনা চাঁদ এই যে আমি কপালে দি চুম
রাজকন্যা ফিরে পাবে আবার এলে ঘুম।

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মৌমাছি

মৌমাছিকে সবাই দেখেছে ফুলে-ফুলে উড়ে মধু খেয়ে বেড়াতে! মৌমাছির [illegible]বঙ্গ বন্ধু ফুল! ফুলের-মধু না হলে মৌমাছির চলে না—মৌমাছি না [illegible]না। ফুলের কাজ ফল-ধরানো—মৌমাছি এসে তার ফল-ধরা-[illegible]য় যায়। তাই মৌমাছির সঙ্গে ফুলের এত ভাব। মৌমাছির [illegible] রং-এর পাপড়ি খুলে দেয়, তার গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়, [illegible] রাখে। মৌমাছি দূর থেকে তার রঙের বাহার দেখে কিংবা [illegible] ছুটে আসে। ফুলের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে মৌমাছি মধু খায়

আর সারা গায়ে ফুলের রেণু মেখে এ-ফুলের রেণু ও-ফুলে মিশিয়ে বেড়ায়। মৌমাছিদের কাছ থেকে এই রেণু-মিশিয়ে দেবার কাজ টুকু পেলে ফুলেরা সন্তুষ্ট,—ফুলেরা তখন ফল ধরাবার কাজ আরম্ভ করে দেয়।

আশ্চর্য্য এই, যে, যেখানে দু'তিন রকম ফুল ফুটে থাকে সেখানে মৌমাছি প্রথমে এসে যে ফুলে বসল বরাবর সে সেই জাতের ফুলেরই মধু খাবে, যতক্ষণ না সব মধু শেষ হয়ে যায়। যেমন ধর, এক জায়গায় টগর, গাঁদা আর করবী ফুল আছে। মৌমাছি উড়তে-উড়তে এসে গাঁদা ফুলে বসল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সেখানকার সব গাঁদার মধু যতক্ষণ না শেষ হয়ে যায় ততক্ষণ সে অন্য ফুলে বসবেই না। গাঁদা শেষ হলে যদি সে টগরে বসল তো সব টগর শেষ না হলে করবীর কাছ দিয়েও যাবে না। এতে ফুলদের সুবিধে এই হয় যে এক জাতের ফুলের পরাগ অন্য জাতের ফুলে মিশে শুধু শুধু নষ্ট হয়ে যায় না—বরং সেই জাতের ফুলেই মিশে তার ফল ধরাবার কাজ করিয়ে দেয়।

মৌমাছিদের সব কাজের মধ্যেই খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। মৌচাক গড়ার কাজ থেকে আরম্ভ করে বাচ্চাদের মানুষ করে তোলা অবধি সব কাজে এরা সমান পটু। মৌমাছিদের মধ্যে তিনটে ভাগ আছে—

১। বাবু। (পুরুষ মৌমাছি) এঁরা ভারি কুঁড়ে—কোন কাজ করেন না—খালি বসে বসে খান।

২। বিবি। (স্ত্রী মৌমাছি) এঁদের কাজ খালি ডিম-পাড়া।

৩। গোলাম (নপুংসক মৌমাছি) ডিম-পাড়া ছাড়া মৌচাকের আর সব কাজ এঁরাই করেন।

গোলাম আর বাবু-মৌমাছি

গোলামরা সব চেয়ে ছোট মৌমাছি। এদের নাম 'গোলাম' বলে এরা কারো কেনা-গোলাম নয়। বরং এরাই চাকের হর্ত্তা-কর্ত্তা! তবে এরা গোলামের মতো কেবলই খাটে বলে এদের 'গোলাম' বলা হয়। এরা এত ভীষণ খাটে যে পাঁচ-ছ-মাসের বেশী বাঁচে না। এক একটা চাকে অনেক হাজার হাজার গোলাম থাকে।

এদের কারো চুপচাপ বসে থাকবার যো নেই। কোনো গোলাম অলস হয়ে পড়লে অন্য গোলামরা তাকে মেরে ফেলে। এদের, কেউ ফুল থেকে মধু এনে ক্রমাগত চাকে জমা করে চলেছে, কেউ ফুলের পরাগ আনছে, কেউ পায়ের থলিতে করে জল আনছে, কেউ বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে, কেউ মৌচাক গড়ছে—সবাই কাজে ব্যস্ত! এই সব কাজে এদের কোন গোলমাল নেই—কে জল আনবে, কে মধু আনবে, কে চাক গড়বে আর কে বাচ্চাদের খাওয়াবে তা ঠিক করবার জন্যে মৌমাছিদের সভা আহ্বান করতে হয় না, কিন্তু কি জানি কেমন করে আপনা-আপনিই এদের সব বন্দোবস্ত হয়ে যায়।

বাবু-মৌমাছিরা গোলামদের চেয়ে কিছু বড়। এদের হুল নেই। এদের ধরে নির্ভয়ে হাতের তেলোয় বসান যেতে পারে। এরা মধু-সংগ্রহ করতেও জানেনা—ভারি বাবু আর ভারি কুঁড়ে। মৌচাকের গোলমাল কাজকর্ম্ম এদের একেবারেই ভাল লাগে না বলে এরা এক একটি কোনের ঘর বেছে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। দুপুর বেলা খাবার সময় হলে ভাঁড়ার থেকে এক পেট মধু খেয়ে চাক থেকে কিছু দূরে উড়ে গিয়ে ফুলের উপর সারা-দুপুরটা রোদে কাটিয়ে দেয়। সন্ধ্যা হলেই চাকে ফিরে আসে। খুব রোদ না হলে এরা চাক ছেড়ে বেরয় না।

চিরকালই যে গোলামরা বাবুদের এই রকম বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ায় তা নয়। বাবুরা একলা চারজন গোলামের সমান খাবার খায়। গোলামরা এটা স্পষ্টই বুঝতে পারে যে এই রকম হারে বাবুরা খেয়ে চল্লে শীতকালের জন্যে তাদের আর মধু জমানো চলবে না। তাই তারা শরৎকাল এলেই বাবুদের চাক থেকে নির্দ্দয় ভাবে দূর করে দিয়ে শীতকালের জন্যে মধু জমাতে আরম্ভ করে দেয়। বাবু-বেচারাদের হুল নেই যে বাধা দেবে—বাধ্য হয়ে চাক ছাড়তে হয়; ফুল থেকে মধু খেতে জানে না—না খেতে পেয়ে মরে যায়! কেউ-কেউ আবার চাকে ফিরে আসে। কিন্তু প্রহরীদের চোখে পড়লে তাদের আর প্রাণ নিয়ে পালাতেও হয় না। এই সময় মধু জমাবার জন্যে গোলামরা এত ব্যস্ত হয় যে যে-সব ডিম থেকে গোলাম মৌমাছি জন্মাবে কেবল সেইগুলি রেখে বাঁকি সব ডিম নষ্ট করে ফেলে।

জন্ম

মৌমাছির ডিম দু'রকম-এর। এক রকম ডিম থেকে গোলাম, এক রকম থেকে বাবু জন্মায়। গোলামেরা কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে কোন ডিম গোলামের, কোন ডিম বাবুর। তারা দু-রকম ডিম আলাদা-আলাদা সাজিয়ে রাখে।

ডিম তিন চার দিন খোপে পড়ে থাক্‌বার পর ডিম ফুটে কীড়া বার হয়। তখন গোলামেরা কীড়াদের এক রকম রস (Chyle food) খাওয়ায়; এই রস, মধু খেলে গোলামদের গা দিয়ে বেরয়। গোলামেরা বাচ্চাদের জন্য এই রস মৌচাকের খোপে জমিয়ে রাখে। ন' দশ দিন এই রস খেয়ে কীড়া যখন বেশ বড় হয়ে ওঠে, তখন গোলামরা মোম দিয়ে খোপের মুখ ঢেকে বন্ধ করে দেয়। কীড়ারা খোপের মধ্যে গুটি বেঁধে চুপচাপ আরও ন'দশ দিন বসে থাকে। তারপর তারা গুটি ছিঁড়ে মোমের ঢাক্‌নি কেটে বেরিয়ে আসে। গোলামেরা বেরিয়েই কাজ করতে আরম্ভ করে দেয়—তাদের কোন কাজ শিখতে হয়না, জন্মে অবধি সব কাজেই তারা পাকা। আর বাবুরা খোপ থেকে বেরিয়েই তাদের বাক্ষুসে খাওয়া আরম্ভ করে। ডিম থেকে মৌমাছি জন্মাতে একুশ দিন লাগে।

বিবি-মৌমাছি

বিবি-মৌমাছি আকারে সব মৌমাছির চেয়ে বড়। ডিমপাড়া ছাড়া এঁর কোন কাজ নেই। এক রাজ্যে যেমন দুই রাজা থাকে না, এক চাকে তেমনি দুই বিবি এসে জুটলে দুয়ে মিলে মহা ঝগড়া সুরু করে। তাদের একজন না মরলে বা না পালালে শান্তি নেই! সেই জন্যে প্রত্যেক মৌচাকে একটি করে 'বিবি' থাকেন। ইনি নামে 'বিবি' হলেও সব সময় এঁকে গোলামদের কথা মেনে চলতে হয়। তবে এঁকে "মা মৌমাছি" বলা চলে, কারণ সমস্ত চাকের জননী হচ্ছে ইনি। গোলামেরা বিবিকে খাওয়ার দাওয়ায়। বিবির সঙ্গে ছ' সাতজন গোলাম সারাক্ষণ ঘোরে। তারাই দরকার মত বিবির সব কাজ করে। ডিম পাড়বার সময় হলে বিবি গোলামদের কথামত মৌচাকের খোপে-খোপে ডিম পেড়ে চলেন—দিনের পর দিন,

রাতের পর রাত। এই সময় বিবি একটুও ঘুমোন না, রোজ প্রায় তিন হাজার করে ডিম পাড়েন।

ডিম পেড়ে বিবি আঠাল একটা জিনিস দিয়ে ডিমকে খোপের সঙ্গে এঁটে দিয়ে যান—যাতে না পড়ে যায়। বিবি ডিম পেড়ে চলে যান, ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা করে তাদের লালন-পালন করবার ভার থাকে গোলামদের উপর; বিবি একবার ফিরেও চান না বাচ্চাদের দিকে! আগেই বলেছি মৌমাছির ডিম দু রকমের—যা থেকে বাবু মৌমাছি আর গোলাম মৌমাছি জন্মায়। কিন্তু তাহলে বিবি জন্মান কোথা থেকে? সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার!

বাবু-মৌমাছি যে ডিম থেকে জন্মায় বিবিও জন্মান সেই ডিম থেকে—কেবল গোলামদের কায়দায়। গোলামরা যখন বিবি জন্মাবার ইচ্ছে করে তারা মৌচাকে বড় বড় তিন চারটে বিবির ঘর করে রাখে। তারপর প্রত্যেক বিবির খোপে একটা করে বাবু-মৌমাছির ডিম রেখে দেয়। ডিম ফুটে কীড়া বার হলে আগের মতো তাকে রস (Chyle food) খাওয়ানো হয় না—তারা এক রকম খুব ভাল খাবার খেতে পায়, তার নাম 'Royal jelly'। গোলামেরা যাদের বিবি করে তোলে তারাই কেবল এই খাবার খেতে পায়—আর কেউ নয়। এই টুকু খাওয়ার তফাতে কীড়া সাধারণ মৌমাছির চেয়েও বড় হয়ে ওঠে। তখন গোলামেরা খোপের মুখ মোম দিয়ে বন্ধ করে দেয়। ভিতরে কীড়া গুটি বাঁধে, গুটি কাটে; তারপর যখন বেরিয়ে আসে তাকে চেনবার যো থাকে না—ততদিনে সে একটি ছোট্ট 'খাট্টি বিবি' হয়ে পড়েছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সৈনিক বালক

(ব্রাউনিং অবলম্বনে)

ফরাসী সৈন্য শত্রু দুর্গ করিল আক্রমণ,
উচ্চভূমিতে দাঁড়ায়ে অদূরে সাহসী নেপোলিয়ন।
পশ্চাতে কর মুষ্ঠিবদ্ধ " বিস্তৃত পদদ্বয়,
কল্পনা কর বীরের মূর্ত্তি যে আকৃতি মনে লয়।
বিরাট বক্ষ উৎসাহে ভরা নাহিক ভয়ের লেশ,
চিন্তার ভারে প্রপীড়িত ভাল আনমিত গ্রীবাদেশ।

চিন্তিত বীর সেনাপতি যদি আজিকার রণে টলে,
দুর্জ্জয় তাঁর বিজয় লিপ্সা লুটাইবে ভূমিতলে।
কামানের ধূমে দশদিক আজি করিল অন্ধকার,
সে আঁধার ভেদি বাহিরিল এক তরুণ ঘোড় সোয়ার।
উল্কার বেগে আসিছে বালক ছোটে ঘোড়া প্রাণপণ,
থামিল আসিয়া সম্রাট যেথা সাহসী নেপোলিয়ন।

পলক ফেলিতে নামিল ভূমিতে আনন্দে হাসিমুখ,
বয়সে বালক হলেও তাহার সাহসেতে ভরা বুক।
ঠোটে ঠোঁট চাপি দাঁড়াল বালক ঘোড়ার কেশর ধরি,
শোণিত ঝলক বাহিরায় পাছে মুখেতে উঠিছে ভরি।
একবার যদি চাহ তার পানে দেখিবে বক্ষ তার
কামানের গোলা চূর্ণিয়া গেছে নিঙাড়ি রক্তধার।
কহিল বালক, "দেবতার কৃপা, সম্রাট নাহি ভয়,
শত্রু দুর্গ আপনার তরে করিয়াছি মোরা জয়।

বিজয় পতাকা পুঁতিয়াছি নিজে, তৃপ্ত আমার প্রাণ,
সেনাপতি করে তব প্রতীক্ষা. নির্ভয়ে সেথা যান।”
এ বারতা শুনি বীরের নেত্রে ঠিকরিল কত শত
বিশ্বজয়ের দীপ্ত বাসনা বহ্নি শিখার মত।

বীরেব নেত্র জ্বলিয়া উঠিল শুধু ক্ষণেকের তরে,
চকিতে সে তেজ নিভিল, নয়নে অশ্রুবিন্দু ঝরে।
“আহা বাছা তুমি আহত হয়েছ ?” সম্রাট তারে কয় ;
বীরের গর্ব্বে লাগিল আঘাত এও কি সহ্য হয়।
“আহত হইনি, প্রাণ দিনু আমি।” হাসিমুখে এত বলি
প্রভুর পার্শ্বে প্রাণ হীন দেহে ভূমিতে পড়িল ঢলি’।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

“পদ্মের জন্ম কাহিনী’

(১)

তারা সাত বোন ছিল, সাত পরী—অপরূপ সুন্দরী। ভোর হতে না হতেই তারা রূপসাগরের তীরে নাইতে আস্‌ত। কত হাস্‌ত, খেল্‌ত, আনন্দের হাট বসিয়ে দিত সেখানে। তাদের মধ্যে রূপে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেছিল ছোট বোন চন্দনা। তার হাতের সঙ্গে আটকানো যে পাখা দুটী ছিল, আশ্চর্য্য তার রং, বাহারও তেম্‌নি।

সে যখন জলের সঙ্গে সঙ্গে উঠে নেমে ঢেউয়ের তালে তালে সাঁতার কাটত তখন মাছেরা তাকে জলদেবী বলে মনে করত। তার সাঁতারের লীলা দেখে মরালেরাও লজ্জা পেত।

আকাশে শুকতারা থাক্‌তে থাক্‌তেই তারা আস্‌ত, আবার ভোরের আলো পৃথিবীর বুকে ভাল করে ছড়িয়ে পড়বার আগেই চলে যেত! কিন্তু চন্দনা এই পৃথিবীকে খুব ভালবেসে ছিল তাই তাকে নিয়ে যাবার জন্যে অনেক টানাটানি করতে হত তার বোনদের। তাদের নাকি অভিশাপ ছিল, পৃথিবীর কোন রূপবান পুরুষকে ভাল-বাসলে আর তাদের ফিরে যাবার শক্তি থাকবে না। তাই তারা নিজেদের প্রকাশ করতে চাইত না। পৃথিবীর মানুষেরা চোখ মেলবার আগে তারা চলে যেতে চাইত,—চন্দনার মিনতি গ্রাহ্য করত না। কিন্তু হায়, এত সাবধান হয়েও চন্দনাকে ভালবাসার বাঁধনে পড়তে হল।

(২)

জল-রাজকুমার বরুণ মাছে টানা প্রবাল গাঁথা রথে রোজ ভ্রমণে বেরুতেন। মাঝে মাঝে রথ থেকে নেমে নীল জলে ভাস্‌তেন তাঁর মুক্তো গাঁথা পোষাক জলের ভিতর ঝিক্‌মিক্ করত। জলের উপর চন্দনার স্নানলীলা সেদিন তাঁর চোখে পড়ল। তিনি মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন, চোখের পলক পড়ল না।

পরদিন আবার বরুণ বেড়াতে বেরিয়েছেন। চন্দনা সাঁতার দিতে দিতে একটু বেশী দূরেই এসে পড়েছিল। বরুণের দিকে চোখ পড়তেই সে অবাক্ হয়ে চাইলে, চোখ ফেরাতে পারলে না। এমন স্নিগ্ধদৃষ্টি তরুণ কান্তি সে কখনও দেখেনি। বরুণও দেখলেন সেই অপরূপ নীলনয়না কিশোরী। দুজনেরই পলকহীন দৃষ্টি এক হয়ে মিলে গেল। কতক্ষণ এমনি করে কেটে গেল, তারা জান্‌তে পারলে না। চন্দনার চমক্ ভাঙল তার বোনেদের ডাকে, "চন্দনা ফিরে আয়, শুকতারা নিভে এল।'

সে জলের উপর ঢেউ তুলে ফিরে চল্‌ল।

(৩)

চন্দনা সে দৃষ্টির মোহ এড়াতে পারলে না। রোজই তাদের সেখানে দেখা হত। কোন কথাই তাদের মুখে ফুটত না, পলকহীন চোখের চাওনিই নীরব ভাষায়

তাদের মনের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ত। চন্দনার শত চেষ্টাতেও সে নাগপাশের মত ভালবাসার শক্ত বাঁধন ছিঁড়তে পারছিল না।

একদিন চন্দনা দেখলে তার অমন রঙান পাখা দুটা জলের উপর খসে পড়ল। বুঝলে, কি কঠিন বাঁধনে সে বাঁধা পড়েছে। একবার সে খসে পড়া পাখাদুটির দিকে আর একবার তার বোনেদের মুখের দিকে করুণ চোখে চাইল। চন্দনার দিকে চেয়ে তারা শিউরে উঠল। কিছু বলতে পারলে না, সকলে তাকে বুকের ভিতর টেনে নিলে। তাদের অশ্রুধারা চন্দনার বুকে মাথায় অবিশ্রান্ত ঝরতে লাগল।

মাছেরা তাদের সাত বোনের নিত্যকার হাসি খেলার বদলে এই করুণ ব্যাপার দেখে, তাদের ঘিরে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল। একটা নীলমাছ তাদের অভিশাপের কথা জানত, সে সব বুঝতে পেরে ভিড় ঠেলে ছুটে গেল বরুণ রাজকুমারের কাছে। তিনি সব শুনে চন্দনাকে আনবার জন্যে নীলমাছের সঙ্গে এগিয়ে এলেন। চন্দনার বোনেরা ততক্ষণে চলে গিয়েছিল। সে তখন নীলজলের উপর একরাশ কালচুল ছড়িয়ে ফুলে ফুলে অঝোরে কাঁদছিল।

বরুণ রাজকুমারের চোখে আনন্দ ফুটে উঠছিল, চন্দনাকে পাওয়ার সৌভাগ্যে। কিন্তু চন্দনাকে কাঁদতে দেখে তাঁর ব্যথাও যে লাগেনি তা নয়। তিনি এগিয়ে এসে চন্দনাকে আদর করে প্রবাল রথে তুলে নিলেন। তার কান্না কিন্তু তখনও থামে নি।

(৪)

এমনি করে বছর দুই কেটে গেল। চন্দনা খুব সুখী হয়ে ছিল। সে রোজই রাত থাকতেই গিয়ে তার বোনেদের সঙ্গে দেখা করত। আগের মতই হাসত, খেলত, নীল জলে সাঁতার কেটে বেড়াত। তার আনন্দ বেড়েই ছিল। বোনেরাও তার সুখে সুখী হয়েছিল। তারা যতক্ষণ থাকত, চন্দনাও তাদের কাছেই থাকত; বোনেরা চলে গেলে, মাছে টানা রথে চড়ে বরুণকুমারের প্রবাল-প্রাসাদে ফিরে যেত।

খুব সুখেই সে ছিল, কিন্তু এত সুখ তার সইল না। দুঃখের কাল মেঘ তাকে ছেয়ে ফেল্ল, যে দিন এক সুন্দরী জলকুমারী এসে তার সিংহাসন অধিকার করে

বসল। আর সে সইতে পারল না। বুক তার ভেঙে পড়ল। সুখের স্বপ্ন তার ভেঙে গেল।

যেখানে বরুণ রাজকুমারের সঙ্গে তার প্রথম শুভদৃষ্টি হয়েছিল সেখানে ফিরে এল সে। তাদের সাত বোনের বেড়াবার জায়গাটা একবার দেখলে। মাছেরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল, তাদের দুঃখ জানাতে। চন্দ্রা ধীরে ধীরে সেই নীল জলের উপর শুয়ে পড়ল। মেঘের মত কালো চুল তার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে তাকে ঢেকে দিল।

(৫)

রূপসাগরের নীল জলে একদিন একটা সুন্দর ফুল ফুটে উঠল। মুখখানি তার আকাশের পানে পাপড়ি মেলে চেয়ে রইত কিন্তু বৃন্তটি—তারি জলের নীচে মাটির বাঁধনেই বাঁধা রইল। —ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই ফুটত দিনের আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পাপড়িগুলি বন্ধ করে নিত।

তারপর রোজই তেমনি সময়ে ছ'টি সুন্দরী তরুণী রূপসাগরের নীল জলের উপর, কোমল পায়ের আঘাত করতে করতে এসে ফুলটির চারিধারে ভাসত। ফুলেরই মত মুখগুলি তাদের নত করে চোখের ধারায় ফুলটিকে তারা ধুইয়ে দিত। ফুলটিও দুলে দুলে উঠত।

সেই ফুলটিকেই মানুষে সব ফুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়ে বরণ করেছে—
তার নাম দিয়েছে "পদ্ম"।

শ্রীসুনীরা দেবী
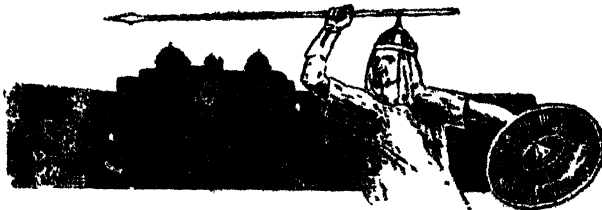
'কার জিৎ

শ্রাবণ মাস। জন্মাষ্টমার দু দিন মাত্র ছুটী। কি করা যায়? রোজকার নিয়মেই যদি ওঠা বসা করি তাহলে আর ছুটী কি হল। কিন্তু প্রকৃতি দেবী আমাদের সঙ্গে বাদ সেধেছেন। যেই দেখেছেন আমাদের সেই আনন্দের ছুটীর দিনটি এসেছে অমনি কি আর সইতে পাবেন? আকাশের যেন মাথা ভেঙ্গে পড়ল। কি ঘোর বর্ষা! চারিদিক অন্ধকার কোরে স্তরে স্তরে কালো মেঘ এসে জমতে লাগল। রাস্তা, মাঠ, ঘাট জলে ভরে গেল। কেন, আমরা কি মেঘের সঙ্গে আড়ি করেছি না তাদের আমোদে যোগ দিতে দিই নি! তাই এত আক্রোশ। আমরা কি বর্ষা-মঙ্গল করিনি? তা ছাড়া বৃষ্টির ধারা যখন ঘন হয়ে নেমে আসে আর তাদের ছাঁট গুলি আনন্দে দিশে হারিয়ে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে তখন কি আমরা তাদের সেই খেলায় যোগ দিতে যখন তখন বেরিয়ে কেয়াবনে, পারুলবনে যাইনি? আমরা সকলে ঘরে জড় হয়ে বসে সাঁতলা ভাজা খেয়ে, গল্প করে, গান গেয়ে বেশ আরামেই কাটিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু না, তা হবেনা। মেঘই যখন আমাদের উপর দরদ দেখালেন না তখন আমরাই না তাকে কেন আমাদের এই আনন্দে ডেকে নেব? বৃষ্টি মানব না।

কোথাও বেড়াতে যাওয়া যাক্। আমরা কয়েকজন সঙ্গী মিলে পরামর্শ করতে লাগলাম কি করে বৃষ্টিকে পরাস্ত করা যায়! শেষে ঠিক হল কোলকাতা যাব। কোথাও আর বৃষ্টিতে ভিজে হাঁটতে হবে না। গাড়ীতে গাড়ীতে যাওয়া যাবে। আমরা চার পাঁচজন ছাড়া কেউ আর যেতে রাজী হলেন না। ভয় কি? এখন মেয়েরা ত অনেকেই একা চলা ফেরা করেন। অনেকে ত জাহাজে করে বিলেতেও যান, এত কোলকাতা।

এই প্রস্তাবে ঠাকুরমা ভীত হলেন, কিন্তু বাবার খুব উৎসাহ। তিনি বল্লেন "ভয় কি? ওখানে পিসিমার বাড়ী উঠবে। সেখানকার ঠিকানাত মনেই আছে, আবার না হয় লিখে নিয়েই যাবে। হাওড়ায় নেবে সোজা ট্যাক্সি করে যাবে।"

যাক্ মহানন্দে রওনা হওয়া গেল। হরি! হরি! ধোবার বাড়ীর কাছে এসেই মোটরের চাকা কাদায় বসে গিয়ে গাড়ী কাৎ হয়ে পড়ল। গাড়ী আর চলেনা। ঠেলাঠেলি চলতে লাগল। লোকগুলি বৃষ্টিতে ভিজে সারা হয়ে গেল। দুঃখ হতে লাগল কিন্তু উপায় নেই। ট্রেণের সময় হয়ে এসেছে। হার মানব? যাক্ অতি কষ্টে উদ্ধার পেয়ে কোন রকমে ছাতি মাথায় দিয়ে জুতা খুলে হাতে নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে গাড়ী ধরলাম। তার পরে বেশ মজা! গাড়ীর সব শার্শী বন্ধ করা গেল। সবই হ'ল, কিন্তু দুরাদৃষ্ট! পয়সা ত বেশী খরচ করতে পারব না। থার্ড ক্লাশ গাড়ীর ছাদের ফাঁক পেয়ে বর্ষার ধারা আবার আমাদের সঙ্গে ঝগড়া লাগতে এল। কি করা যায়? নিরুপায়। একবার ওধার থেকে এধারে যাচ্ছি আরেকবার এধার থেকে ওধারে যাচ্ছি। বর্দ্ধমানে যে ডালমুট কিনে খাব সে সাহসও হল না। ছাদের ফাঁকেই এত! দরজা খুললে ত রক্ষাই থাকবে না।

হাওড়ায় নেবে বিজয় গর্ব্বে একটা ট্যাক্সি করে চড়ে বসলাম। যে বৃষ্টি, বাবা! ড্রাইভার বল্লে "কোথায় যেতে হবে?" ঠিকানা ত মুখস্তই আছে, কাজেই ফস্ করে বল্লাম "কাশী ঘোষের ষ্ট্রীট। চল নম্বর বলে দিচ্ছি।" কাগজ খানা দেখেই নম্বর বলা ভাল। হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে পারব বলে হাল্কা বেতের জাপানী বাস্কেটে দু এক খানা কাপড় ইত্যাদি নিয়ে চলেছিলাম। খুলে দেখি কাপড়গুলি ভিজে সুট সুট করছে। আর কাগজ খানার ত কথাই নেই। ভাঁজ খুলে পড়তে চেষ্টা করছি কিন্তু অক্ষরগুলি ঝাপসা হয়ে গেছে। গাড়ীর পর্দ্দা ফেলা। অন্ধকারে হয়ত দেখা যাচ্ছেনা মনে করে পর্দ্দা একটু ফাঁক করে কাগজটা আলোতে একটু খুলে ধরেছি অমনি এক ঝাপটা বৃষ্টি এসে কাগজটার উপর দিয়ে বয়ে গেল। যাঃ, যেটুকু বোঝা যেত সেটুকুও গেল। সকলেই এক একবার হাতে নিয়ে ঠিক করল ৮।১ হবে। নিঃসন্দেহ হবার জন্য আবার কাগজটা যেই হাতে নিয়েছি অমনি একটা দমকা হাওয়া এসে কাগজটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। আমার যেন মনে হল ৪৭।বি আর লেখায় মনে হচ্ছে ৮।১। সকলেই বলতে লাগল ঐ ৮।১ই হবে আর একজন বল্লে এই ঠিকানাতেই আমি পিসিমাকে চিঠি লিখতে

দেখেছি। যাক্ মন নিশ্চিন্ত হল। হাসিমুখে সবাই মোটরে হুহু করে ছুটতে লাগলাম।

বৃষ্টির জন্যে হ্যারিসন রোডের ট্রামগুলি দেখি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার গাড়ীগুলো জল ছিটিয়ে চলছে। মোটরে আছি বলে আমাদের বেশী কষ্ট করতে হচ্ছেনা। মনে আনন্দ হচ্ছে যে পিশিমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। গাড়ী এসে বাড়ীর সামনে লাগল। দেখলাম দোতলায় পিশিমা বসে আছেন। কিন্তু সে কি জল! তাদের বাড়ীর সামনে মাঠটুকু জলে ডুবে রয়েছে। সেটা পার হয়ে বাড়ীতে ঢুকতে হবে। কি ভাগ্যে তখন একটু বৃষ্টি ধরেছিল। ছপ ছপ করতে করতে বাড়ীতে ঢুকে পড়লাম। ভিতর বারান্দায় একটা মাদুর বিছান। তাতে একটী ছোট ছেলে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। একটা ঝি কল তলায় বসে মেশান ডাল চাল ধুচ্চে আর কি কি কাজ তাকে করতে হবে তাই নিয়ে নিজের মনে বক্-বক্ করছে। একজন গিন্নী ভাঁড়ার থেকে মশলা বার কচ্ছেন আর ভুনি খিচুড়ী কি করে করতে হবে তার উপদেশ দিচ্ছেন।

আমাদের দিকে চোখ পড়াতে তাঁরও যে রকম চোখের অবস্থা হল আমাদেরও ঠিক সে রকমই হ'ল। ইনি কে? পিশিমার বাড়াতে ত এঁকে দেখিনি। দুটী-একটী ছেলে-মেয়ে এসে দাঁড়াল। আমরা ত অবাক। এ কার বাড়ী এলাম? আমরা এ ওর মুখ চাওয়া-চাওই করছি, এমন সময় গিন্নী বল্লেন, "বাছা, তোমরা কোথা থেকে এমন ভিজে এলে? কাকে চাও?"

আমরা সব ব্যাপার বল্লাম। সব শুনে আর আমাদের ভীত চেহারা দেখে বল্লেন, 'ভয় কোরনা, ভিজে কাপড় গুলো ছেড়ে ফেলে কিছু খেয়ে নাও। খিচুড়ীতো তৈরী হচ্ছে, আমরা সব ঠিক করে দেব।" তাঁর সেই সস্নেহ ব্যবহার পেয়ে অনেকটা সামলে নিয়ে বসলাম। আর মনে মনে খুব রাগ হল। এমনি করেই কি অপ্রস্তুত করতে হয়!

যাক অনেক দুঃখের পরে যখন বাড়ী পৌঁছন গেল তখনও ঠিক বোঝা গেল না বর্ষারই জিৎ কি আমাদেরই জিৎ।

শ্রীমমতা সেন
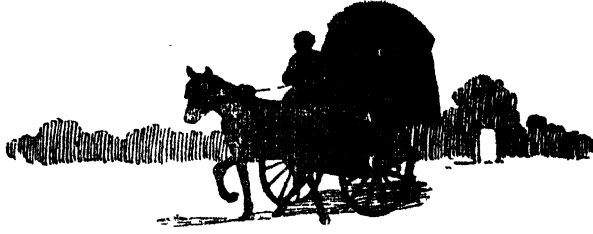
সবুজ পাখী

আজ প্রভাতে গাছের শিরে
কণক চাঁপা রোদ্দুর,
ওরে আমার সবুজ পাখী
যাবি রে তুই কদ্দুর ?
কোন্ বনানীর ধারে ধাবে,
শিশির ভেজা নদীর পাড়ে,
কোন্ সে বিজন বালুর চরে,
বাজাবি আজ কোন্ সুর !
ওরে আমার সবুজ পাখী
যাবি রে তুই কদ্দুর ?

দিনের মাঝে মাথার উপর
প্রখর হবে সূর্য্য,
নিদয় প্রাণে বাজাবে সে
আপন বিজয় তূর্য্য ;
তখনও নীল গগন ছেড়ে
ফিরবি না কি আপন নীড়ে,
বল্ উধাও হবি কোন্ সুদূরে,
কোথায় এত ধৈর্য্য !
দিনের মাঝে মাথার উপর
প্রখর হবে সূর্য্য ।

সিন্ধুপারের সন্ধ্যাকাশে
সিঁদুর-রাঙ্গা চিত্র,
সকল জ্বালা দেয় ভুলিয়ে
শত্রু যে হয় মিত্র।
তোর বেলাশেষের গানে গানে,
সেথা জাগবে পুলক প্রাণে প্রাণে,
সজল হবে ক্ষণে ক্ষণে,
গগনের অরুণ-কোমল নেত্র,
সিন্ধু পারের সন্ধ্যাকাশে
সিঁদুর-রাঙ্গা চিত্র।

অবশেষে পথের মাঝে
আসবে নেমে রাত্রি;
ওরে আমার সবুজ পাখী,
কোন্ অচিন্ পথের যাত্রি!
সেথায় সে কোন্ সবুজ ডালে,
তোর সবুজ ডানা পড়বে ঢুলে,
সবুজ প্রাণের গানটী ভুলে,
তোর স্তব্ধ হবে যন্ত্রী;
ওরে আমার সবুজ পাখী
কোন্ অচিন্ পথের যাত্রি!

শ্রীভোলানাথ মিত্র

———

ব্যায়ামবীর লিডারম্যান্

ব্যায়ামচর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা আজকাল এদেশে অনেকে বুঝতে শিখেছে, কিন্তু আমাদের দেশে ব্যায়ামের তত‌টা উন্নতি হয় নাই। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আজকাল শারীরিক চর্চ্চা খুব বেশী রকম হচ্ছে। সেখানে সব পালোয়ানেরা তাদের নিজেদের নিজেদের ব্যায়াম পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই সকল পালোয়ানদের মধ্যে লিডারম্যান অন্যতম। আজ তার কথাই তোমাদের বলব। তিনি এখন একজন বিশ্ববিখ্যাত পালোয়ান, ১৭ বছর বয়স থেকে ব্যায়াম চর্চ্চা আরম্ভ করে এখন পর্য্যন্ত সমানে চলেছেন। তার শরীরে বেশ শক্তি আছে, এবং শক্তিতে তিনি প্রায় স্যাণ্ডোর সমকক্ষ। আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি অনেক জায়গাতে এঁর ছাত্র আছে। তোমরা যদি কেউ এঁর ছাত্র হতে চাও, তবে ২৮ ডলার (অর্থাৎ ৮৭॥০ টাকা) পাঠাইতে হবে। তার বৃদ্ধা মা এখনও জীবিত আছেন। লিডারম্যান শুধু ব্যায়াম চর্চ্চার দ্বারা তার স্বাস্থ্য ও যৌবন অটুট রেখেছেন। ইনি "Muscular Development" নামে একখানা বই লিখেছেন, তাতে তিনি তাঁর শরীরের যে মাপ দিয়েছেন তা নীচে উদ্ধৃত করলাম।

ব্যায়ামবীর লিডারম্যান

১। ওজন............২ মণ ১৫ সের।
২। উচ্চতা............৫ ফিট ৯ ইঞ্চি।
৩। গলা......... .. ১৭ ইঞ্চি।
৪। ছাতি ... . ৪৭ ½ ইঞ্চি।
৫। বাই সেপ.........১৬ ½ ইঞ্চি।
৬। কোমর........ ..৩২ ইঞ্চি।
৭। উরু...... ... . ..২৩ ½ ইঞ্চি।
৮। কব্জি............৬ ½ ইঞ্চি।

তিনি এই শরীরের মাপ ১৯২৪ সালে দিয়েছেন। ইনি যে নিয়মে এ র

ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন সেই নিয়মাবলীর নাম "Progressive exercise"। ইনি যে শুধু শক্তির জন্যই প্রসিদ্ধ তা ভেবোনা, ইনি সকল প্রকার 'boxing, (মুষ্টি যুদ্ধ), muscle control ও muscle contact এর জন্যও প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

এই সকল বলবান ব্যক্তি বলবান হয়েই জন্মান না, নিজেদের চেষ্টায় ও যত্নে বলবান হতে সমর্থ হন। সুতরাং প্রত্যেক বাঙ্গালী ছেলেরই উচিত যে, এই সকল বলবান লোকদের আদর্শ রেখে নিজেদের শরীর গঠন করা যাক, এঁর বিষয়ে সব লিখতে গেলে ছোট খাট একখানা বই হয়ে যায়। তোমরা কেউ যদি এঁর বিষয় বেশী জানতে চাও, নিম্নলিখিত বই পড়লে জানতে পারবে। এঁর ঠিকানা হচ্ছে Lionel Strongfort, Broadway, New York city.

শ্রীবিমলেন্দুমোহন গোস্বামী

লালা সাহেব

(গল্প)

কলকাতায় বাস,—চাকরিও কলকাতায় এক সওদাগরী অফিসে। ছুটী অল্প মেলে। পূজা বা বড়দিনের বন্ধে বাবুরা যখন হাওয়া খাবার জন্য পশ্চিমে ছোটেন, আমার মন তখন হায়-হায় করে ওঠে—ভাবি, ধেৎ তোর চাকরি. ইস্তফা দিয়ে ছুটি একবার সেই খোলা মাঠে, রুটীন-ছাড়া হয়ে! আকাশ-বাতাসের পরশ নিয়ে কলকাতার এই গলি-ঘুঁজিতে বোবা ভেপসে ওঠা প্রাণটা আরামে ভরিয়ে তুলি!

ভগবান একদিন মুখ তুলে চাইলেন। আমাদের অফিসের কটা বড় বড় কারখানা ছিল—গালা, চামড়া—এই সবের রকমারি কারখানা। সেগুলো সাঁওতাল-পরগণায় যেখানে সেখানে ছড়ানো থাকে। বড় দিনের আগে বড় সাহেব একেবারে পঞ্চাশ

টাকা মাহিনা বাড়িয়ে আমায় সেই সব কারখানার ম্যানেজার করে দিলেন। শুধু মাহিনা নয়; সঙ্গে সঙ্গে পুরুলিয়া (Purulia) যাবার allowance পাবো সেকেণ্ড ক্লাস। 'শ্রীদুর্গা' বলে পাঁজি দেখে বেরিয়ে পড়লুম।

পুরুলিয়ার ব্রাঞ্চ-অফিসে দু'দিন থেকে খাতাপত্র দেখে রওনা হলুম একেবারে তাতি-সবাই। সেখানে পৌঁছে শুনলুম, কারখানার এক ফিরিঙ্গী বিস্তর গালা চোরাই ভাবে চালান দেবার জন্য ঝালদায় গেছে। সন্ধ্যার আগেই ঝালদায় পৌঁছলুম। পরণে গরম খাকী হাফ প্যাণ্ট, খাকী সার্ট, কোট, ওভার কোট অর্থাৎ দস্তুরমত সাহেবী বেশে। সাহেবী পোষাকে বোঝার মনে ভারী সাহস হয়। কাছা কোঁচার ল্যাঠা নেই - তড়বড় করে ট্রেণে ওঠা, ট্রেণ থেকে নামা। মাল নিয়ে কুলীর প্রত্যাশা না রেখে চলে - কোঁচা লটপট করে না, অর্থাৎ নিজেকে ভারী মজবুৎ আর কেজো বলে মনে হয়। গায়ে কেমন আপনা থেকেই বল পাওয়া যায়।

ঝালদায় এসে সোজা ডাক বাংলায় গিয়ে উঠলুম। আমি কে, তার কোনো পরিচয় কাকেও দিলুম না। ডাকবাংলার চৌকিদারকে বললুম, বেড়াতে এসেছি, ঝালদা দেখবো।

ঝালদা বেশ দেখবার মত জায়গা। পাহাড়ে পাহাড়ে চারিদিক ছেয়ে গেছে — তার মধ্যে রেল-লাইন সরু সূতার মত পড়ে আছে। মস্ত পাহাড়, তার কোলে ষ্টেশন, বাড়ীগুলো যেন ছেলেদের খেলার ঘর। সন্ধ্যা না হওয়া অবধি চারিধারে ঘুরে এলুম। এখানে মাছ ভারী শস্তা, ফাউলও তাই। ভাবলুম কি আরামেই মানুষ থাকে এখানে। রাত্রে কিন্তু কনকনে শীত। বাপ, জমে যাই যেন।

ডাকবাংলায় তিনটে ছোট কামরা পাশাপাশি। আমি এক পাশের কামরা দখল করলুম। চৌকিদার আগুন জ্বেলে দিলে। আহারাদি করে রাগ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। বালিসের নীচে রিস্টওয়াচটা রাখলুম আর রাখলুম পিস্তলটাও। বিদেশে ঘোরা — অজানা জায়গা — চোর ডাকাতের ভয় আছে তো - সাবধানের মার নেই কথাটা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। দূরে ষ্টেশনের ঘড়িতে ঢং ঢং

কাবে নটা বেজে গেল। এখনি কি ঘুম হবে? একখানা বাংলা বই সঙ্গে ছিল, শুয়ে সেটা পড়তে লাগলুম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, খেয়াল নেই হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতে শুনি, বাহিরে একটা সোরগোল চলেছে। পাঁচ সাত জন লোক কথা কইছে— কথাগুলো খুব স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। তবে যেটুকু শোনা যাচ্ছিল, তা থেকে বোঝা গেল, হিন্দী ভাষা এবং স্বরো যেন একটু বেশী মাত্রায় সতর্ক ভঙ্গিমার—একটা আতঙ্কও আছে তার সঙ্গে।

ব্যাপার কি? হঠাৎ গা কেমন ছমছম করে উঠলো। কলকাতার নিরাপদ গৃহে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাই—এ একেবারে মাঠের পাশে খোলা বাংলা—সঙ্গে টাকা-কড়িও আছে বিস্তর! অফিসের টাকা। রাহাজানি হলেই গেছি। বিভলভারটা বাগিয়ে ধরে নিঃশব্দে উঠলুম। বিছানার নীচে পকেট কেশ ছিল, নোটের তাড়ায় ভর্ত্তি। সেটা বুক পকেটে গুঁজলুম। গুঁজে পা-টিপে-টিপে দরজার কাছে এসে উঁকি মেরে দেখি! পাঁচজন লোক, হিন্দুস্থানী পালোয়ান গোছ দেখতে! একজন চেয়ারে বসে—মুখে উদ্বিগ্ন ভাব, আর চার জন আতঙ্ক-ভরা মুখে তাকে কি বলছে! একজনের হাতে একটা বন্দুক।

যে লোকটা চেয়ারে বসে, সে একটা ব্যাগ থেকে একখানা মস্ত ছোরা বার করে ধার পরখ করতে লাগলো। দেখে তো আমার চক্ষু স্থির! পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠলো। ডাকাত? ডাকাতের হাতে পড়লুম না কি! চৌকিদারটা তো আচ্ছা ওস্তাদ। তাই সন্ধ্যার সময় যখন জিজ্ঞাসা করলুম - চোর-ডাকাত নেই তো রে এখানে? সে বললে.— কুছ্ ডর নেহি হ্যায় সাব! বিভলভারটা সে দেখেছিল। তবু না, কাকেও বিশ্বাস নেই।

কিন্তু অবিশ্বাস নিয়েই কি ছাই ধুয়ে খাবো। প্রাণটা এখন বাঁচাই কি করে এদের হাত থেকে? আবার উঁকি পাড়লুম—দেখি, ছোরা-খানা সামনের টেবিলে রেখে সে কি ইশারা করলে। দুজন লোক বেরিয়ে গেল। এরা চুপচাপ বসে। এক— তখনি ফিরে এসে হিন্দিতে বললে,—দু'জনে হবে না; লালা সাহেব ভারী বিগড় গিয়া।

তখন সকলেই উঠে বাহিরে গেল। ভয়ে আমার রক্ত হিম হয়ে এল। পা টিপে-টিপে জানলার ধারে এসে দাঁড়ালুম। জানলা খুব আঁট নয় দু'টো পাল্লার মধ্যে এক আঙুল-টাক ফাঁক—আর সেই ফাঁক দিয়ে বাহিরের কন্‌কনে শীত হু-হু করে ঘরে ঢুকছে! কিন্তু তখন শীতে কালিয়ে যাবার ফুরসুৎ ছিল না আমার।

সেই ফাঁকে চোখ দিয়ে দেখি, বাহিরে জ্যোৎস্না— হিমের পরদায় ঝিম্‌ঝিম্ করছে। জনপ্রাণীর সাড়া নেই। আশপাশে ঝোপ-ঝাপ -দূরে পাহাড়। পাহাড়ের আপাদমস্তক জঙ্গলে ভরা! ত্রিসীমার মধ্যে একটা বাড়ী বা ঘরের চিহ্নমাত্র নেই। ঘড়িটা তুলে দেখি, রাত ঠিক একটা!

বুক এমন দুলছিল ভয়ে—প্রাণ বুঝি বুক ভেঙ্গে এখনি বেরিয়ে পড়ে! হাত কাঁপছিল। আনাড়ির হাতে রিভলভার। এর ঘায়ে নিজেই মরবো শেষে! তবু ... .. ওরা তো জানে না যে রিভলভার ছোড়া আমার রপ্ত নয়!

ভাবলুম, খাটিয়ার তলায় ঢুকে পড়ে থাকি! . কিন্তু, না—ঐ চৌকিদারটা .. পাজী, নিমকহারাম, বিশ্বাসঘাতক! . সে যদি...? নিশ্চয় যড় আছে?

আবার সেই দোরের কাছে এলুম, নিঃসাড়ে। যত মনে করি, ওধারে চাইবো না, তবু!...মানুষের মন এমনি বটে। ভয়ের কাছ থেকে লোক যত দূরে থাকতে চায়, ভয় যেন ততই তাকে টানে!

এবার দেখি, ওরা ক'জনে একজন মোটা-সোটা লোককে পিছমোড়া করে বেঁধে এনে ঘরের মেঝেয় ফেললে। লোকটা অমন বাঁধা থাকা-সত্ত্বেও তিড়বিড় করে মাথা নাড়া সুরু করলে! আর কি হাঁক! অসুর যেন! তাকে মেঝেয় ফেলে যণ্ডাগুলো একবার বাইরের পানে চেয়ে দেখলে, তারপর মস্ত একটা বাঁশের লাঠি তুলে তার মাথায় মারলে, বিষম জোরে! সঙ্গে সঙ্গে গ্যাঙানি! ওঃ,-- যেন বাজ পড়লো!

কাঁপতে কাঁপতে এসে আমি বিছানায় লুটিয়ে পড়লুম! পাঁজি দেখে বাড়ী থেকে বেরিয়েও কি এ বিপদ! যাত্রা করবার আগে কপালে অমন দইয়ের ফোঁটা কাটলুম, মাথায় মা-কালীর ফুল ছোঁয়ালুম সব মিথ্যা হবে! প্রাণপণে মনে-মনে

ডাকলুম,—মা কালী, বাঁচাও মা! আসবার সময় ঠনঠনের তোমার মূর্ত্তিকে হাত তুলে প্রণাম করে আসিনি, মা—সে ভক্তির অভাবে নয়, অশ্রদ্ধায়, নয় পাছে ট্রেন ফেল হয়ে যায়, এই ভাবনায় হুঁশ ছিল না! মা-মাগো-জননী, জগৎ-জননী বিপদবারিণী তারা...

কান খাড়া করে শুনলুম, পাশের ঘরে একটা ধস্তাধস্তি চলেছে। তারপর...বাজ? না, বন্দুকের আওয়াজ! আর না, বাবা! যা থাকে কপালে! উঠে ঘড়িটা পকেটে ফেলে ঐ জানলাটা খুলে ফেললুম। ভাগ্যে গবাদে ছিল না। তার পর সেই জানলা গোলে লাফিয়ে পড়ে চোঁচা দৌড়! যেদিকে দু'চোখ যায়, সেই দিকে... কোনো-কিছু নিশানা না ধরেই!—

দৌড়, দৌড়, দৌড়! কতদূর দৌড়ে এসে দেখি, সামনে জঙ্গল! তখন থমকে দাঁড়ালুম। যদি এ জঙ্গলে বাঘ থাকে? চোখের সামনে চারিধার ঘোলাটে হয়ে এলো। আকাশের তারা, সামনের পাহাড় জঙ্গল সব চোখের সামনে থেকে মুছে গেল। অত শীতেও গায়ে ঘাম ঝরছিল! মাথা ঝিমঝিম করছিল! সেই জঙ্গলের ধারেই হাত-পা এলিয়ে বসে পড়লুম। কতক্ষণ......! তারপর একটু খেয়াল হতে ভারী পা দুটোকে কোনমতে খাড়া করে চারিধারে চেয়ে দেখি,—বহুদূরে মাঠে ঐ আগুন জ্বলছে! কাপালিক? হোক্ কাপালিক! হয় বাঘ, নয় ডাকাত, নয় কাপালিক। আর পারাও যায় না! সেই আগুন লক্ষ্য করে এগিয়ে চললুম। ..

হেঁটে হেঁটে হেঁটে হেঁটে—পারা আর যায় না! আগুনের কাছে এলুম। দেখি, কালো একটা সাঁওতালী ক্ষেতের আলের উপর বসে আগুনে হাত পা সেঁকছে! তাকে একটা টাকা দিলুম, দিয়ে বললুম,—ষ্টেশনে পৌঁছে দিস্ যদি তো আরো এক টাকা বখশিস দেবো।

সে রাজী হলো। তার সঙ্গে আধঘণ্টা চলে মাঠ ভেঙ্গে খানা ডিঙ্গিয়ে ষ্টেশনে এসে পৌঁছলুম। সে জ্বলন্ত দুটো কাঠ নিয়ে মশাল করেছিল। সেই আলোয় কষ্ট হয়নি, হয়ও কিছু ভেঙ্গেছিল!

ষ্টেশনে এসে দেখি, সকলে ঘুমে অচেতন! রেল-পুলিশকে ডেকে তোলা

হলো। ঘুম কি তার ভাঙ্গে? বহু কষ্টে জাগিয়ে তাকে ঐ ভয়ঙ্কর খুনের কাহিনী খুলে বললুম। পুলিশ তখনি লাফিয়ে উঠলো এবং আট দশজন চৌকিদার সঙ্গে নিয়ে বড় জমাদার বেরিয়ে পড়লো, সঙ্গে আমি।...

সাঁওতালী আগুনে হাত-পা সেঁকছে

ঐ ডাক-বাংলা! গা ছমছম্ করে উঠলো। আমি সকলের মাঝখানে ছিলুম। হাতে রিভলভার বাগিয়ে রাখিনি., কি জানি, ভয়ের মুখে যদি ঘোড়া টিপে ধরি... বগকে মারতে শেষ কাকে মারবো!

বাংলার ঘরে ঢুকে দেখি, লাস পড়ে আছে মেঝের উপর। আর ষণ্ডাগুলো? একজন তামাক টানছে। সর্দ্দারটা সুর করে রামায়ণ পড়ছে, বাকী তিনজন দিব্যি উনুন জ্বেলে রুটি পাকাচ্ছে! অদ্ভুত সাহস বটে! এমন কাণ্ড করে ..

জমাদার ঢুকতেই সর্দ্দার রামায়ণ বন্ধ করে বললে—আরে, বড়া আপশোষ, ভাইজী...

জমাদার তার বাগানো লাঠি নীচু করে বললে,—আরে, ছক্কা-ভাই-সাব রাম রাম...কেয়া খপর?

আমি অবাক! রাগও ধরছিল। এত দোস্তি পুলিশের সঙ্গে না থাকলে

ডাক-বাংলায় চড়ে মানুষ মারতে সাহস করে এই ক'টা ডাকাত! রাগে মাথা জ্বলে উঠলো। ভাবলুম্ এখন চেপে যাই, তারপর সকাল হোক, পুলিশের নামে মস্ত রিপোর্ট লিখে একটা পাঠাবো সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেবকে আর একটা 'ষ্টেটস্‌ম্যান' কাগজে! দেখি, পুলিশ শায়েস্তা হয় কি না! —তোমরা ভাবচো, এর পর একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটলো। মোটেই না। যা ঘটলো, তাতে আমি বেকুবের অধম বনে গেলুম।

অর্থাৎ এরা পাঁচজন ডাকাত নয়। ইউ পি সার্কাস কোম্পানির লোক সব। লাসটি মানুষের নয়, বনমানুষের। সর্দ্দার চক্কা ভাই মস্ত পালোয়ান, রাঁচিতে বনমানুষ নিয়ে যাচ্ছিল, বনমানুষের সঙ্গে লড়াই তার একটা ভারী প্যাঁচের খেলা। আমাদের দেশে বাঘের সঙ্গে লড়াই হয় সার্কাসে। ইউ-পি সার্কাস কোম্পানিতে তেমনি চক্কা ভাই-সাহেব বনমানুষের সঙ্গে লড়াই দেখিয়ে খুব নাম কিনেছে এদিকে। ঐ বনমানুষের নাম ছিল লালা সাহেব।

পুরুলিয়া থেকে পুশপুশে আসতে আসতে লালা সাহেবের মেজাজ বেজায় গরম হয়ে ওঠে। তাই রাত এগারোটায় ঝালদায় পুশপুশ্ পৌঁছুতে রাত্রিটা লালা সাহেবকে এই ডাকবাংলায় এনে জিরুবে বলে এরা ক'জনে এখানে ওঠে! লালা সাহেব ক্রমে এমন খাপ্পা হয়ে উঠলো যে, তাকে রাখা দায়! কাজেই হাত পা বেঁধে তার উপর লাঠি চালানো হয়। লাঠ্যৌষধিতেও কাজ হলো না দেখে, বহুৎ মায়া-শাকা সত্ত্বেও বন্দুকের গুলিতে লালা সাহেবকে মেরে ফেলতে হয়েছে!"

চৌকিদার লালা সাহেবকে ভীষণ মূর্ত্তি নিয়ে ডাকবাংলায় নামতে দেখে সেই যে চম্পট দিয়েছে—পরের দিন বেলা নটার আগে তার আর পাত্তা মেলে নি!

আমি ভয়ে যে-ভাবে পালিয়েছিলুম, সেটা যে আর-কেউ জানতে পারেনি, সেই মস্ত রক্ষা! নাহলে এ খাকী প্যাণ্ট, কোট, আর রিভলভারের মর্য্যাদাটা থাকলো আর কি!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সিংহরাজের রাজ্যাভিষেক*

সিংহরাজ বললেন—"কোন্ দিন বা শেয়াল-পণ্ডিত ভোম্বলদাস-মামাকে নিয়ে আমারই সিংহাসন আবার কেড়ে নিতে আসে!"

ভাল্লুক ঘাড় নেড়ে বললেন "হতে পারে।"

বাঘ ল্যাজ আপ্‌সে বললে—"এখনি এর একটা বিহিত করা চাই।"

গজপতি বললেন—"এমন কেউ নেই ঐ পাজি শেয়ালটা যাকে অপমান না করেছে।"

মোষ চোখ-রাঙিয়ে বললে—"ওঠা বিষম ঠক!"

ছোট ছোট জানোয়ার, তারা বলে উঠলো—"দোহাই মহারাজ, ওর হাত থেকে আমাদের রক্ষে করুন। কাচ্চ-বাচ্চা নিয়ে ওর জ্বালায় ঘর করা দায় হয়েছে।"

সিংহ সবাইকে অভয় দিয়ে বললেন—"ভয় নেই। ওকে আমি রীতিমতো শাস্তি দেবো। আসছে মাসে মামার শ্রাদ্ধ, সেই দিন ওকে এখানে আনাচ্ছি; তার পর বিচার কোরে দেখা যাবে কি করা যায়। এখন তোমাদের ওর নামে যদি কিছু নালিশ থাকে প্রকাশ কোরে বলতে পার; সজারু সব লিখে নেবেন। আমি তো শেয়াল-পণ্ডিতের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেশ-ছাড়া করব কিন্তু তোমাদেরও আমার জন্যে কিছু তো করা চাই। মামা তো কৈলাশে গেলেই শীতে মরবেন, জানা কথা; কেবল শেয়াল-পণ্ডিতই তাঁকে বুদ্ধি দিয়ে কৈলাশ যেতে দিচ্ছে না। এখন মামা শুনছি তপস্যা কোরে নতুন শরীর পেয়েছেন। শেয়াল তাঁকে রোজ একটা কোরে পাঁঠার রক্ত খাইয়ে বেশ মোটা-সোটা কোরে আবার যে দিন রাজ্যে ফিরিয়ে আনবে, সে দিন আমাকে তো সিংহাসন ছেড়ে নামতেই হবে, তোমাদেরও যে কারু ল্যাজ সে রাখবে তা বোধ হয় না! তাঁর নামে তোমরা যে-সব নালিশ রুজু করতে চলেছ, এ খবর তার কাছে পৌঁছবে। অতএব তোমাদের উচিত যে

* ইহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত—"বুড়ো-শেয়ালের কথা।"

আজই আমাকে মামার রাজ্যে অভিষেক করা। আমার রাজ্য হলে আমি যা বিচার করব, তার উপর আর মামা এলেও কথা চলবে না—মামার বাবা এলেও নয়!"

এই বোলে সিংহ হুঙ্কার ছেড়ে চারিদিক চাইলেন; সব জানোয়ার ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে এক সঙ্গে ল্যাজ তুলে জানালে—"তাই হোক। এখনি আপনাকে অভিষেক করা হোক! বুড়ো ভোম্বলদাসকে চাইনে আমরা—সে তার পণ্ডিতের বুদ্ধিতে চলতে চায় চলুক; আমরা গায়ের জোরে সিংহকে রাজা করবো জোর যার মুলুক তার।"

সিংহ-রাজ মামার মালখানা খুলে রাজমুকুট রাজদণ্ড শ্বেতছত্র শ্বেত-চামর আনতে মন্ত্রীকে হুকুম করলেন। ছুঁচোর কাছে মালখানার চাবি থাকতো, সে এসে নিবেদন করলে, পণ্ডিত মশাই যাবার এক-হপ্তা আগে বুড়ো রাজার হুকুম-নামা দেখিয়ে মালখানার চাবি তার হাত থেকে নিয়েছেন; সে চাবি তার কাছে এ পর্য্যন্ত ফিরে আসেনি। সিংহ এক থাপ্পড়ে ছুঁচোকে যমালয় পাঠান আর কি, এমন সময় ভাল্লুক-মন্ত্রী সিংহকে রাজা না হতেই অবিচার কোরে ছুঁচো মেরে হাত-গন্ধ কোরে বসতে নিষেধ করলেন।

কিন্তু মালখানার দরজা না খুললে তো কাজ-কর্ম্ম চলে না। সিংহ হুকুম দিলেন—"ভাঙো দরজা।"

দরজা গেঁথেছিল রতা-শেয়াল! হাতী হয়েছিল ফোগলা—তিনি সে কাজে আর এগোলেন না। মোষ গেল, ষাঁড় গেল—সবাই শিং বেঁকিয়ে ফিরে এলো। বুনো শূয়োর তার ছিল সোজা ছুঁচোলো দাঁত, দরজায় ধাক্কা খেয়ে অর্দ্ধচন্দ্রের মতো বেঁকে গেল। গণ্ডারেরও ঐ দশা! এদের মধ্যে কেউ দাঁতে-কোরে কেউ শিঙে-কোরে কেউ শুঁড়ে-কোরে যা তুলেছেন, না ভেঙেছেন এমন জিনিষ নেই কিন্তু কি গাঁথুনিই গেঁথেছিল রতা—দরজা খুললো না।

ঐ দিকে এই খবর যেখানে ভোম্বলদাস শেয়াল-পণ্ডিতের সঙ্গে বসে শাস্ত্র-আলাপ করছেন সেখানে এসে কেউ জানিয়ে গেল। মামাতো হেসেই অস্থির; শেয়ালকে বললেন—"ওহে পণ্ডিত, চাবিটা ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দাও—আরো কিছু মজা হোক।"

শেয়াল বললেন—“চাবিটা মহাবাজ আমি গিয়ে দিয়ে আসি। নতুন রাজা খুসি হবেন—কি বলেন ?”

ভোম্বলদাস চোখ-মট্‌কে বললেন—“যাও, কিন্তু ভাগ্‌নে যখন উত্তম-মধ্যম পুবস্কার হুকুম দেবেন, সে সময় ল্যাজ তুলে তাঁকে আশীর্ব্বাদ কোরে চট্‌পট্‌ ফিরে আসতে ভুলো না।”

শেযাল যদি গেল বিদায় পেয়ে তো মশা এলো ভোম্বলদাসের কানের কাছে ভন ভন কবতে। মশা মিহি স্বরে কানেব কাছে বল্লে—“মহাবাজ !”

ছুঁচের মতো কথাটা বিঁধলো—ভোম্বলদাসের প্রাণে। তিনি মাথা নেড়ে নিশ্বাস ফেলে বললেন—“আব মহারাজ বোলে কেন সম্বোধন কর ? আমার যথাসর্ব্বস্ব গেছে পরেব হাতে !”

মশা আর-একবাব এগিয়ে এসে বল্লে “ধনদৌলত সকলই মজুদ। হুকুম করেন নির্ভয়ে বলতে তো বলি। ঐ যে দেখেন উই-ঢিবি—”

ভোম্বলদাস ল্যাজ আপ্‌সে উঠে বললেন—“উই-ঢিবি কি বল ? ওটা না কৈলাশ-পর্ব্বত !”

ভোম্বলদাসেব হুমকি শুনে মশা তো ভয়ে কম্পমান ! তার মিহি স্বর আরো মিহি হয়ে গেল। সে কেবলই পিঁপিঁ-কোরে কি বলতে লাগলো কিছুই বোঝা গেল না ! ভোম্বলদাস তখন মশাকে অভয় দিয়ে বললেন—“বোলে চল।”

মশার তখন কথা ফুটলো। সে যা বললে ভোম্বলদাসকে খুব ছোট-ছোট-কোরে তা শোনামাত্রই যেন হাজার ছুঁচ ফুটলো রাজার গায়ে। তিনি একবার দন্ত কড়মড় কোরে চার থাবা দিয়ে নিজের গা আঁচড়াতে থাকলেন রাগে এমন যে, নিজের ছাল-চামড়া কিছু আর রইল না গায়ে। খেয়ে-দেয়ে যেটুকু বা রক্ত হয়েছিল গায়ে, তাও সবটা বেরিয়ে গেল একদম ! খালি রইল হাড়-ক'খানার মধ্যে ধুক্‌ধুক্‌ করতে তাঁর প্রাণটুকু।

রাজ-রক্ত মাটিতে পড়ে মাটি হয় দেখে মশার দল এসে জুটলো চারিদিক থেকে।

ভোম্বলদাসকে তারা ঘিরে রইল দিনরাত খুব সাবধানে। তাঁর গায়ে ফুঁড়ে-ফুঁড়ে সব কড়া ওষুধ দিতে থাকলো। কেউ তারা রক্ত পরীক্ষা কোরে দেখে—ম্যালেরিয়া হলো কি না! কেউ দেখে টাইফয়েড হলো কি কালাজ্বর?

এমনি রক্ত শুষতে-শুষতে যখন ভোম্বলদাসের লাল চামড়া প্রায় সাদা হয়ে এসেছে সেই সময় শেয়াল-পণ্ডিত প্রচুনি মাথায় ডুগ্‌ডুগি বাজাতে-বাজাতে হাজির। একেবারে রাঙা চেলি পরা বরের সাজ কিন্তু নাকটি কাটা। ভোম্বলদাস শেয়ালের সেই চেহারা দেখামাত্রই এমন অট্টহাসি হাসলেন যে তাতেই তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেল! ভাগ্নের খবর, সুন্দর-বনের কথা শুধোবার কিম্বা ভাঁড়ার-ঘরের চাবি ফিরে চাইবার আর সময়ই হলো না।

শেয়াল পণ্ডিত খানিক হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে একটা নটে গাছের গোড়ায় রাজ ভাণ্ডারের চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের গর্ত্তে ঘুমতে গেল; আর একটা ছাগল—ঠিক তেমনি ছাগল, যাদের পাঁটার জুস্ খেয়ে ভোম্বলদাস নিজের গায়ে রক্ত করেছিল—সে কোথা থেকে এসে বনের ধারে নটে গাছটার গোড়াসুদ্ধ মুড়িয়ে খেয়ে দিব্যি আরামে কৈলাশ পর্ব্বতের মতো প্রকাণ্ড উই-ঢিবির চূড়োয় তিন লাফে গিয়ে উঠলো—

ঠিক দুক্কুর বেলা,
যখন ভূতে মারে ঢেলা!

সেখান থেকে সে শুনলে সুন্দর-বনে নতুন রাজার অভিষেকের দিনে জোড়া পাঁঠা গর্দ্দান দেবার আগে তাকে ডাকাডাকি করছে—ম্যা-ম্যা বোলে!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমাপ্ত

ক্রিকেট খেলা

গ্রতা ও ধৈর্য্যতা পাওয়া যায়। কাজে
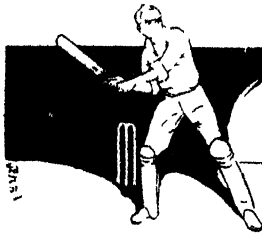
এবারে খেলার জগতের সব চেয়ে বড় খবর হচ্ছে ভারতবর্ষে এম, সি সির আগমন। এম সি, সি জিনিষটা কি তা তোমরা অনেকেই জান না—অনেকে এ সম্বন্ধে ভুল ধারণা আছে। Marylebone Cricket Club-কে সংক্ষেপে এম, সি, সি বলা হয়। বিলাতে অনেক ক্রিকেট খেলার ক্লাব আছে। এই সব ক্লাবে যারা খুব ভাল খেলতে পারে তারাই এম, সি সির খেলোয়াড় হন। অর্থাৎ বিলাতের বিভিন্ন ক্লাবের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নিয়ে এই এম, সি, সির দল গঠন হয়েছে। যেমন ধর "টেট" একজন বিখ্যাত "বোলার"—তিনি "সারে ক্রিকেট ক্লাবের" সভ্য। এই ক্লাবের তিনিই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়—সেই জন্যে তাকে এম সি সির সভ্য হতে হয়েছে।

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত খেলোয়াড় নাইডু—যিনি এম সি, সির বিরুদ্ধে ১০৪ রান করেছিলেন, তিনি খেলছেন

আমাদের দেশে নানা কারণে ফুটবলের চেয়ে ক্রিকেটের আদর বেশী নয়। এই ক্রিকেট খেলাই ইংরাজের জাতীয় খেলা। এই খেলার জন্যে তারা লক্ষ

ভোম্বলদাসকে করে। এই খেলায় ইংরাজের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া। সব কড়া ওস্তাদ খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ইংরেজদের চেয়ে উন্নত। প্রায় প্রতি বছরেই এই দুই দলের মধ্যে খেলা হয় কিন্তু ইংরেজরাই বেশী বার হেরে গিয়েছে। তবে এই ১৯২৮ সালের খেলায় ইংরেজরাই জয় লাভ করেছে।

আগেই বলেছি নানা কারণে আমাদের দেশে ক্রিকেট খেলা উন্নতি লাভ কোরতে পারেনি। ক্রিকেট খেলার খরচ সব চেয়ে বেশী। এক খানা সাধারণ ব্যাটের দাম ২৲ টাকার কম নয়। তাছাড়া অন্যান্য অনেক খরচ আছে!

এম, সি, টেট বিখ্যাত বোলার টেটের বল দেবার কায়দা।

ক্রিকেটের জমি তৈরী কোরতে ও তাকে খেলার উপযোগী কোরে রাখতে অনেক খরচ।

কিন্তু ক্রিকেট সব চেয়ে বৈজ্ঞানিক খেলা। ইংরেজেরা এ খেলার নাম দিয়েছে "Prince of Sports"। স্কুলের ছুটির পর যে কোন রকমে এক ঘণ্টা বল পেটাব নাম ক্রিকেট খেলা নয়। পরীক্ষা পাশ করবার জন্যে তোমরা যেমন শিক্ষক রাখ
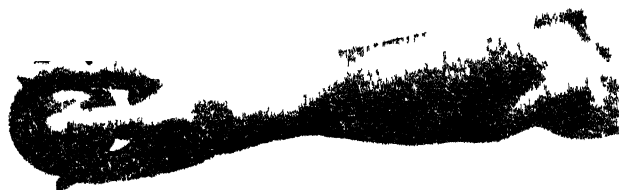
বিখ্যাত বোলার টেটের বল দেবার কায়দা।

এ খেলাও সেই রকম শিক্ষক রেখে শিখতে হয়। বিলাতের বড় বড় ক্লাবে Trainer আছে—তারা সভ্যদের রোজ লেখাপড়ার মত খেলা শেখায়।

এ খেলা শিখলে স্বাস্থ্যের উন্নতি তো হয়ই তাছাড়া মনের একাগ্রতা ও ধৈর্য্যতা বেড়ে যায়। কোন কাজে লেগে থাকবার মত শক্তি এই খেলা থেকে পাওয়া যায়। ক্রমাগত হেরে গেলেও মন যাতে দমে না যায়, আবার নতুন উৎসাহে সেই কাজে লেগে থাকা যায়—এই সব নানা রকম মনের উন্নতি আমরা এই খেলা থেকে পাই। এক নিয়মে চলা ও মান্য করার শক্তি এই খেলা থেকে আমরা পাই। এক জন বড় ইংরেজ বলেছেন যে এই ক্রিকেট খেলায় ইংরেজ ছেলে যে শক্তি অর্জ্জন কোরতে শেখে তা পরে জাতকে বড় কোরে তোলে। তাই ইংরাজিতে একটা কথা আছে "Battle of Waterloo is fought in the fields of Eton'—ইটন স্কুলের মাঠের খেলাতে ছেলেরা যে শিক্ষা পায় তার জোরেই তারা ওয়াটারলুর মত যুদ্ধে জয় লাভ কোরতে পারে।

এম, সি, সির ক্যাপ্টেন গিলিগ্যান

যা হোক এবারে এম, সি, সির খেলার কথা বলি। এম্ সি, সি দলের ক্যাপ্টেন হচ্ছেন গিলিগ্যান। বিলাতের মধ্যে তিনি একজন প্রধান খেলোয়াড়। গত ১৯২৫ সালে বিলাত থেকে যে বাছাই দল অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলতে গিয়েছিল তিনি তাদের ক্যাপ্টেন ছিলেন।

এ দলের প্রায় সবই বিখ্যাত খেলোয়াড়। টেট বিলাতের একজন শ্রেষ্ঠ বোলার—পৃথিবীতে বোলার হিসাবে তাঁর স্থান দ্বিতীয়। তা ছাড়া গিয়ারী স্যাণ্ডহাম্, মেয়ার, এষ্টিল, আরল, ওয়াযেট, বয়েস, এঁরা সবই বিখ্যাত খেলোয়াড়। এম, সি, সি টিমের বিশেষত্ব এই যে তাঁদের দলের প্রায় সবাই ভাল বোলার। তাঁরা যে কেবল ভাল খেলতে পারেন তা নয় বল দিতেও তাঁরা খুব ওস্তাদ। টেট,

গিয়ারী, এস্টিল, গিলিগ্যান, বয়েস, এঁদের বলের সামনে কারো ব্যাট নিয়ে দাঁড়ান অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এ পর্য্যন্ত এম, সি, সির দল করাচি, লাহোর, আজমির ও বম্বেতে খেলেছেন কিন্তু কোন ম্যাচেই তারা হারেননি। অনেকগুলি খেলার ফল অবশ্য সমান সমান হয়েছে। সকলেই দুঃখ করছেন যে ভারতবর্ষে এমন কোন দল নাই যে এম, সি, সিকে হারায়। ভারতবর্ষের মধ্যে বম্বেতেই এই খেলার সব চেয়ে বেশী আদর। ভাল ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড় প্রায় সবই বম্বে প্রদেশের। বম্বের বিখ্যাত হিন্দু
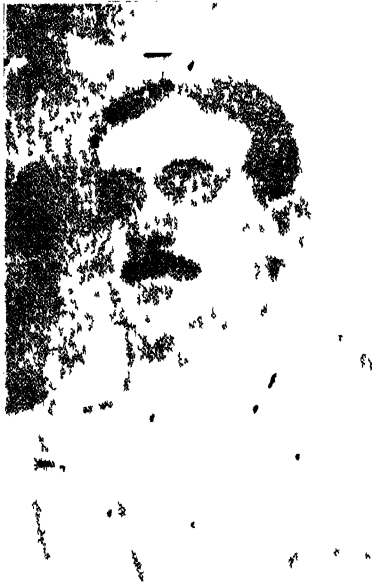
বিখ্যাত হিন্দু খেলোয়াড় নাইডু, ইনি এম. সি. সির বিরুদ্ধে ৫৪ রান করেছেন

বিখ্যাত হিন্দু খেলোয়াড় ভিটল

খেলোয়াড় ভিটল সে দিন গর্ব্ব কোরে বলেছিলেন যে "Let them come to Bombay and we shall see"। কিন্তু দুঃখের বিষয় বম্বে সবাইকে নিরাশ করেছে। তারা একটা ম্যাচেও এ পর্য্যন্ত জিততে পারে নি।

জিততে না পারলেও বঙ্গের হিন্দুরা সমস্ত ভারতের হিন্দুদের মান রেখেছে। তে এম, সি, সির প্রথম খেলা ছিল হিন্দু দলের সঙ্গে। এই হিন্দু দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন ভিটল। এই খেলায় হিন্দু খেলোয়াড় নাইডু ১৫৪টা রান কোরে কলকে অবাক করেছেন। পৃথিবীর কয়েকটী শ্রেষ্ঠ বোলারের বিরুদ্ধে এতোটা করা আশ্চর্য। নাইডুর খেলা দেখে এম, সি সির ক্যাপ্টেন বলেছেন—নাইডু তে গেলে যে কোন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ের সমান বলে গণ্য হবেন। তায় সমস্ত ভারতের সঙ্গে এম, সি, সির যে খেলা হবে তাতে দুঃখের কোন বাঙ্গালা খেলোয়াড় থাকবে না। দুঃখ হলেও এ দুঃখ আমাদের নিতে হবে, কারণ বাস্তবিক সমস্ত ভারতের প্রতিনিধি হবার মত একজনও বাঙ্গালী খেলোয়াড় নাই। প্রথম দিন বাঙ্গালা ও য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান বনাম এম, সি, সির খেলা হবে। আশা করি এই খেলায় যে কজন বাঙ্গালী খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হবেন তাঁরা ভাল খেলা দেখিয়ে বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল কোরবেন।

এম সি, সি, এলে তোমরা অবশ্য অনেকেই খেলা দেখতে যাবে। তাদের খেলা দেখে যদি তোমাদের মনে এই খেলা শেখবার ইচ্ছা জাগে ও আমাদের দেশে ক্রিকেট খেলা উন্নতি লাভ করে তবেই এম সি, সির আগমন সার্থক হবে।

জল্লার পেত্নী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অপূর্ব্বর কথা

ছুটতে ছুটতে বাড়ীতে এসে পৌঁছলুম। দপ্তরের কর্ম্মচারীরা সারাদিন কাজ কোরে তখন যে যার বাড়ীতে চলে গিয়েছে। বাড়ী নিস্তব্ধ, দুই একটা চাকর এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাত্র। আমি শোবার ঘরে গিয়ে খাটের ওপরে বসে পড়লুম। জল্লার মধ্যে সেই ভীষণ গর্জ্জন! সে কথা এক একবার মনে হোতে

লাগল আর বুকের ভেতর কি রকম গুর্-গুর্ করতে লাগল। কিসের এই শব্দ! কোথা থেকে এই শব্দ এল বসে বসে সেই কথা ভাবছি এমন সময় দেওয়ানজী মশায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কিছুক্ষণ জমিদারী সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা হবার পর আমি তাঁকে জলার মধ্যে সেই গর্জ্জনের কারণ জিজ্ঞাসা করলুম। দেওয়ান মশায় বললেন—এই রকম একটা শব্দ আমিও মাঝে মাঝে শুনে থাকি বটে কিন্তু কোথা থেকে যে এই শব্দ আসে তা এখনও ধরতে পারি নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—এর কোনো কারণ আন্দাজ করতে পেরেছেন?

দেওয়ানজী মশায় আমার প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ কোরে রইলেন। তারপর বললেন—আমার মনে হয় জলার মধ্যে যে সব পাহাড় আছে তারই কোনো গুহায় বাতাস লেগে ঐ রকম আওয়াজ হোয়ে থাক্‌বে বোধ হয়।

দেওয়ানজী মশায়ের কথাটা কিন্তু মনে ঠিক লাগল না। আমার মনের মধ্যে নানা রকম সন্দেহের উদয় হোতে লাগল। কিন্তু তাঁকে সে সব কথা কিছু না বলে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা আপনি যে পেত্নীর কথা বলেছিলেন তাকে আমার কাকা ছাড়া আর কেউ দেখেছেন?

দেওয়ানজী বললেন—কৈ আর কেউ দেখেছে বলে তো শুনি নি।

আমি বল্লুম—আপনি আমার ঠাকুর্দ্দার আমলের কর্ম্মচারী, এত দিন এখানে বাস করেছেন অথচ আপনি দেখেন নি? বড় আশ্চর্য্যের বিষয় তো!

দেওয়ানজী একবার দু-বার ঢোক গিলে বললেন—হ্যাঁ আশ্চর্য্যের বিষয় বৈ কি! তবে আমি পেত্নীকে না দেখলেও আর একটা জিনিস দেখেছি!

আমি বল্লুম—কি দেখেছেন?

দেওয়ানজী বললেন—আমি ও আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে জলার মধ্যে একটা আলো দেখেছি। আলোটা মাঝে মাঝে এক একদিন কিছুক্ষণের জন্য জ্বলে আবার তখুনি নিভে যায়।

আমি দেওয়ানজীকে বল্লুম—এবার যে দিন সেই আলো দেখবেন আমায় দেখাবেন?

দেহ মাঠের উপরে স্থির হয়ে প'ড়ে আছে এবং কুমীর-কাঙ্গারু পিছনের দুই পা ও ল্যাজের উপরে ভর দিয়ে ব'সে হাঁ করে হাঁপাচ্ছে এবং তার মুখের দুই পাশ ও দেহ দিয়ে হু হু করে রক্তের স্রোত ছুটছে! খানিক বিশ্রামের পর মাটির উপরে ল্যাজ আছড়াতে আছড়াতে সে আকাশ-পানে মুখ তুলে কয়েকবার গগনভেদী জয়নাদ করলে, তারপর মৃত ডাইনসরের দেহটা ভক্ষণ করতে প্রবৃত্ত হ'ল! সে এক বীভৎস দৃশ্য এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাদের ভীত চক্ষের সামনে সেই দৃশ্যের অভিনয় চলল।

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল, আমরা কিন্তু তখনো বাইরে পা বাড়াতে সাহস করলুম না।

বিমল উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, "কি হবে বিনয়বাবু! খাবারের খোঁজে এসে এদিকে অনাহারে প্রাণ যে যায়!"

আমি মনের দুশ্চিন্তা গোপন ক'রে বললুম, "কোনই উপায় নেই। আজকের রাত এই বনের ভেতরেই আমাদের কাটাতে হবে। এখন বন থেকে বেরুলেই মৃত্যু!"

রামহরি বললে, "কিন্তু কালও হয় তো আমরা পথ খুঁজে পাব না!"

আমি বললুম, "আমরা এসেচি পূর্ব্বদিকে। কাল সূর্য্য উঠলে পর আমরা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হব। তাহলে আমরা যে পথে এসেচি সে পথ না পেলেও খুব সম্ভব হ্রদের ধারে গিয়ে পড়তে পারব।"

বনের ভিতরে রাত ঘনিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে নানারকম বিভীষিকার সূত্রপাত হ'ল! এতক্ষণ যে বিশাল অরণ্যে কেবল পত্র মর্ম্মর ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না, এখন তার চারিদিকেই নানারকম অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যেতে লাগল! নিবিড় অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে খালি শব্দ! গাছের উপরে শব্দ, জঙ্গলের ভিতরে শব্দ, আমাদের আশেপাশে শব্দ! কোন শব্দ গাছের উপরে ওঠা-নামা করছে, কোন শব্দ চারিদিকে আনাগোনা করছে, কোন শব্দ যেন এক জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ বুঝতে পারলুম, আমাদের খুব কাছ দিয়েই অনেকগুলো অতিকায় জীব আসা-যাওয়া করছে, কারণ তাদের পায়ের চাপে পৃথিবীর মাটি থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। সে-সব জীবের আকার যে কত ভয়ানক,

ভগবানই তা জানেন। আমরা তিনজনে আতঙ্কে ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রায় মরমর হয়ে চুপ ক'রে সেইখানেই ব'সে রইলুম, জড় পাষাণের মত।

হঠাৎ রামহরি চেঁচিয়ে উঠল এবং পর-মুহূর্ত্তেই কে এক ধাক্কা মেরে আমাকে মাটির উপরে ফেলে দিলে। আমি উঠে বসবার আগেই একটা প্রকাণ্ড ভারি দেহ আমার বুকের উপরে চেপে বসল। কে যে আমাকে এমন অতর্কিতে আক্রমণ করলে, অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলুম না, কিন্তু তার দেহের চাপে আমার দেহের হাড়গুলো যেন ভেঙে যাবার মতন হ'ল। সৌভাগ্যক্রমে বন্দুকটা তখন আমার হাতেই ছিল, কোন রকমে বন্দুকের নলটা আক্রমণকারার দেহে লাগিয়ে এক হাতেই আমি ঘোড়া টিপে দিলুম, সঙ্গে সঙ্গে বিকট এক আর্ত্তনাদ ক'রে সে জীবটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে মাটির উপরে পড়ে গেল এবং তার পরেই পায়ের শব্দ শুনে বুঝলুম, সে বেগে পলায়ন করছে।

বিমল ব'লে উঠল, "কি হ'ল, কি হ'ল রামহরি?"

রামহরি বললে, "কে আমার পা মাড়িয়ে দিয়ে গেল!"

আমি উঠে ব'সে বললুম, "কি একটা জানোয়ার আমার বুকের ওপরে চেপে বসেছিল, কিন্তু আমার বন্দুকের গুলি খেয়ে সে পালিয়ে গেছে।"

বিমল বললে, "কিন্তু এখনি যে বিকট আর্ত্তনাদ শুনলুম, সে তো জানোয়ারের চীৎকার নয়, সে যে মানুষের চীৎকার।"

আমি বললুম, "আমারও তাই মনে হল। কিন্তু বন্দুকের বিদ্যুতের মতন আলোতে আমি এক পলকের জন্যে যে জ্বলন্ত চোখ আর যে ধারালো দাঁতগুলো দেখতে পেয়েচি, তা তো মানুষের নয়। তার গায়ে যে জানোয়ারের মতন বড় বড় লোম ছিল তাও আমি জানতে পেরেচি, কিন্তু আর কিছু জানবার সময় আমি পাইনি —সে জীবটা এসেচে আর পালিয়েচে দুই সেকেণ্ডের মধ্যেই!"

সেই মুহূর্ত্তেই অরণ্যের অন্ধকার ভেদ করে আবার এক তীব্র আর্ত্তস্বর জেগে উঠল! ঠিক যেন কোন মানুষ মর্ম্মভেদী যাতনায় চীৎকার স্বরে ক্রন্দন করছে। ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বাঙ্গালীর সাইকলে পৃথিবী ভ্রমন

তোমরা সকলে শুনে খুব সুখী হবে যে চারিটী বাঙ্গালী যুবক সে দিন সাইকলে চড়ে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছে। এই চার জনের নাম অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, বিমল মুখোপাধ্যায়, মণি ঘোষ ও আনন্দ মুখোপাধ্যায়। এঁদের সমস্ত পৃথিবী ঘুরতে প্রায় ৫ বছর লাগবে। এঁরা কারো কাছে কোন অর্থ সাহায্য নেন নি। তাঁরা ফটো তুলে, বক্তৃতা দিয়ে নিজেদের পথের খরচ সংগ্রহ কোরবেন। মৌচাক এই বাঙ্গালীবীরদের অভিনন্দন করছে এবং তাদের যাত্রা শুভ হোক এই কামনা কোরছে।

নূতন ধাঁধা

ম,	ক,	া,	প,	চ,	ল,	ব,	ে,	শ্রী	ি,	ত্র,	ত,	য,	জ,	ন,	হ,	,	গ,
৫	৪	১	২	১১	৩৫	৮	৩	০	৭	৯	৬	১৫	১৮	১৩	২০	২৫	১২

একটি মাসিক পত্র	(মৌচাক)	২৪
ত্রেতা যুগের এক মস্ত বীর		৪৪
বিষ্ণু		৯
একটি মাসের নাম		২০
কাশ্মীরের রাজধানী		৪৩
হস্তী		৩০
পবননন্দন		৭৭

নিয়ম (Rule)

মনে কর মৌচাক "একটা মাসিক পত্র"। উপরে কোন অক্ষরটী কত নম্বর তাহা লেখা আছে। তুমি দেখছ এমন একটা মাসিক পত্রের নাম বের করতে হবে যার অক্ষরের নম্বরের যোগ হবে ২৪, সুতরাং দেখ :- ম = ৫

ৌ = ৩
চ = ১১
া = ১
ক ৪
———
২৪ যোগফল

তাহলে উত্তর হল "মৌচাক।" এইরূপ অঙ্ক গুলির উত্তর বের কর।

শ্রীবিমলচন্দ্র সেন

কলিকাতা—২৯, কালিদাস সিংহের লেন, ফিনিক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅতীন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত
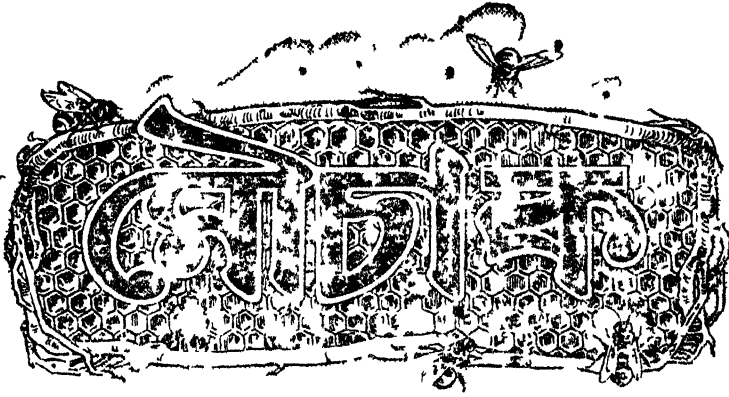
ম বর্ষ] মাঘ, ১৩৩৩ [দশম সংখ্যা

নিষ্ফল স্বপ্ন

(ব্যঙ্গ কবিতা)

আমার দুখের কাহিনী শুনগো বালক বন্ধুগণ,
কবি অনুবোধ, শুনো শুনো সব হ'ওনা অন্যমন।
ছাত্রজীবন কত যে কঠোর বুঝিতেছি খুবই তাহা,
এ জীবনে শুধু নিঃশ্বাস বহে নিয়ে 'ওহো', 'উহু', 'আহা'।
শিক্ষকদল হোন পূজনীয—যম-অবতার যেন,
যমেরও হৃদয়ে দয়া আছে বুঝি—নয় নয় কভু হেন।
একদিন কোন ভুল ত্রুটী হলে দয়া কি তাহাতে নাই,
বাক্যবাণে বা বেত্রবিচারে প্রাণ করে আইটাই।
অঙ্কের বাবু একটা রুক্ষ, খেঁকো জানোয়ার মত,
তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন আয়ু কমে গেল কত।

যেমন চেহারা টিন্‌টিনে তার খিট্‌খিটে তার বোল,
তাহাকে দেখিলে কিসের কি পড়া, মাথায় বাঁধে যে গোল।
তামাকুর বদ্ গন্ধ তাহার মুখেতে আছেই লেগে,
এ হেন গন্ধে যা' কিছু ভক্তি তাও ত গিয়াছে ভেগে।

এক দিন ক্লাশে গালগুঁতো খেয়ে রাগিয়া আসিনু বাড়ী,
ইস্কুলে আর যাব না কিছুতে বিতৃষ্ণা হ'ল ভারি।
সারাদিন গেল রাগে রাগে কেটে মায়ের গলিল প্রাণ,
বাবা ত তাঁহার কাজেতেই রত, সে রাগে পাইনু ত্রাণ।
দাদাটি আমার 'অঙ্কবাবুর' দ্বিতীয় সংস্করণ,
ঠাণ্ডা যখন থাকেন তিনি ভাল, রাগিলে আগুন হন।
[illegible] আমি না খেয়েই কছু পড়িনু বিছানা মাঝে,
নিশীথ-স্বপনে 'স্বর্গ' দেখিনু সমুখে আমার রাজে।
সে 'সুখ-কাহিনী' স্মরিতে এখনো চোখে বহে মোর জল,
হায়, ক্ষণেক স্বর্গ বসতির পর মিলিল দুঃখানল।

স্বপনে হেরিনু চাঁদের রাজ্য—আমি তথাকার লোক,
পলক মাঝারে সত্য সত্য ভুলিনু দুঃখ শোক।
শান্তির এক মৃদু হাওয়া যেন পুলক বহিছে প্রাণ,
আকুল আকাশে দুকূল বহিয়া মূর্চ্ছি পড়িছে গান।
সে 'স্বপন-পুরে' শুভ্র শুভ্র, শান্ত শুভ্র সবে,
সে সব কখনো নাহি সম্ভবে দুঃখ-ব্যাকুল ভবে।
সহসা হেরিনু সেই 'মহাবট', অতীব প্রাচীন বট,
এত যে বৃদ্ধ তবুও তাহাতে বাহির হয়নি জট।
তারি তলে সেই রয়েছে বসিয়া লক্ষ বছুরে বুড়ী,
সমুখে চরকা, কি যেন দেখেছে তুলোর গুচ্ছ ধরি।

আমাকে দেখিয়া ডাকিল সহাসে এসেছ কি তুমি 'নুবনী',
তোমার লাগিয়া বসে আছি—এসে এতদিনে ত্যাজি অবনী ?
এখানে তোমার বসতির তরে আছে ঐ রাজবাড়ী,
হাসিবে খেলিবে যাহা খুসী তব—পাবে হোথা ঘোড়া, গাড়ী।

ভুলেছি মর্ত্ত্য, ভুলেছি গো বাড়ী, সবই গিয়াছি ভুলিয়া,
এ 'সুখ স্বপন' লয়েছি অতীব মধুর সত্য বলিয়া।
আমিও বুড়ীকে হাসিয়া বলিনু—তোমাকে ডাকিব 'মাসী',
বেশ, বেশ, তাতে কোন ক্ষতি নাই, সেও ত বলিল হাসি।
অতি ভয়ে ভয়ে সুধানু তাহারে—মাসি, ইস্কুল আছে কি হেথা,
অঙ্ক টঙ্ক এখানেও কি গো কানে পিঠে দেয় ব্যথা ?
আছে কি এখানে রোজ পড়াশুনা, অধিক খেলিলে গালি,
আছে কি এখানে কড়া সুশাসন যদি বাঁধা কাজ নাহি পালি ?
জ্যোছনার রাতে হাওয়া খেতে খেতে যদি কখনো ফিরিগো বাড়ী
পড়াশুনা সব হাবিজাবি নিয়ে হবে নাত কড়াকড়ি ?
নদীতীরে বসি গলপ করিব, জলেতে ছুঁড়িব ঢেলা,
গলপে গুজবে বন্ধুরা সব করিয়া রহিব মেলা।
পেয়ারা বা কুল, আম কিবা জাম দেখিলেই লব তুলি
হাসিব খেলিব থাকিব স্বাধীন, যেন আকাশে পক্ষিগুলি।
ইচ্ছা মতন করিব এসব, পুরাব যতক মনের সাধ
ওকি ওকি মাসি। হেসে দিলে তুমি—এতে সাধিবাদ কেউ বাদ ?
নহে, বন্ধু নহে হাসিবে বলক, বন্ধনহীন পাগল প্রাণ,
দিবানিশি তুমি হাসিও খেলিও গাহিও তোমার স্বাধীন গান।
ভাল ! ভাল ! মাসি ! আছে কি হেথায় আমার মতন অপর কেহ,
—আছে আছে ওগো, সবারই তাদের তোমার মতন মন আর দেহ।

এখানে তোমার নাহিত অভাব, আকাশ হয়েছে তোমার ঘর,
মেঘেতে চড়িয়া বেড়াবে৷ আকাশে ছোঁবেনা তোমায় বাতাস ঝড়'।
তবু মনে রেখো আছে হেথা মোর চরকা-কাটুনে উদার মা,
তাকে হে স্বাধীন! দেখা দিও রোজই, পুরিবে তোমার ইচ্ছা যা।
শুনিয়া এসব কহিনু মাসীকে – যতেক কহিলে সকলি ভাল,
আরো এক কথা বলিয়া আমার বিরাট আশার প্রদীপ জ্বাল।
'বল' বা 'ক্রীকেট' আছে কি হেথায়, এ সকলি বড় ভালবাসি,
—-আনিতেছি আমি বলিলেন মাসী চরকাটা তুমি ধরত আসি'।
এ হেন সময় মাথায় আমার লাগিল কি যেন বিষম ব্যথা,
চোখ'চেয়ে দেখি, দাদা চুল ধরে মাসী পালিয়েছে কোথা!
উদ্যত হাত দেখিয়া দাদার মনে ভাবি শুধু হায়, হায়!
চাঁদেরে পাইয়া মুঠার ভিতরে হারানু তাহারে কি ঘোর দায়।

শ্রীবিমলচন্দ্র সেন

বাঙালী-বীর গোবরবাবু

বাঙালীর ছেলে যে ইচ্ছা করলেই বাহুবলে দিগ্বিজয় করতে পারে, সংপ্রতি গোবরবাবু তার উজ্জ্বল প্রমাণ দিয়েছেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচরণ গুহ ওরফে গোবরবাবুর কথা এর আগেই "মৌচাকে" প্রকাশিত হয়েছে। তোমরা সকলেই শুনলে সুখী হবে যে, পাশ্চাত্য দেশে বাঙালীর গৌরব বাড়িয়ে সুদীর্ঘ ছয় বৎসর পরে গোবরবাবু আবার বাংলা-মায়ের কোলে ফিরে এসেছেন।

দিগ্বিজয়ে যাত্রা গোবরবাবুর পক্ষে এই প্রথম নয়। এঁর আগে তিনি দুইবার ইউরোপে গিয়েছিলেন। খুব অল্প বয়সেই তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে সেখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পালোয়ানকে পরাজিত ক'রে এসে ছিলেন। আজ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের কোন পালোয়ান তাঁকে হারাতে পারে-নি।

গোবরবাবুর এবারে আমেরিকাতেই বেশীদিন ছিলেন। আমেরিকার বাসিন্দারা প্রথমে তাঁর শক্তি-সামর্থ্য ততটা বুঝতে পারেনি। কারণ দীর্ঘকালব্যাপী সমুদ্রযাত্রার পর উচিতমত বিশ্রাম না নিয়েই গোবরবাবু যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে প্রথম যুদ্ধেই হেরে যান। জীবনে সেই তাঁর প্রথম পরাজয়। কিন্তু তার পরে দ্বিতীয় যুদ্ধে সেই পালোয়ানকেই তিনি যখন অল্প সময়ের মধ্যে হারিয়ে দিলেন, তখন তাঁর দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল।

বাঙ্গালী বীর গোবরবাবু

আমেরিকার অধিকাংশ প্রথম শ্রেণীর পালোয়ানের সঙ্গেই গোবরবাবুর শক্তি পরীক্ষা হয়ে গেছে। পৃথিবীবিখ্যাত পালোয়ান বিস্কো সাহেব এখন ভারতের শ্রেষ্ঠ পালোয়ান গামার সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে এদেশে এসেছেন। এই বিস্কোর সঙ্গে গোবরবাবুর দুইবার কুস্তি হয়। প্রথম কুস্তিতে গোবরবাবু হেরে যান। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করলেন যে, গোবরবাবুকে অন্যায় যুদ্ধে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন আবার কুস্তির আয়োজন হ'ল। দ্বিতীয় যুদ্ধে গোবর আর বিস্কো সমান সমান গেলেন।

আমেরিকার আর এক নামজাদা মল্লবীর, "লাইট-হেভিওয়েট" বা "লঘু-গুরুভার"

বিভাগে যিনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে বিখ্যাত ছিলেন, গোবরবাবুর কবলে পড়ে তাঁকেও হার মানতে হয়েছে।

'ষ্ট্র্যাঙ্গলার' লুইস এখন "গুরুভার" বিভাগে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে প্রসিদ্ধ। গোবরবাবুর সঙ্গে লুইসেরও কুস্তি হয়। গোবরবাবু প্রথমেই লুইসকে চিৎ ক'রে ফেলেন। দ্বিতীয়বারে লুইস অন্যায় প্যাঁচে গোবরকে এমন আহত করেন যে, তিনি আর লড়তে পারেন না। মধ্যস্থ ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। কালা আদমি যে জয়ী হবে, এটা তাঁর প্রাণে সইল না। কোথায় লুইসকে শাস্তি দেবেন, না, উল্টে তিনি রায় দিলেন, লড়াই না ক'রেও এ যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন লুইস। কিন্তু আমেরিকার অনেক নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞই প্রকাশ্যভাবে সংবাদপত্রে ঘোষণা করেছেন, সে যুদ্ধে গোবরবাবু পরাজিত হননি। মধ্যস্থের উচিত ছিল, অন্যায় প্যাঁচ কষার সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাহির ক'রে দেওয়া।

এ ছাড়া আরো কত বিখ্যাত কুস্তিতেই যে গোবরবাবু জয়মাল্য লাভ করেছেন, এখানে তাঁর সম্পূর্ণ ইতিহাস দেওয়া সম্ভব নয়। গোবরবাবুর অসুরের মতন ক্ষমতা দেখে আমেরিকার লোকেরা অবাক হয়ে গেছে। একবার একজন অতিকায় শ্বেতাঙ্গ পালোয়ানকে তিনি শিশুর মতন মাটি থেকে শূন্যে তুলে অতি অনায়াসে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। গায়ের জোর হিসাবে আমেরিকার কোন পালোয়ানই তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারেনি। আমেরিকার একখানা সংবাদপত্র সবিস্ময়ে লিখেছে যে, "গোবরের দেহ বাইরে থেকে দেখতে থলথলে। কিন্তু তার ভিতরে যে লোহার মতন শক্ত মাংসপেশী লুকানো আছে, এতে আর কোনই সন্দেহ নেই।"

গোবরবাবুদের বংশে শক্তি-চর্চ্চা হয়ে আসছে পুরুষানুক্রমে। প্রকাশ্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হয়েও রহমনি, কাল্লু, গামা, ইমামবক্স ও গুট্টা সিং প্রভৃতি ভারতের শ্রেষ্ঠ পালোয়ানদেরও সঙ্গে গোবরবাবু লড়বার সুযোগ পেয়েছেন। উপর-উক্ত পালোয়ানদের কেউ কেউ মাহিনা নিয়ে গোবরবাবুর আখড়ায় নিযুক্ত ছিল।

দেশের যুবকদের ব্যায়াম চর্চ্চা করবার জন্যে তিনি সাদর আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর এ আহ্বানে সকলের সাড়া দেওয়া উচিত। কারণ কুস্তি ও ব্যায়াম যে মূর্খ ও

গোবরবাবু

গুণ্ডার নিজস্ব নয়, বাঙালী ছাড়া পৃথিবীর সব জাতিই তা জানে ও মানে। গোবরবাবু নিজেও যে কতটা শিক্ষিত, যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই সে কথা বুঝতে পেরেছেন। গোবরবাবু স্পষ্টই বলেন, সাধারণ আহার্য্য গ্রহণ ক'রে এবং লেখা-পড়ার চর্চ্চা করতে করতেই অনায়াসে ব্যায়াম সাধনা চলতে পারে।

বাংলা দেশে মাইকেল, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আছেন, জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি আছেন, রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ প্রভৃতি আছেন,—জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে বিদ্বান বাঙালীর কোনই অভাব নেই, কিন্তু এদেশে দ্বিতীয় গোবর কোথায়? কেবল মস্তিষ্কের জোরেই কোন জাতি বড় হতে পারে না—জাতিকে বড় করতে হ'লে মস্তিষ্কের সঙ্গে চাই স্বাস্থ্য ও বাহুবল। এই স্বাস্থ্য ও বাহুবলের অভাবেই বাঙালী [illegible] বাঁচাতে পারে না, আর সব জাতির সঙ্গে বুক ফুলিয়ে হাঁটতে পারে না, বিশ্ব বাজারে নিজের প্রাপ্য আদায় ক'রে নিতে পারে না।

যে দেশের লোক এসে নিত্য আমাদের দুই পায়ে মাড়িয়ে চ'লে যাচ্ছে, পদাঘাতে আমাদের পাঁজরা ফাটিয়ে দিচ্ছে, দুর্ব্বল ব'লে আমাদের মানুষের মধ্যেই গণ্য করছে না, সেই বলদর্পিত দেশে গিয়েই যখন কোন বাঙালী যুবককে বিজয়ীরূপে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেখি, তখন কি আমাদের বুক দশ হাত হয়ে ওঠে না?

আমরা ভীরু ও দুর্ব্বল,—তাই সকল জাতিরা আমাদের উপরে এতটা অত্যাচার করতে ভরসা পায়। ঘুসির বদলে ঘুসি দিতে পারলে আমাদের সঙ্গে কেউ লাগতে আসত না। দুই-একটা দৃষ্টান্ত দি। একদিন গোবরবাবুর সঙ্গে আমরা চৌরঙ্গীর রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে পিছন থেকে একখানা গাড়ী একেবারে আমাদের গায়ের উপরে এসে পড়ল। গাড়ীর ভিতরে মেমের সঙ্গে এক সাহেব ব'সে ছিল। গাড়ীর সামনে আমাদের দেখে সাহেবটা অভদ্র ভাষায় কি বললে। গোবরবাবু তখনি ঘোড়ার মুখ চেপে ধ'রে চলন্ত গাড়ীখানা একেবারে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে চটে লাল হয়ে, গাড়ী থেকে নেমে তেড়ে এল। কিন্তু তার পরেই গোবর বাবুর চেহারা দেখে ও কথা শুনে বুঝতে পারলে যে, 'সে কেঁচো ভেবে সাপ ধরেছে! তখন সে আবার নেহাৎ ভালো-মানুষটির মতন সুড়্‌সুড় ক'রে নিজের গাড়ীতে ফিরে গিয়ে বসল।

আর-একবার গোবরবাবু ট্রেণে চড়ে কলকাতার বাইরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর কামরায় এক জন সাহেব এসে ঢুকল—একেবারে খাঁটি জন বুলের বাচ্ছা! খানিক পরে তার শোবার সাধ হ'ল। সে গোবরবাবুর মাথার উপরকার আসনে উঠে শুয়ে নীচে পা ঝুলিয়ে এমন ভাবে দোলাতে সুরু করল যে, গোবরবাবুর গায়ে বার বার তার পা লাগতে লাগল। গোবরবাবু একবার তাকে সাবধান ক'রে দিলেন, সে কিন্তু গ্রাহ্যও করল না। তখন গোবরবাবু আর কিছু না ব'লে তার একখানা ঝুলন্ত পা ধরে এমন আদর ক'রে টিপে দিতে লাগলেন যে, বিকট আর্ত্তনাদ ক'রে সাহেব চোখ একেবারে কপালে তুলে ফেললে! ওরে বাস্‌রে কালা আদমীর হাতে এত জোর! বলা বাহুল্য, তারপর সাহেবের আর পা দোলাবার সখ হয় নি! প্রত্যেক বাঙালীর দেহে যেদিন এমনি শক্তি হবে, সাহেবরা সেদিন আমাদের শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হবে—কিছুমাত্র আবেদন-নিবেদন না ক'রেই আমরা স্বরাজের অধিকারী হব।

—পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ৭৮ ...২র।

গোবরবাবু ভাতের ভক্ত, তিনি দু-বেলাই ভাত...লগাড়ী এসে থামল তখন মনটা দুলে
এমন ভীমের মতন শক্তি অর্জ্জন করতে পেরেছে স্টেসনে পৌঁছাবার আগে টেম্‌স নদী
খাওয়ার মাত্রাও বেশী নয়। সুতরাং ভেতো বাঙ নদী সেন্ নদীর মত দেখলুম। আমাদের
মনে করা মস্ত ভ্রম। আমাদের ইচ্ছা ও সাগুন সহরে প্রবেশের সময় এই টেম্‌স নদী
বীর্য্যবান ক'রে তুলতে পারবে। অনেকে ব'াড়ে।
জল খাওয়ার দোষ দেন। কিন্তু গোবরবাবুও বলি। বাড়ীটি বেশ বড়, আট একার
তার উপরে তিনি স্পষ্টই বলেন,—"পৃথিবীর এত...য়ছিল, খরচ হয়েছিল তিন মিলিয়ন
বাংলা দেশে আমার শরীর যেমন ভালো থাকে এ... একটি স্তম্ভে একটি বৃহৎ ঘড়ি লাগান;
সকলকে আর একটি কথা জানানো দর কাঁটা ১৪ ফিট লম্বা। ঘড়ির নীচে
জাতীয় ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করবেন। আশা ক... Big Ben বলে।
গোবরকে দেখে ধন্য হব,—কারণ বাঙালীকে আগে লিখেছি, ফরাসীদেশে কোন রাজা
জন্যেই গোবরবাবু এই শুভ অনুষ্ঠানে নিজপ্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন, এবং সেই
সফল হোক! এ ভেবে দেশ শাসন করেন। একে গণতন্ত্র

ক্রিকেট

ভারতে বিদেশী-টিমের' পদার্পন এই প্রথম নয়। ১৮৮৯-৯০ সালে মাননীয় জি, এফ্, ভাবনন তাঁর খেলোয়াড়ের দল নিয়ে এখানে খেলতে আসেন্ ; তখন এখানে এক বোম্বাই সহরের পার্শী ও ইউরোপীয়ান ছাড়া ,আর কোনও 'টিম্' ছিল না, সেই জন্য তাঁরা বেশ একটু নাম কিনে চলে গেলেন।
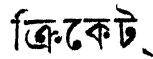
দ্বিতীয় আগমন হয় ১৮৯২ সালে, সে দলের নেতা ছিলেন লর্ড হক—তাঁর সময় পার্শী টিম্ ছিল ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

[illegible]

যে দেশের [illegible] এসে নি[illegible] আম আমাদের [illegible] দিচ্ছে, দুর্বল সেই [illegible] গিয়েছ যখন দাঁড়াতে [illegible], তখন কি আমাদের বুক

আম[illegible] দুর্বল,—তাই সব করতে ভরসা [illegible]। [illegible] বদলে ঘুঁ আসত না। দুই-একটা দৃষ্টান্ত দি।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে পি গায়ের উপরে এসে পড়ল। গাড়ীর গাড়ীর সামনে আমাদের দেখে সা তখনি ঘোড়ার মুখ চেপে ধ'রে চলন্ত সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে চটে লাল হ তার পরেই গোবর বাবুর চেহারা দেখে ভেবে সাপ [illegible]রেছে। তখন সে আবা করে নিজের গাড়ীতে ফিরে গিয়ে বসল।

তৃতীয় আগমন ১৯০২-০৩ সালে "অক্স্‌ফোর্ড উনিভার্সিটী আথেন্‌টীক্‌স্"—এই দলের সমস্ত খেলোয়াড়ই Century করে। তাঁদের শ্রেষ্ঠ জয় হচ্ছে এখানকার Calcutta C. C.র উপর, তাঁরা এদের এক innings আর ৩৩৩ রানে হারিয়ে দেন; তারা হারেন কেবল 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সি' ও 'পার্শী' দলের কাছে। প্রথম দলের পক্ষে ক্যাপ্টেন গ্রীগ্ ২০৪ রান করেন, দ্বিতীয় দল মাত্র ৪ জন খেলে জয়ী হয়।

এদের আগমনের পর থেকেই ভারতে ক্রিকেট খেলার ধূম পড়ে যায়, বালু, শিবরাম, শেষাচারি সালামুদ্দিন প্রভৃতি অনেক ক্রিকেট বীরের জন্ম হয়। এসব প্রায় ২০ বছরের কথা, লিখতে গেলে গল্প বড় হয়ে যাবে। এখন কেবল ক্রীড়াক্ষেত্রে দেখা যায় না। এই দুই বীর

১৮৯৬ সালে পাতিয়ালা টিমএর পক্ষে আম্বালা টিমের বিপক্ষে যথাক্রমে ২৫৭ (নট্ আউট) ও ২৫৫ রান করেন।

এখনকার এম্-সি-সি তাহলে ৪র্থ অভ্যাগত। তোমরা কেউ মনে করোনা যে ভারতীয় দল কেবল নিজের দেশেই বসে আছে! ১৮৮৬ ও ৮৮ সালে পার্শী দল (বোম্বাই) বিলাতে খেলতে যান, সেখানে তেমন 'কিছু' দেখাতে না পারলেও 'নুতন কিছু' শিখে এসে কয়েক বছর এখানে উঁচু আসন পেয়ে ছিলেন। আবার ১৯১১ সালে একটী অল ইণ্ডিয়া দল বিলাতে যায়। সেখানে তাঁরা ২৩টা ম্যাচ খেলেন ৬টায় জয়ী ও ২টায় সমান হন আর বাকিগুলো হেরে যান।

শোনা যাচ্ছে এখান থেকে আর একটা 'টিম্' নাকি শীঘ্রই বিলাত রওনা হবেন!

এখন, এম-সি-সি'র খেলোয়াড়গণ বোম্বাই ন যাওয়া যায়—আড়াই ঘণ্টা থেকে কি করেছেন তারই খবর দিয়ে বিদায় নেব।

এম, সি, সি, খেলেছে ১৭টা, জিতেছেন ৪টা, আর সব সমান। এদের বিপক্ষে সব চেয়ে ভাল খেলেছে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ও হিন্দু ক্লাব ও অল ইণ্ডিযা দল। এই অল ইণ্ডিয়া দল প্রথম ইন্‌ইংস খুব ভাল খেলেন। এই খেলায় হিন্দু খেলোয়াড় দেওধর ১৪৮ রান করেন। এম্ সি; সির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে এই দ্বিতীয় Century।

এম্-সি-সি'র পক্ষে ১২টা Century জমা আছে তার মধ্যে ৫টা করেছেন্ সাণ্ডহাম্, ৩টা, য়োয়েট্, ১টা আর্ল, ২টা টেট্ এবং ১টা পার্শন্।

৬ জন বিখ্যাত 'বোলারের' মধ্যে, নিয়াছেন:—

—পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় সহর। রেলগাড়ী এসে থামল তখন মনটা দুলে স্টেসনে পৌছাবার আগে টেম্‌স নদী নদী সেন্ নদীর মত দেখলুম। আমাদের গুন সহরে প্রবেশের সময় এই টেম্‌স নদী পড়ে।

বলি। বাড়ীটি বেশ বড়, আট একার যছিল, খরচ হয়েছিল তিন মিলিয়ন

একটি স্তম্ভে একটি বৃহৎ ঘড়ি লাগান র কাঁটা ১৪ ফিট লম্বা। ঘড়ির নীচে Big Ben বলে।

আগে লিখেছি, ফরাসীদেশে কোন রাজা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন, এবং সেই তা ভেবে দেশ শাসন করেন। একে গণতন্ত্র

হাওয়া ও বিষ্টিতে সমুদ্র দুলছিল, ডেকের এক কোনে চুপচাপ বসে কাটাতে হল। তারপর ক্রমে ক্রমে প্রায় ৯।১০ বার চ্যানেল পার হয়েছি, এখন আর কোন ভয় করে না। আর এখন চ্যানেলের গর্ব্ব অনেক খর্ব্ব হয়ে গেছে। এ বৎসর শুধু পুরুষ নয়, আমেরিকা থেকে একজন নারী এসে সাঁতরে চ্যানেল পার হয়ে গেলেন।

এই ইংলিশ চ্যানেলের কাছে সমস্ত ইংলণ্ড খুব ঋনী, এই সমুদ্রটুকু ইয়োরোপ থেকে ইংলণ্ডদ্বীপকে আলাদা করে রেখেছে, যদি এখানে কোন সমুদ্র না থাকত, যদি ইংলণ্ড ইয়োরোপের অন্য সব দেশের সঙ্গে স্থল দ্বারা যুক্ত থাকত, তাহলে ইংলণ্ডের ইতিহাস একেবারে অন্য রকম হয়ে যেত; ইংলণ্ডের এত প্রতাপ, এত সাম্রাজ্য, হত কি না সন্দেহ।

আজকাল এরোপ্লেনে পারি থেকে লণ্ডন যাওয়া যায়—আড়াই ঘণ্টা থেকে তিন ঘণ্টা প্রায় লাগে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী হচ্ছে লণ্ডন—পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় সহর। সুতরাং লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেসনে যখন রেলগাড়ী এসে থামল তখন মনটা দুলে উঠল। ষ্টেসনটি সহরের ভেতর। সুতরাং ষ্টেসনে পৌছাবার আগে টেম্‌স নদী পেরিয়ে সহরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। টেম্‌স নদী সেন্ নদীর মত দেখলুম। আমাদের দেশে তাকে নদী কেউ বলবে না। রেলে লণ্ডন সহরে প্রবেশের সময় এই টেম্‌স নদী ও তার ওপর পার্লামেণ্ট হাউস প্রথমে চোখে পড়ে।

এই পার্লামেণ্ট হাউস সম্বন্ধে প্রথমে বলি। বাড়ীটি বেশ বড়, আট একার জমির ওপর ১৮৫০ খৃঃ অব্দে এটি তৈরী হয়েছিল, খরচ হয়েছিল তিন মিলিয়ন পাউণ্ড। তিনটি সুন্দর স্তম্ভ আছে, তার মধ্যে একটি স্তম্ভে একটি বৃহৎ ঘড়ি লাগান; স্তম্ভটি ৩২০ ফিট উঁচু আর ঘড়িটির মিনিটের কাঁটা ১৪ ফিট লম্বা। ঘড়ির নীচে সাড়ে তের টন ওজনের ঘণ্টা ঝোলান, এটিকে Big Ben বলে।

তোমাদের বোধ হয় মনে আছে, আমি আগে লিখেছি, ফরাসীদেশে কোন রাজা নেই, সেখানে দেশের লোকেরা সবাই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন, এবং সেই প্রতিনিধিরা দেশের কিরূপে মঙ্গল হবে তা ভেবে দেশ শাসন করেন। একে গণতন্ত্র

বলে। ইংলণ্ডের একজন রাজা আছেন। তিনি আমাদেরও রাজা। কিন্তু বাস্তবিক দেখতে গেলে ফরাসীদেশের শাসন প্রণালীর সঙ্গে ইংলণ্ডের শাসন প্রণালীর খুব তফাৎ নেই। কারণ, ইংলণ্ডের যিনি রাজা, তিনি নামে রাজা, তাঁর প্রকৃতপক্ষে

পার্লামেণ্ট হাউস

কোন শক্তি নেই, দেশের লোকদের প্রজাদের অমতে তিনি কোন কাজ করতে পারেন না। তাঁর রাজ্য শাসন করে তাঁর মন্ত্রীরা। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের লোকেরা রাজ্যের আইন তৈরী করবার জন্যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন। এই প্রতিনিধিদের সভাগৃহ হচ্ছে এই পার্লামেণ্ট গৃহ। এই প্রতিনিধিদের মধ্যে যে মতের লোকের দল সবচেয়ে বেশী হয়, তাদের মতেই রাজ্য শাসন হয়, এবং সেই দল থেকেই রাজাকে তাঁর মন্ত্রী নিতে হয়। সুতরাং ইংলণ্ডে রাজা যেমন খুসি মত আইন করতে বা কাজ

করতে পারেন না, দেশের লোকেরা কি চায় সেই অনুসারে তাঁকে চলতে হয়। এই দেশের লোকেদের সভাগৃহ ও আইন তৈরী করবার জায়গা হচ্ছে পার্লামেন্ট।

পার্লামেন্টের কাছে একটি সুন্দর পুরাতন চার্চ্চ আছে। তার নাম হচ্ছে ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবি (Westminister Abbey)। এটি প্রায় ছশ বছর আগের তৈরী। লম্বায় ৫১৩ ফিট ও চওড়ায় ২০০ ফিট। পারির 'নোতর দামের" মত এটিও 'গথিক আর্টের একটি সুন্দর নমুনা, কিন্তু আমার কাছে নোতর দামের মত অত সুন্দর লাগল না। ভেতরে ইংলণ্ডের অনেক সাধু ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ লোকের সমাধি আছে, দক্ষিণ দিকের এক কোণে ইংলণ্ডের বড় বড় কবিদের স্মৃতিচিহ্ন আছে, এই চার্চ্চটি ইংরাজদের একটি গৌরবের জিনিষ ও মহাজনদের স্মৃতিময় তীর্থ।

লণ্ডনে সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রেল (St Paul's Cathedral) নামে আর একটি সুন্দর গির্জ্জা আছে, এটি লণ্ডনের মধ্যে সবচেয়ে বড়। বাইরে লম্বায় ৫১৫ ফিট। উপরে একটি সুন্দর গম্বুজ আছে তার ব্যাস হচ্ছে (diameter) ১০২ ফুট, গির্জ্জাটি ৩৬৫ ফিট উঁচু। এখানে একটি অতি পুরাতন গির্জ্জা ছিল, সেটি ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে আগুনে পুড়ে প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়, এই আগুনে লণ্ডনের অনেক বাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে গেছল। সেই আগুনের পর ক্রিসথোফার রেন নামে এক শিল্পী এই গির্জ্জা গড়ে তোলেন। সামনে থেকে দেখলে গির্জ্জাটি মনকে কিছু অভিভূত করে না, কিন্তু ভিতরে ঢুকলে শিল্পীর কায়দা বোঝা যায়। এই গির্জ্জা ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের সঙ্গে জড়ান। জাতির কোন বৃহৎ ব্যাপার হলে এখানে জাতির মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের কাছে উপাসনা হয়, রাজা আসেন।

পারির মত লণ্ডনও খুব পুরাতন সহর। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যখন রোমানরা ইংলণ্ডদ্বীপ অধিকার করেন, সে সময়ও এর নাম শোনা যায়। তখন এ জায়গাটা জোলো জমি ছিল, চারিদিক বন ও নদীর জলে ভরা। তখন এর নাম ছিল Lbyn-din বা হ্রদের মধ্যে দুর্গ, রোমনরা এসে এর নাম দেয় Lendinium। তখন এটি একটা ছোট সহর; তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী কত রাজরাণীর শাসন ও মৃত্যুর সঙ্গে কত রাজবংশের পতন ও উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ জাতির শক্তি ও সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি

সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রায় দু'হাজার বছর আগের গ্রাম এখন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় সহর। এখন বৃহত্তর লণ্ডনের (Greater London) আয়তন হচ্ছে ৬০২ বর্গ মাইল; লোকসংখ্যা হচ্ছে ৭,৪৭৬,১৬৮ (১৯২১ খৃঃ অব্দে)। চেরিং ক্রস
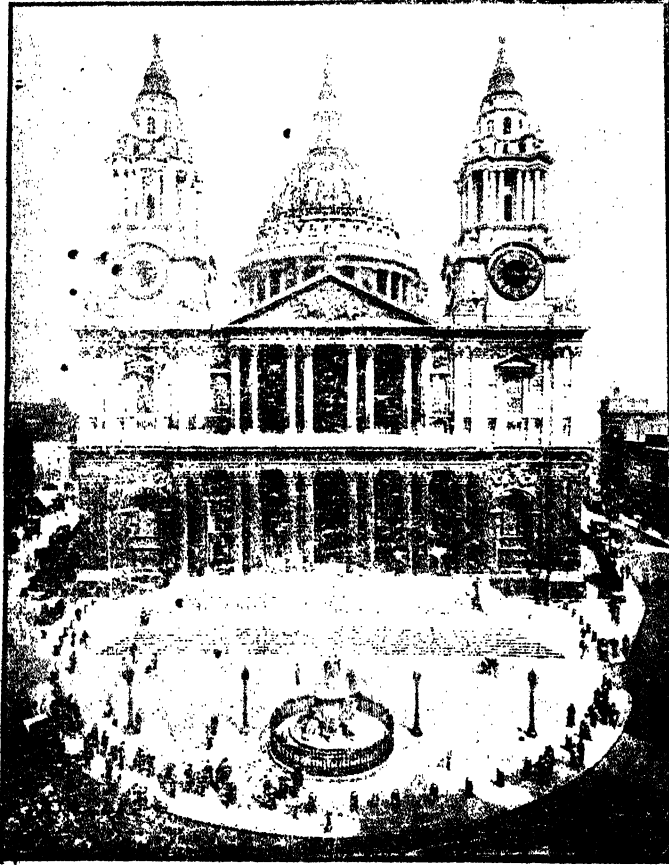
সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রেল

(Charing Cross) বলে লণ্ডনের একটি জায়গা আছে সেখান থেকে ১২ মাইলের মধ্যে চারিদিকে সব জায়গা লণ্ডন সহরের মধ্যে। এই বৃহৎ জায়গা জুড়ে আঁকা

বাঁকা লম্বা শত শত রাস্তা শত শত অলিগলি আর বৃহৎ বৃহৎ বাড়ীর সারি, বাড়ীর সারি। লণ্ডনের সব ছোট ও বড় রাস্তার নাম গুনলে, চার হাজারের ওপর হবে। এত বড় সহরে কোথায় কি আছে খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত। বিশেষতঃ একটা রাস্তা কোন পাড়ায় জানা না থাকলে কেউ বড় বলে দিতে পারবে না। তখন লণ্ডন পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। লণ্ডনে প্রবেশ করলেই রাস্তার মোড়ে পুলিসকে প্রথমে চোখে পড়ে। চারিদিকে জনতা ও ট্রাম বাস্ মোটর গাড়ী সবার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পুলিস কি সুন্দর ভাবে সব গাড়ীর চলাচল নিয়ন্ত্রিত করছে, তা দেখে অবাক হতে হয়। লণ্ডনের সাধারণ রাস্তা পারির মত এত চওড়া বড় সোজা সোজা নয়, এখানে ছোট রাস্তা, ভিড়ও খুব, তাই গাড়ীর জনতা সামলান বড় শক্ত ব্যাপার।

কোন অজানা জায়গায় যেতে হলে মোড়ের পুলিসকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। পুলিস অমনি বলে দেবে রাস্তাটা কোনদিকে। যদি বাসে (Bus) যেতে চাও ত বাসের নম্বর বলে দেবে, যদি ট্রামে যেতে চাও ত ট্রামের নম্বর বলে দেবে, যদি টিউবে যেতে চাও, কোন ষ্টেসনে কোন লাইনে যেতে হবে বলে দেবে আর যদি হেঁটে যেতে চাও, তবে কোথায় কোন মোড় ফিরতে হবে বলে দেবে। তাদের লণ্ডনের রাস্তা ঘাট সম্বন্ধে জ্ঞান দেখলে অবাক হতে হয়। তারা যেমন ভদ্র তেমনি কর্ত্তব্যপরায়ণ ও লোকের সাহায্য করতে সর্ব্বদা ব্যগ্র।

এই বড় লণ্ডন সহরের মধ্যে একটি ছোট লণ্ডন আছে,.. এটি হচ্ছে প্রাচীন লণ্ডন, খুব পুরান জায়গা; এই ছোট লণ্ডনের মধ্যে ট্রাম ঢুকতে পারে না, শুধু বাস্ (Bus) চলে। এই ছোট লণ্ডনে বা London Cityতে হাইকোর্ট, ব্যাঙ্ক, খবরের কাগজের আফিস বড় বড় দোকান ইত্যাদি অনেক প্রধান প্রধান জায়গা আছে।

কাজের দিনে এই লণ্ডন সহরের কোন বড় রাস্তায় দাঁড়ালে গাড়ীর জনতা ও লোকের জনতা দেখে অবাক হতে হয়। রাস্তার এক মোড় থেকে আর এক মোড় বড় বড় বাসের সারি তার মধ্যে ট্যাক্সি মোটরকার। ঘোড়ার গাড়ী বড় দেখাই যায় না। কখনও কখনও ২।১টা দেখা যায়। দুপুর বেলা খাবারের সময় যখন সব

ব্যাঙ্ক অফিস দোকান থেকে লোক বের হয় তখন প্রথমে মনে হয় রাস্তার পর রাস্তা জুড়ে বুঝি মেলা বসেছে। কিন্তু একটু পরে মনে হয় বুঝি সমস্ত সহরটা ক্ষেপে গেছে, সবলোক কোনদিকে উর্দ্ধশ্বাসে, ছুটছে। বাস্তবিক লণ্ডনে কাজের দিনে রাস্তায় সবাই ছোটে—লোকভরা বাস ছুটছে; লোকভরা মোটরগাড়ী ছুটছে, পথে খবরের কাগজ হাতে ছোকরা ছুটছে, দোকানে যারা কাজ করে সে সব মেয়েরা ছুটছে, আফিসের কেরাণীরা ছুটছে, কেউ দোকান হতে টিউব ষ্টেসনের দিকে ছুটছে, কেউ টিউব ষ্টেসন থেকে দোকানের দিকে ছুটছে, কেউ দাঁড়িয়ে নেই, অলস নেই, সবাই কাজে যেন মাতাল হয়ে গেছে। কারো একটু সময় অলস ভাবে কাটাবার যেন জো নেই।

কিন্তু এত বড় সহরের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা যেতে হলে ত অনেক সময় যায়। যারা খুব শীগগীর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা যেতে চায় তারা মাটির তলায় রেলে বা টিউবে (tube railways) এ ভ্রমণ করে। সমস্ত লণ্ডন সহর জুড়ে চারিদিকে মাটির তলা দিয়ে এ রেল গেছে। এ রেল প্রায় খুব গভীর, কোথাও কোথাও ১৮০ ফুট মাটির নীচে দিয়ে রেল গেছে। যে সব জায়গায় টিউব অনেক নীচে দিয়ে গেছে, সেখানে রেলের প্লাটফর্ম্মে যেতে হলে লিফটে করে নামবার ব্যবস্থা, কারণ সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলে অনেক সময় ও শ্রম খরচ হবে। বড় বড় বাড়ী বাগানের তলা দিয়ে এমন কি টেমস্ নদীর তলা দিয়ে এ রেলগাড়ী গেছে, এ রেল ইলেক্‌ট্রিকের জোরে ট্রামের মত চলে। মনে কর, ট্রামগাড়ী রাস্তার ওপর না চলে মাটির তলায় বেশ বড় সুড়ঙ্গ কেটে গঙ্গার তলা দিয়ে চলেছে।

এই টিউব রেলগাড়ীর কয়েকটি লাইন। বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন লাইন। কোন দিকের লাইন হয়ত খুব তলায় নয়। কোন দিকের লাইন খুব তলাতে। মাঝে মাঝে জংসন আছে, সেখানে এক লাইন থেকে আর এক লাইনের গাড়ীতে যাওয়া যায়। একটা লাইন উঁচু হলে, অপর লাইনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে হয়। পিকাডেলি (Piccadelly) ষ্টেসনে একটি বড় আশ্চর্য্যকর কাটের সিঁড়ি আছে,

সিঁড়িটি ১২।১৪ ফিট চওড়া হবে, দোতলা সমান উঁচু, সেটি অনবরত ঘুরে চলেছে, তুমি সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়ালে কয়েক মিনিট বাদে প্রথম ধাপটি ঘুরে নামতে নামতে তলায় এসে পৌঁছল, তুমি তলার প্লাটফর্ম্মে এসে পড়লে; আবার তুমি তলার লাইনের প্লাটফর্ম্ম থেকে সিঁড়ির তলার ধাপে দাঁড়ালে, তলার ধাপটি উঠতে উঠতে ওপরের লাইনের প্লাটফর্ম্মের ধাপে এসে পৌঁছল। আবার সিঁড়ির ধাপ যেমন ঘুরে যাচ্ছে তুমি তেম্নি সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে পার, তাতে আরও তাড়াতাড়ি নামবে। বাস্তবিক এ সিঁড়িটি বড় আশ্চর্য্যকর।

পুরান সহরের মধ্যে ট্রাফালগাব স্কোয়ার একটা প্রসিদ্ধ জনতাময় জায়গা। এই স্কোয়ারটি প্রায় একশ' বছর আগের তৈরী। মাঝে বীর নেলসনের স্মৃতিস্তম্ভ। স্তম্ভটি ১৪২ ফিট উঁচু তার মাথায় নেলসনের মূর্ত্তি। নেলসন জলযুদ্ধের একজন প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ছিলেন। তিনি ১৮০৫ খৃঃ অব্দে ট্রাফালগার নামে এক জল যুদ্ধে ফরাসীদের হারান। তাতে ইংরাজদের সমুদ্রে শক্তি খুব বেড়ে যায়। তাই ইংরাজ জাতি তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ সহরের মাঝখানে তৈরী করেছে।

পুরান সহরের মাঝে অনেক ছোট ছোট স্কোয়ার বা ছোট বাগান ছড়ান আছে। তা ছাড়া বড় লণ্ডন সহরে অনেক বড় বড় পার্ক আছে, তার মধ্যে হাইড পার্ক খুব প্রসিদ্ধ। যেখানে এত লোক থাকে সেখানে বড় বাগান বা খোলা জায়গা না থাকলে লোকের স্বাস্থ্য ভাল থাকতে পারে না। আর বেড়াবার জায়গাও থাকা দরকার। হাইড পার্ককে লণ্ডনের ফুসফুস বলে। বাস্তবিক এতবড় সহরে খোলা জায়গা না থাকলে লোকের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেত। হাইড পার্ক হচ্ছে ৩৬১ একর জমি জুড়ে; তার মাঝখান দিয়ে ও চারিদিকে বড় বড় রাস্তা গেছে। হাইড পার্কের চারদিকে ঘুরলে তিন মাইলের ওপর হয়।

কলকাতার গড়ের মাট খুব বড় বটে, কিন্তু গড়ের মাঠ সহরের একদিকে, শুধু চৌরঙ্গীর ওপর বাড়ীগুলি গড়ের মাঠের সুখ ও সুবিধা বেশীর ভাগ উপভোগ করে। কিন্তু হাইড পার্কে সহরের মধ্যে। হাইড পার্কের পাশে কেনসিংটন বাগান; এটিও বেশ বড় ২৭৫ ওপর। এ বাগান হচ্ছে ছেলেমেয়েদের বেড়াবার ও খেলার

বার জায়গা। বিকেল বেলা দেখা যায় ঝিরা ঠেলাগাড়ী করে ছোট ছেলেদের

ট্রাফালগার স্কোয়ার ও নেলসন কলম

হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে, ছেলেমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করছে, দিঘির জলে কাগজের নৌকা ভাসাচ্ছে।

কেনসিংটন বাগান ও হাইড পার্কের মাঝখান জুড়ে সাপের মত একেবেঁকে একটি প্রকাণ্ড সুন্দর দীঘি আছে।

হাইড পার্কের উত্তর পূর্ব্ব কোণে চারটি বড় বড় রাস্তা এসে মিশেছে, সেইখানে একটি সুন্দর মার্বেলের তৈরী জয়স্তম্ভ বা Marble Arch আছে। এটি তৈরী করতে নাকি আশি হাজারের ওপর পাউণ্ড খরচ হয়েছিল। এ জায়গাটা খুব গাড়ীর
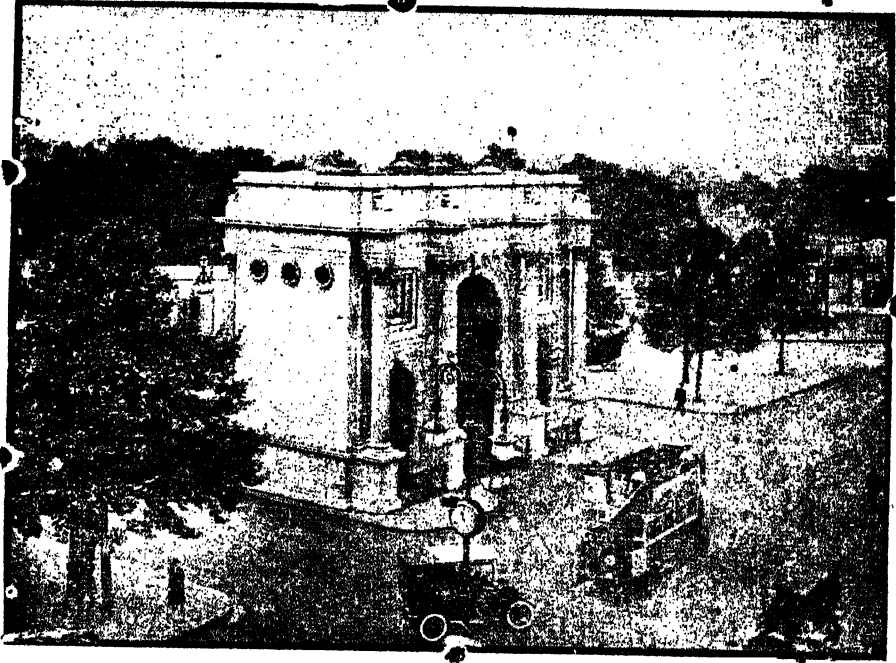
মার্ব্বেল আর্চ্চ

ভিড়। কিছুদিন আগে হিসেব করে দেখা গেছে, সকাল আটটা থেকে রাত আটটার মধ্যে প্রতিদিন এই জায়গা দিয়ে কম করে ত্রিশ হাজার মোটর বা গাড়ী গেছে অর্থাৎ মিনিটে চল্লিশের উপর গাড়ী যাতায়াত করছে।

লণ্ডন সহরে প্রথমে আসলে এই লোকের ভিড় ও গাড়ীর ভিড় বিশেষতঃ কালো কালো বাড়ীর চেহারা দেখে সহরটা মোটেই ভাল লাগে না। পুরাতন সহর ঘুরে মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড বাজার বা বড় বড় দোকানবাড়ীর সহর,

শুধু শিল্প ও ব্যবসা। আর সহরতলীতে রাস্তার পর রাস্তায় এক রকমের বাড়ীর সারি। এখানে নিয়ম হচ্ছে এক রাস্তায় সব বাড়ী এক রকম দেখতে হওয়া চাই, একরকম উঁচু হবে, সামনে ঠিক একরকম দেখতে হবে। আর বাড়ীগুলো সর্ব প্রায় কালো বা কাল্‌চে। এখানে প্রায়ই বড় ধোঁয়া হয় বিশেষতঃ শীতকালে কালো ধোঁয়ার কুয়াসা বা ফগ ভীষণ হয়, তাতে সব বাড়ী কালো হয়ে যায়। আর বাড়ী যত কালো ও পুরাতন দেখায় লণ্ডনবাসীরা ততই পছন্দ করে। বাড়ী অনেক দিনের পুরাতন দেখালে গৃহস্বামীর খুব গৌরব অনুভব করে।

শীতকালে লণ্ডনে কালো ধোঁয়া ও কুয়াসা মিশে মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়। তার কাছে কলকাতার পথে শীতকালে সন্ধ্যায় মাঝে মাঝে যে ধোঁয়া জমে তা কিছুই নয়। এই black fog বা ধোঁয়ার কুয়াসা পৃথিবীর আর কোন সহরে দেখা যায় না। মনে কর ঘন কালো রংএর নিবিড় মেঘ—এত ঘন যে সামনের মানুষ দেখা যায় না, পথে চল্লে মনে হয় বুঝি ধোঁয়ার মাঝখান দিয়ে চলেছি। অবশ্য সামনের মানুষ দেখা যায় না, এরূপ ঘন কুয়াসা খুব কম হয়। এরূপ কালো কুয়াসা হলে সহরটী কিন্তু অনেক ভাল দেখায়। দিনের আলোয় কালো কালো বাড়ীর সারি দেখে ভাল লাগে না। কিন্তু যখন অন্ধকার হয়, কালো কুয়াসা হয়, বড় বড় বাড়ীগুলি অবছায়ার মত মনে হয়, রাস্তার আলোগুলির পোস্টগুলি দেখা যায় না, শুধু আলোগুলি দীপ্ত রহস্যময় চোখের মত চেয়ে থাকে; সেই কুয়াসার মধ্যে দোকানের আলোর ঝলমলানি, বাসের আলো, মোটরের আলোর টলমলানি, অন্ধকার তারার ঝিলিমিলির মত ঝলমল করে। পথের লোকের সারি অদ্ভুত রহস্যময় হয়, লোকেদের মুখ দেখা যায় না, শুধু কালোমূর্ত্তি অস্পষ্ট ছায়া। এই আলো অন্ধকার শুভ্রতা মলিনতা কাজের ব্যস্ততা ও কুয়াসার স্নিগ্ধ স্তব্ধতা মিলে যেন রহস্যালোক তৈরী করে। এই রাতের লণ্ডনের বা কুয়াসাছন্ন বৈদ্যুতিক আলোকদীপ্ত লণ্ডনের মায়ারূপ অনেক শিল্পি ছবিতে এঁকেছেন, অনেক লেখক মুগ্ধ হয়ে বর্ণনা করেছেন। লণ্ডনভক্তেরা বলে দীর্ঘকাল লণ্ডনে না থাকলে তার রস সৌন্দর্য্য বোঝা যায় না।

লণ্ডনে একটি জিনিষ দেখে আনন্দ পেয়েছিলুম। সেটি হচ্ছে Tower of London। এটি অনেকটা দুর্গের মত তৈরী, প্রায় ন'শ বছর পুরাতন হবে। চারিদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা তারপর গভীর খাদ। বাড়ীর স্তম্ভগুলি বেশ পুরাতন সুন্দর। টাওয়ারের ভেতর গিয়ে সেই বহু পুরাতন ছোট ঘোরান সিঁড়ি ও সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকে মনে হল যেন রাজপুতানার কোন দুর্গে ঘুরছি।
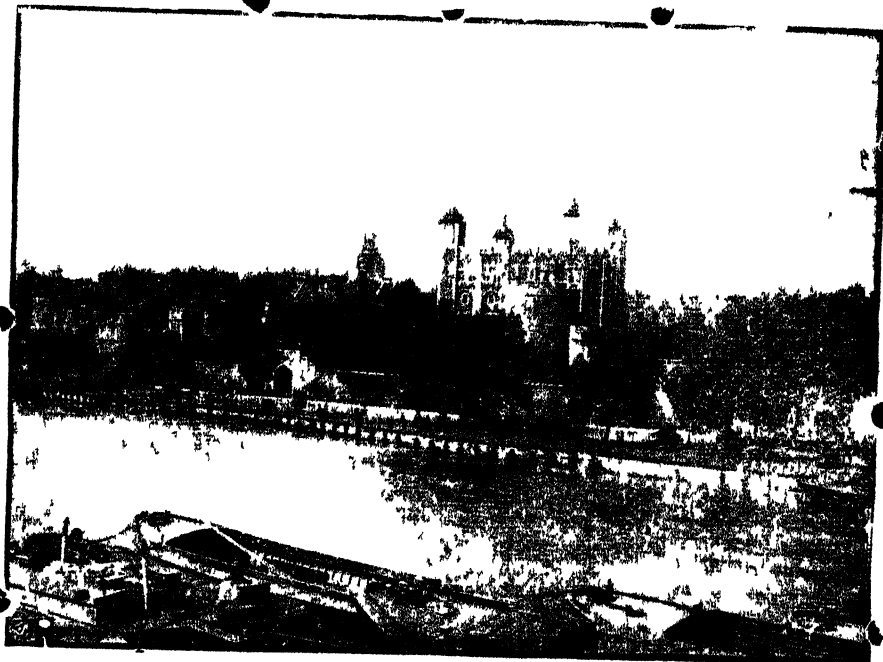
টাওয়ার অব লণ্ডন

ইংলণ্ডের ইতিহাস না জানলে টাওয়ারের ইতিহাস বোঝা যায় না। এটী কখনও দুর্গরূপে ব্যবহার হয়েছে, কখনও রাজার প্রাসাদরূপে ব্যবহার হয়েছে, কখনও বা বন্দীশালারূপে ব্যবহার হয়েছে।

চারজন বিদেশীয় রাজা এক সময় এখানে বন্দীরূপে ছিলেন। বালক রাজা

পঞ্চম এডোয়ার্ড ও তার ছোট ভাইএর নির্ম্মম হত্যার কথা টাওয়ারের সঙ্গে জড়ান। কত বিষাদ করুণ স্মৃতি কত পুরাতন দিনের অত্যাচার ও পাপের কথা এই পুরান বাড়ীর পাথরের সঙ্গে মেশান। এখন এই টাওয়ারের এক অংশে সেনারা থাকে অপর অংশ সাধারণকে দেখাবার জন্যে। নানাপ্রকার অস্ত্রের কয়েকটা ঘর সাজান আছে।

তাছাড়া রাজা ও রাণীর কয়েকটা মুকুট ও জহরাৎ (Crown jewels) ইত্যাদি একটি গোল ঘরে সবাইএর দেখবার জন্যে সাজান আছে। তার মধ্যে রাণী ভিক্টোরিয়া ও রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড যে মুকুট পরে রাজপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন সেটি খুব সুন্দর, তাতে প্রায় তিন হাজার হীরক খণ্ড ও তিনশ মুক্তা বসান, তাছাড়া আরও মণিমাণিক্য বসান। বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ যে মুকুট দিল্লীর দরবারে পরেছিলেন সেটিও সুন্দর তাতে ছ হাজারের ওপর হীরকখণ্ড বসান আছে।

কিন্তু টাওয়ার এই হীরকখচিত মুকুটগুলির দীপ্তিতে নয়, পুরাতন দিনের নানা রাজবন্দীর দীর্ঘশ্বাসে ভরা।

লণ্ডনের সব কথা লিখতে গেলে এক বৎসরের মৌচাকের সব পাতা ভরে লিখলেও শেষ হবে না। লণ্ডন সহরের ওপর লোকে যত বই লিখেছে, পৃথিবীর অন্য কোন সহরের ওপর এত বই নেই।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় সহর যদিও সব চেয়ে সুন্দর নয়, তবু এর একটা আশ্চর্য্যকর আকর্ষণ আছে।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু
সুইজারল্যাণ্ড

পাদুকা রহস্য

সংস্কৃতের পড়া পারিতাম না বলিয়া বুড়ো পণ্ডিত মহাশয় বরাবরই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া আসিতেছিলেন, "শোভনাকে আর একটী বৎসর অন্ততঃ থার্ড ক্লাশে পড়িয়া থাকিতে হইবে"। কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, এক বৎসর কেন? একটী দিনও আমাকে আর পড়িয়া থাকিতে হইল না। পাশ করার আনন্দে, তুইটি দিন খুব মতামাতি করিয়া, তৃতীয় দিন বড় দিনের ছুটী উপলক্ষে আমরা এক এক জন মামার বাড়ী, মাসীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে এক এক দিকে ছড়াইয়া পড়িলাম!

দেখিতে দেখিতে ছুটীর দিন ফুরাইয়া বোর্ডিংএ ফিরিয়া যাইবার দিন আসিল, যথা সময়ে এক দিন সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষিপ্ত প্রবাসের মায়া কাটাইয়া ট্রেনে উঠিলাম। বেলা প্রায় নটার সময় মোগলসরাই ষ্টেশনে যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ ইলারা দুই বোনকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়া আনন্দের আর আমার সীমা রহিল না হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। যাহা হউক তবু ত একটু গল্প করিয়া এতখানি পথ কাটাইবার একটি উপায় হইল ইলা বলিল, তারা মামার বাড়ী বেনারসে গিয়াছিল, তাহার মতে ছুটির দিন গুলি উপভোগ করিবার পক্ষে, মাতুলালয় অপেক্ষা যোগ্যতর স্থান, দেবলোকেও আছে কিনা সন্দেহ' স্কুল বোর্ডিংএর ঘণ্টা বাঁধা, খাওয়া, নাওয়া চলা, ফেরার মধ্যে ফিরিয়া আসিলাম। পাশ করিবার আনন্দেই হউক অথবা অন্য কোন কারনেই হউক আমার কিন্তু সদ্য সদ্য আবার নূতন বইখাতার স্তূপের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া দেওয়াটা মোটেই পছন্দ হইল না, সুতরাং মনোযোগটা নামে মাত্র পড়ার দিকে রাখিয়া কার্য্যতঃ প্রায় সবটাই খেলায় নিয়োজিত করিয়া ফেলিলাম। টেনিস খেলায় আমাদের সেবার ভয়ানক উৎসাহ! এক জন শিক্ষয়িত্রী আমাদের টেনিস শিখাইতেন। খেলিবার জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই এক জোড়া করিয়া সাদা টেনিস জুতা ছিল। যাহারা বোর্ডিংএ থাকিত না তাহারা বইয়ের ব্যাগেই নিজের নিজের জুতো লইয়া আসিত; জুতার সহিত এক ধারে একত্র বন্দী হইয়া থাকাটা মা সরস্বতীর মনঃপুত ছিল কি না জানি না। তবে ইহাতে যে

বিদ্যাদেবীর নিকট অপরাধী হইতে হয়, এ কথাটা মনের মধ্যে এক আধ্‌বার উঁকি মারিলেও খেলার উৎসাহে বোধ করি তাহা বড় একটা বিচার করিয়া দেখিত না। তাহারা স্কুলে পৌঁছিয়া কাপড় ছাড়িবার ঘরে ব্যাগ ও জুতা রাখিয়া বইগুলি লইয়া ক্লাসে যাইত। এই জুতা লইয়া একটা রহস্যের মাত্রা দিনের পর দিন অজ্ঞাতে বাড়িয়া উঠিতেছিল। সে দিন তাহা প্রকাশ হইয়া গেল।

কাপড় ছাড়িবার ঘরের সম্মুখেই খেলার মাঠ। সিঁড়ির উপর বসিয়া সকলে মিলিয়া জটলা করিতেছি, খেলা আরম্ভ হইতে তখনও মিনিট কুড়ি দেরী ছিল। রমলা এদিক ওদিক চাহিয়া শুষ্ক মুখে বলিল 'তোরা কেউ আমার টেনিস জুতা জোড়া দেখেছিস্ ভাই ?"

সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি উৎসুক তরুণ কণ্ঠ সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল "কেনরে তোর জোড়াও আবার হারাল না কি ?"

"হ্যাঁ ভাই দেখ্‌না, সাড়ে দশটার সময়, ব্যাগটা রেখে ক্লাশে গেছি, এরি মধ্যেই নেই, আমি এখন খেলি কি পরে ?"

একটী মেয়ে কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বেনী দুলাইয়া বলিয়া উঠিল "সত্যি ভাই কাপড় ছাড়িবার ঘরটী যেন ভূতের ঘর হয়ে উঠেছে, এটা নিয়ে কবার হ'ল বল্ দেখি ?"

একটি ছোট্ট মেয়ে বলিল "এ সপ্তাহে এবার নিয়ে তিনবার, আর এর আগে পাঁচবার"।

আমি রমলাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম "হ্যাঁ, ফিরে দেবে বৈ কি ? যেই নিক্ ঠাট্টা করেই নিয়েছে।" কিন্তু কে যে লইয়া যায়, কি করিতেই বা লয় এবং ফিরিয়াই বা দেয় কেন, এ সকলের রহস্য আমার নিকটেও তুল্যরূপ অন্ধকারাবৃত ছিল।

অতঃপর সকলে মিলিয়া একটি যুক্তি স্থির করিবার জন্য একত্র হওয়া গেল। প্রথমে সকলে ঠাট্টা মনে করিয়া এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করে নাই, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঠাট্টার মাত্রা ছাড়াইয়া এটা একটা রীতিমত বিরক্তিকর ব্যাপারে পরিনত হইল। যেমন করিয়াই হউক চোরকে ধরিতেই হইবে এই সংকল্প করিয়া সুধাদিদি নিজেই

এ রহস্য সমাধানের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি তখন প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্রী, পড়াশুনা, খেলাধুলা, সর্ব্ব ব্যাপারেই অগ্রণী। তিনি রমলাকে, জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ যখন তুমি ব্যাগ রেখে ক্লাশে যাও তখন জুতা ছিল ?

"ছিল"

"তারপর আবার ব্যাগ খুল্‌লে কখন ?"

"এইত একটু খানি আগে, পাঁচটার সময়।"

"টিফিনের সময় খোল নি ?"

"না"

"আচ্ছা পাঁচটার সময় ব্যাগ খুলে কি দেখ্‌লে ?"

"দেখলাম জুতাটুতা কিছু নেই।"

করুণা বলিয়া উঠিল "আমার বেলাতেও ঠিক তাই সুধা দিদি, কিন্তু, ঠিক তারপর দিনই আমি আবার আমার ব্যাগের মধ্যেই জুতা ফিরে পাইয়াছিলাম।"

সুধা দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা জুতাগুলো নিয়ে কি করা হয় কেউ লক্ষ্য করে দেখেছ ? কেহ পায়ে দিয়াছে বলে মনে হয় ?"

এক জন বলিল, "আমার জোড়া ত পায়ে দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয় না।"

করুণা বলিল, "আমার জোড়াও পায়ে দিয়াছিল বলে বোধ হয় না।"

সুধা দিদি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমলা, তোমার ক্লাশের মেয়েরা যারা স্কুলে এসেছিল তারা সবাই এখানে আছে কি ?"

রমলা শুনিয়া বলিল, "ইনা আর মলিনা ছাড়া সবাই রয়েছে।"

"ওদের কারুর জুতা হারিয়েছিল ?"

"শুধু মলিনার হারিয়েছিল।"

থার্ড ক্লাসের একটী ছোট্ট মেয়ে বলিল, "ইলাদিরও ত হারিয়েছিল। আমি জানি একদিন টিফিনের সময় এসে দেখি ইলাদি আমার ব্যাগ খুলে কি খুঁজছে। জিজ্ঞাসা করতেই তাড়াতাড়ি বন্ধ ক'রে দিয়ে, বল্‌লে যে তার টেনিস জুতো জোড়া খুঁজে পাচ্ছে না। অন্য কেউ ভুলে নিজের ব্যাগে রেখেছে কি না, তাই দেখ্‌ছিল।

ইলাদি আরও বললে, তার ডান পায়ের জুতোটার ভিতরে এক পরদা চামড়ার সেলাই খুলে গিয়ে সেখানটা একটি ছোট্ট পকেটের মত হয়ে গেছল।'

বলা বাহুল্য ঐ সকল তথ্য রহস্য সমাধান বিষয়ে, সুধাদিকে, কোন অংশেই সাহায্য করে নাই। তিনি অবশেষে বলিলেন, "গোয়েন্দার মত মেয়েদের পেছনে লেগে থাকতে আমার যদিও সে রকম ইচ্ছা নাই। কিন্তু হাতে হাতে ধরা না পড়লে যে সত্যিকথাটা বলে ফেলবে, এমন শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী মেয়েও ত তোমরা নও। অতএব তোমাদের ওপর চোখ না রেখে উপায় নেই। চোর ধরা পড়লে কিন্তু তাকে খুবই নাকাল হতে হবে মনে রেখো।"

এই ঠিক হইল, পরদিন প্রথম ঘণ্টায় সুধাদি ক্লাশে যাইবেন, আমি তখন কাপড় ছাড়িবার ঘরের উপর চোখ রাখিব। তাহার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘণ্টায় যথা ক্রমে আমি দোতলায় সঙ্গীতের ক্লাশ হইতে আর সুধাদি বাহির হইতে লক্ষ্য রাখিবেন। সাধারণতঃ স্কুল বসিয়া যাওয়ার পর কাপড় ছাড়িবার ঘরে কাহারো কোন প্রয়োজন থাকিবার কথা নয়। সুতরাং সেরূপ সময় যাহাকে ঘরে যাইতে দেখা যাইবে, তাহাকেই অনুসরণ করিয়া গিযা দেখিতে হইবে, সে কি করে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল চুরিটা টিফিনের ঘণ্টা পড়িবার পূর্ব্বেই সম্পন্ন হয়।

তাহার পরদিন স্কুলে যাওয়ার সময় ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। স্কুলে গিয়া দেখি সকলে মিলিয়া শিক্ত বস্ত্রে বারান্দায় দাঁড়াইয়া মহা হট্টগোল আরম্ভ করিয়া দিয়েছে। গাড়ীর পর গাড়ী মেয়েরা নামিয়া আসিয়া ক্রমশঃ দলে যোগ দিয়া গোলযোগের পরিমাণ বাড়াইয়া তুলিতেছে। গাড়ীর ভিতর বন্ধ হইয়া আসিয়াও ইহারা কি করিয়া ভিজিয়া গেল। ঠিক বুঝিতে না পারিয়া এক জনকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বললে, "কেন ভাই, বোর্ডিং থেকে এইটুকু আসতেই যদি তুমি ভিজে গিয়ে থাক, তা'হলে আমাদের তিনশো সাতান্নটী গলি ঘুরে আসতে ভিজে যাওয়াটা আর এমন বেশী কথা কি?" বলা বাহুল্য ভিজে যাওয়াটা সকলের ইচ্ছাকৃত এবং ইহার মূলে সু'ই হউক আর কু'ই হউক একটা অভিসন্ধি ছিল।

ইলা গাড়ী হইতে নামিয়া বোর্ডিংএ গিয়া, ইন্দিরার কাছ হইতে একখানি শাড়ী

চাহিয়া লইয়া ভিজা কাপড় ছাড়িয়া আসিয়াছিল, সুতরাং সে এবং আমি যথেষ্ট পরিমাণে ভিজি নাই, এই অপরাধে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নামিয়া গিয়া আরও ভিজিয়া আসিতে হইল। যথা সময়ে শিক্ষয়িত্রীগণ আসিয়া তাহাদের ছাত্রাদের সকলকেই এক একটী সিক্ত বিড়ালে পরিণত হইতে দেখিয়া স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা করিয়াই বোধ করি সেই দিন ছুটি দিয়া দিলেন। আমাদের জলে ভিজা সার্থক হইল।

ছোট বড় সকলের মন ছুটির আনন্দে ভরিয়া দিয়া স্কুলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল ঢং ঢং ঢং। দুই তিন জন হাত ধরাধরি করিয়া মেয়ের দল একে একে নামিয়া গেল। তখনো গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হইতেছিল দেখিয়া আমি বাহিরে না গিয়া সঙ্গীতের ক্লাশে বসিয়া পিয়ানোটা বাজাইতে আরম্ভ করিলাম। আমার বাম হাতের গোড়াতেই জানালা, সেখান হইতে ছোট্ট সবুজ মাঠের টুকরাটি পার হইয়াই আমাদের কাপড় ছাড়িবার ঘর দেখা যায়! কিছুক্ষণ এটা ওটা বাজাইবার পর উঠিয়া পড়িলাম ততক্ষণে বৃষ্টি থামিয়া বর্ষণের ঝাপসা অন্তরাল হইতে আকাশের নীল সৌন্দর্য্য আবার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

জানালা বন্ধ করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইলাম নীলাম্বরী শাড়ী পরা একটী মেয়ে ছুটিয়া গিয়া কাপড় ছাড়িবার ঘরে ঢুকিল। তাড়াতাড়ি ছুটিলাম সিঁড়ির দিকে। নীচে পৌঁছিয়াই সুধাদিদির সহিত মাথায়-মাথায় প্রচণ্ড বেগে ঠোকাঠুকি হইয়া গেল। তিনিও পাশ দিয়া ছুটিয়া আসিতেছিলেন, ছুটিয়াই চলিয়া গেলেন। উঃ করিয়া মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে পিছন পিছন ছুটিয়া কাপড় ছাড়িবার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি সুধাদিদি দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া, আর ইলা মেঝেয় বসিয়া সম্মুখে একটি খোলা ব্যাগের ভিতর মাথা গুঁজিয়া কি খুঁজিতেছে। তাহার বাম পার্শ্বেই আর একটি স্কুল ব্যাগ খোলা পড়িয়া রহিয়াছে—সেটি তাহার নিজের। আমার পদশব্দ পাইয়াই সে তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া চাহিল। সুধাদিদি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "চুরি করে পরের ব্যাগ খুলে দেখাটা মোটেই ভাল কাজ নয়। কিন্তু তুমি কি খুঁজছিলে ওর ভেতর?" ইলা চুপ করিয়া রহিল। "এসব তাহলে তোমারি কীর্ত্তি। কি মেয়ে বাবা, আচ্ছা রোজ-রোজ......।"

'তুমি যে চুপ ক'রে রইলে, ইলা, কথার উত্তর দাও।'

উত্তর দেবে কি, সে আমাদের রকম দেখিয়া বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে আত্মস্থ হইয়া বাঁকা ভ্রূজোড়া কুচকাইয়া বলিয়া উঠিল "বাঃ রে! আজ দশ দিন ধরে আমার জুতো পাচ্ছিনা। কার সঙ্গে বদল হয়েচে তা খুজে দেখ্‌ব না?"

"কেন তোমার পায়ে কার জুতো রয়েছে? তোমার নিজের নয়?"

"না আমার জোড়া এর চেয়ে পুরোনো এ কার আমি জানি না।"

"নেই বা জান্‌লে! তুমি পুরোণোর বদলে নূতন পেয়েচ, তবে আবার খুঁজে মরচ কেন?"

'না তাতে আমার একটা জিনিষ লুকানো রয়েচে, তাই খুঁজ্‌চি।"

"আমি কৌতুহল চাপিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলাম জুতোর ভেতর জিনিষ? কি জিনিষ ভাই?"

"হ্যাঁ সত্যি। কয়েক দিন হল আমার জন্ম দিনে নেলু দাদা, আমায় এক খানা দশ টাকার নোট উপহার দিয়াছিলেন। আমার ডান পায়ের জুতোটার ভেতর এক পরদার চামড়ার সেলাই খুলে গিয়ে সেটা ছোট্ট একটা পকেটের মত হয়ে গেছ্‌ল, আমি তখন তাড়াতাড়ি স্কুলে আসছিলাম বলে নোটখানা চট্‌ করে তার ভেতর গুঁজে দিয়ে জুতো জোড়া ব্যাগে রেখে দিলাম। স্কুলে পোঁছে ক্লাশে যাওয়ার আগে যখন কাপড় ছাড়িবার ঘরে জুতো রেখে আসি আমি তখন আর নোটের কথা তাড়াতাড়িতে মনে ছিল না। সেই দিনই কার সঙ্গে যে বদল হয়ে গেল তা এত করে খুঁজেও জানতে পাল্লুম না।" বীনা এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল। একটা বড় গোছের স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল "ওঃ হো! এতক্ষণে হয়েচে। ভাই ইলা, আমারি ভুলের জন্যে তোর জুতো আমার কাছে আর আমার জুতো তোর কাছে চলে গেছে। এই নে তোর নোট। সে দিন যদি মায়াদি খেলতে যাওয়ার জন্য অত তাড়া না দিতেন তা হ'লে হয়ত তোকে এত কষ্ট পেতে হ'ত না। একই রকম জুতো তাড়াতাড়িতে অতটা লক্ষ্য করি নি। তুই কিছু মনে করিস্‌নে ভাই"

সমস্ত ব্যাপারটা এতক্ষণে আমাদের কাছে জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। একটু

থামিয়া কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত বীণা আবার বলিল। "দেখ ইলা, এই নোট খানাই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। তোর মত একটা বোকা মেয়ে আবার উপহারের যোগ্য ?"

সুধা দিদি বলিলেন, "আচ্ছা বেশ বুঝলাম তোমরা দুই জনেই বুদ্ধির ঢেঁকি এক একটি! কিন্তু এত কাণ্ড করে রোজ পাঁচ জোড়া জুতো মাথায় করে বাড়ী নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা না করে এটা কাহাকেও জানাও নি কেন ?"

ইলা বেচারী লজ্জায় রাঙা হইয়া উত্তর দিল, "আমার ভারি লজ্জা হচ্ছিল।"

"বোকা মেয়ে। আর আমি যদিএখন সকলকেই বলে দেই ?" এই বলিয়া সুধা দিদি উত্তরের আশায় ইলার মুখেব দিকে চাহিলেন। বীণা ও ইলা দুই জনই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল "না সুধ দিদি, লক্ষীটি, বলবেন না,—দুটি পায়ে পড়ি।"

"আচ্ছা বলব না। কিন্তু যদি কাহারও জুতা হারায় তবে তোমাদেরকেই ধরা হবে, মনে রেখো। এমন ছেলেমানুষ সব .. ।" বলিতে বলিতে সুধাদিদি চলিয়া গেলেন।

তাহাদের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া আমি যে আজ একথা সকলের কাছে প্রচার করিয়া দিতেছি, একথা জানিতে পারিলে ইলা হয়ত বলবে "শোভনা পোড়ামুখীর সঙ্গে আড়ি!" আর বীণা হয়ত সোজাসুজি আমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থাই করিয়া বসিবে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে তাহার পর যে দুই বছর বোর্ডিংএ ছিলাম তাহার মধ্যে আর কাহারো জুতা হারাইয়া ছিল বলিয়া শুনিতে পাই নাই।

শ্রীজাহান্ আরা বেগম.

মা হারা

স্কুলের দোতালার এক কোণের ঘরে পঞ্চম শ্রেণীতে যখন আঁকের মাষ্টার মহাশয় এক মনে ছেলেদের আঁকের মর্ম্ম বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন সকল ছেলেই মন দিয়ে তা শুনছিল,—কেবল সুনীল ছাড়া। সে রাস্তার ধারের জানলার কাছে একটা বেঞ্চের প্রান্ত অধিকার করে বাহিরের দিকে চেয়েছিল।

রাস্তার উপরেই খোলার ঘরে একটা মুচির ছেলে এক মনে তার কাজ করছিল।

ছেলেটীর সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজে উঠেছিল। তার মুখের দিকে চাহিলেই বোঝা যায় যে এত বেলা পর্য্যন্ত তার পেটে কিছুই পড়ে নি। ছেলেটী এক মনে ঠুক ঠুক করে জুতা তৈয়ারী করছিল, এমন সময় মলিন কাপড়ে দেহ আবৃত করা একটী নারী সেই কুঁড়েতে প্রবেশ করে ছেলেটীকে বললে, 'হ্যা রে, তোর কি আজ নাওয়া খাওয়া কর্ত্তে হবে না? সকালে থেকে যে কিছু মুখে দিস্‌নি!' ছেলেটী তার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললে, "না মা আর হয়ে গেল বলে; এই জুতোটা শেষ করেই যাচ্ছি চল্।" মা বললে, "না, না, আর শেষ করতে হবেনা চল্; তুই এত বেলা পর্য্যন্ত না খেয়ে থাকলে আমার কি কিছু ভাল লাগে রে?' ছেলে অগত্যা কাজ ফেলে মার অনুসরণ করল।

সুনীল ক্লাস থেকে সবই দেখছিল এবং শুনছিল। সে মনে ভাবতে লাগল, "এই গরীব ছেলেটার মা আছে বলে সে কত সুখী। কই, তার বাড়িতে তো কেউ তাকে এমন আদর করে খেতে ডাকে না? তার মা নেই বলেই কি এমনি?"

সারা বুকটা ভরে তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস উপচে উঠল।... ..

হঠাৎ সুনীলের চমক ভাঙল, মাষ্টার মহাশয়ের ডাকে। তিনি হঠাৎ সুনীলের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি ভারী অমনোযোগী দেখছি, আমি কি বোঝালুম বলত?" সুনীল তো কিছু শোনে নি, কি উত্তর দেবে?

"দুষ্টু ছেলে! দাঁড়াও বেঞ্চের উপর।" সুনীল আস্তে আস্তে বেঞ্চের উপর উঠে দাঁড়াল।

মুচির ছেলেটী ততক্ষণে খেয়ে এসে আবার কাজ আরম্ভ করেছে। সুনীলের, কানে এসে বাজল আবার সেই ঠুক-ঠুক শব্দ। আবার তার মার কথা মনে পড়ল; চোখ দুটা তার জলে ভরে উঠল; টপ, টপ, করে কয়েকটা ফোঁটা তার চোখ বেয়ে গলে পড়ল। ....

সহপাঠীরা ভাবল, "এ কান্না দাঁড়ানর অপমানে।" কেউ বুঝল না মা হারা কচি বুকের কতটা ব্যাথার প্রতিমূর্ত্তি এই ক' ফোঁটা জল!

শ্রীঅনিল ঘোষ

ময়নামতীর মায়াকানন

বারো

অরণ্যের গর্ভে

সেই আর্ত্তনাদ! কিছুতেই আমরা তা ভুলতে পারলুম না, তার প্রতিধ্বনি যেন আরো-ভীষণ হয়ে আমাদের বুকের ভিতরে ঘুরে বেড়াতে লাগল!

এই সেকেলে জীবের বাজ্যে, অমন মানুষের মতন স্বরে কেঁদে উঠল কে? আমি এখানে একলা থাকলে ভাবতুম, এ আমার কাণের ভ্রম। কিন্তু আমাদের তিন জনেরই তো শোনবার ভুল হ'তে পারে না! অথচ এ বনে মানুষ থাকা সম্ভব নয়, কারণ এই দ্বীপের কোথাও আজ পর্য্যন্ত আমরা মানুষের চিহ্নমাত্র দেখ্‌তে পাইনি!

অন্ধকারে অবাক হয়ে ব'সে ব'সে আমি ভাবতে লাগলুম—আর ওদিকে বনের মধ্যে তেম্‌নি নানারকম অদ্ভুত শব্দ ক্রমাগত শোনা যেতে লাগল! ভয়ে আমরা কেউ আর কারুর সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কইতে সাহস করলুম না—কি জানি, আবার যদি কোন ভয়ানক জীব শুনতে পেয়ে আমাদের আক্রমণ করতে আসে!

বনের ভিতরে সেই-সব অজানা শব্দ শুনে আমার মনে হ'তে লাগল যে, অন্ধকারে যেন আমাদের বিরুদ্ধে কারা ষড়যন্ত্র করছে! ধুপ্‌ ধুপ্‌, দুম্‌ দুম্‌, খস্‌, খস্‌, মর মর, সোঁ সোঁ, সর সর! শব্দগুলো যেন চারিদিক থেকে ক্রমাগত বলচে—আমরা তোমাদের হত্যা করব, আমরা তোমাদের হত্যা করব, আমরা তোমাদের হত্যা করব!.....নিবিড় অন্ধকারে দেহ ঢেকে চারিদিকে কারা যেন ওৎ পেতে ব'সে আছে, তাদের রক্ত-লোলুপ জ্বলন্ত দৃষ্টি আমরা যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে লাগলুম—মাঝে মাঝে কাদের আনাগোনার পায়ের শব্দ শুনি আর মনে হয়, ঐ ওরা এসে পড়ল—ঐ ওরা এসে পড়ল!... .....ওঃ, রাত যেন আর পোহাতেই চায় না, আমরা যেন চির-অন্ধকারের কারাগারের মধ্যে আজীবনের জন্যে বন্দী হয়ে আছি আর চারিদিক থেকে সুধু সেই একই শব্দ শোনা যাচ্ছে—আমরা তোমাদের হত্যা করব, আমরা তোমাদের হত্যা করব, আমরা তোমাদের হত্যা করব!

আর একবার আর-একটা মারাত্মক বিপদ থেকে কোনগতিকে বেঁচে গেলুম। .....
হঠাৎ কার মাটি-কাঁপানো পায়ের শব্দ শুনলুম, তার পরেই মনে হ'ল, এক জায়গায় অন্ধকার যেন আরো ঘন হয়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে! সেই চলন্ত ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে ঠিক বাতাবি লেবুর মত বড় দুটো আগুনের ভাঁটা জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বলছে—মাটি থেকে অনেক—অনেক উঁচুতে! নিশ্চয় সে দুটো কোন অতিকায় জীবের চোখ! জীবটা যে কোন জাতের তা বোঝা গেল না বটে, তবে তার নিঃশ্বাসের হু-হু শব্দ আমরা স্পষ্টই শুনতে পেলুম। তার পরেই মড়্ মড়্ ক'রে গাছ-ভাঙার শব্দ হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই আগুনের ভাঁটা দুটো ও চলন্ত অন্ধকারটা গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল! রোমাঞ্চিত দেহে, একেবারে মাটির সঙ্গে গা মিশিয়ে মড়ার মত স্তব্ধ হয়ে আমরা তিনজনে শুয়ে রইলুম। আর চারিদিক থেকে সেই একই শাসানি শুনতে লাগলুম —হত্যা হত্যা, আমরা তোমাদের হত্যা করব'!.........

দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কে আমরা যখন প্রায় পাগলের মতন হয়ে উঠেছি, পূর্ব্ব-আকাশে তখন উষার ভোরের প্রদীপ ধীরে ধীরে জ্ব'লে উঠল! সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যের মধ্যে অন্ধকারের জীবদের আনাগোনার শব্দ আশ্চর্য্যরূপে থেমে গেল! আমরাও আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উঠে বসলুম।

বিমল বললে, "কাল যে জীবটা আমাদের আক্রমণ করতে এসেছিল, এই দেখুন তার রক্তের দাগ! এতক্ষণে নিশ্চয় সে ম'রে গেছে! আসুন বিনয়বাবু, এইবারে দেখা যাক্, সেটা কি জীব!"

আমি আপত্তি ক'রে বললুম, "না, না, ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর পরিশ্রমে আমরা মর' মর' হয়ে পড়েছি, এখন কেবল বন থেকে বেরুবার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোন দিকে যাওয়া উচিত নয়—কি জানি, আবার যদি কোন নতুন বিপদে পড়ি!"

বিমল আমার আপত্তি শুনলে না, সে মাটির উপরে শুকনো রক্তের দাগ ধরে অগ্রসর হয়ে বললে, "না বিনয়বাবু, মানুষের মত কাঁদে কোন্ জীব, সেটা দেখতেই হবে। সে তো আর বেঁচে নেই, তবে আর কিসের ভয়!"

—বিমলের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই বনের ভিতরে ভয়ানক এক গর্জ্জন শোনা গেল; সঙ্গে সঙ্গে বিমলও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল!

রামহরি বললে, "এ যে বাঘের ডাক!"

আবার সেই গর্জ্জন—এবারে আরো কাছে! তারপরেই ভারি ভারি পায়ের শব্দ—যেন মস্ত-বড় একটা জীব দৌড়ে আসছে!

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, "সাবধান বিমল, সাবধান!"

হাতীর মতন প্রকাণ্ড একটা জানোয়ার বনের ভিতর থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এল, তারপরেই চোখের নিমেষে পাশের জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল! জীবটা হাতীর মতন বড় বটে, কিন্তু দেখতে ঠিক ষাঁড়ের মতন!

বিমল আর রামহরির মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখে আমি বললুম, "ও হচ্ছে সেকালের ষাঁড়!"

বিমল বিস্ফারিত চক্ষে বললে, "হাতীর মতন বড়!"

—"হ্যা। হাজার-দুই বছর আগেও রোমানরা ঐ-রকম ষাঁড় জার্ম্মান দেশে দেখেছিল।"

রামহরি বললে, "কিন্তু ও ষাঁড় কি বাঘের মতন ডাকে?"

—"না, বাঘের ডাক শুনেই ষাঁড়টা পালিয়ে গেল। এ বনে সেকেলে বাঘ আছে। সেকেলে বাঘের গায়ে এখনকার বাঘের মতন দাগ নেই, আকারেও তারা অনেক বড়, আর তাদের মুখের উপর-চোয়ালে ছোরার মতন লম্বা দুটো দাঁত আছে। বিমল, এ বাঘের বিক্রম কি-রকম বুঝেচ তো? এত-বড় একটা ষাঁড় তার ভয়ে প্রাণপণে পালিয়ে গেল, আমাদেরও এখনি এ বন ছেড়ে চ'লে যাওয়া উচিত!"

বিমল বললে, "আপনার কথাই ঠিক! কালকে আমাদের কে আক্রমণ করেছিল, তা আর দেখবার দরকার নেই, এ সর্ব্বনেশে বন থেকে এখন প্রাণ নিয়ে বেরুতে পারলেই বাঁচি!"

পূর্ব্বদিকে বনের মাথায় সূর্য্যকে দেখা গেল, প্রদীপ্ত কাঁচা সোণার অপূর্ব্ব মুকুটের মতন! কিন্তু এখানে বনের পাখী তাঁর আবাহন গান গাইলে না, সূর্য্য শুধু নিরানন্দ নীরবতার মাঝে পৃথিবীর বুকে সোণার হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

আমরা এসেছি পশ্চিমদিক থেকে, তাই সেই দিকেই যাত্রা সুরু ক'রে দিলুম।

তেরো

নতুন বিপদের সূচনা

ক্ষুধার জন্যে যত না হোক, তৃষ্ণার তাড়নায় চলতে চলতে আমাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে উঠল। জলের অভাব যে কি ভয়ানক অভাব, জীবনে আজ প্রথম তা কল্পনা করতে পারলুম। চলতে চলতে প্রতি পদেই মনে হ'তে লাগল, এই বুঝি দম বন্ধ হয়ে যায়, এই বুঝি মাথা ঘুরে মাটিতে প'ড়ে গেলুম! মাথার মধ্যে যেন আগুনের আংরা জ্বলছে, মুখের ভিতর থেকে জীভটা বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, আর মন চাইছে পথ-চলা বন্ধ ক'রে সেইখানেই শুয়ে জীবনের সব লীলা সাঙ্গ করতে।

সেই ভোর থেকে হাঁটছি, আর হাঁটছি, সূর্য্য এখন মাঝ-আকাশে, তবু এই অভিশপ্ত অরণ্য যেন আর আমাদের মুক্তি দিতে চায় না, এ অরণ্য যেন অনন্ত—এ অরণ্য যেন একরাত্রের মধ্যে সারা পৃথিবীকে গ্রাস ক'রে ফেলেছে!

রামহরি ঠিক মাতালের মতন টলতে টলতে চলছে, তার চোখ দুটো ঠিক পাগলের মতন হয়ে উঠেছে, আমারও প্রায় সেই অবস্থা। কিন্তু ধন্য বটে এই বিমল ছেলেটি! সেও যে ভিতরে ভিতরে আমাদেরই মতন কষ্ট পাচ্ছে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মুখে-চোখে বা ভাব-ভঙ্গীতে সে-কষ্টের কোন লক্ষণই ফুটে ওঠেনি, ধীর প্রশান্ত ভাবে হাসি মুখে সে আমাদের আগে আগে অগ্রসর হচ্ছে!

শেষটা রামহরি একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে পড়ল।

বিমল বললে, "ওকি রামহরি, বসলে কেন?"

রামহরি কাতর ভাবে বললে, "খোকাবাবু, জল না খেলে আমি আর চলতে পারব না।"

—"আর একটু পরেই জল পাব, ওঠ রামহরি, ওঠ!"

—"না খোকাবাবু না,—এ রাজ্যের সব জল শুকিয়ে গেছে, জল আর পাব না!

জল না পাই, আমাকে শান্তিতে মরতে দাও! তোমরা চ'লে যাও, আমার জন্যে ভেব না!"

বিমল আর কিছু বললে না, হেঁট হয়ে রামহরিকে ঠিক শিশুর মতন নিজের কাঁধের উপরে তুলে নিয়ে অনায়াসেই আবার হাঁটতে সুরু করলে! আমি তো দেখে শুনে অবাক্! বলবান ব'লে আমার নিজের যথেষ্ট খ্যাতি আছে, কিন্তু আজ দুদিনের অনাহার, পথশ্রম ও তৃষ্ণার তাড়না সহ্য করবার পর, রামহরির মতন একজন লোককে ঘাড়ে ক'রে পথ-চলার শক্তি যে কতখানি বলবিক্রম ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার কাজ, তা বুঝতে পেরে মনে মনে বিমলকে আমি বারবার ধন্যবাদ দিতে লাগলুম!

তারপর যখন নিরাশার চরম সীমায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি এবং প্রাণের আশা ছেড়ে আমিও রামহরির মতন শুয়ে পড়ব ব'লে মনে করছি, তখন আচম্বিতে বনের ফাঁকে জেগে উঠল, ও কী কল্পনাতীত দৃশ্য!

চোখের সামনে স্পস্ট দেখলুম, বিশাল হ্রদের নীলজল অদূরেই টল্ টল্ ঢল্ ঢল্ করছে—সূর্য্য-কিরণে বিদ্যুতের মতন চম্‌কে চম্‌কে উঠছে!

কিন্তু এ চোখের ভ্রম নয় তো? সত্যিই কি বন শেষ হয়েছে, আমরা আবার হ্রদের তীরে এসে পড়েছি?

বিমলের হাত ছাড়িয়ে রামহরি মাটির উপরে লাফিয়ে পড়ল, তারপর পাগলের মতন চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে হ্রদের দিকে দৌড় দিলে, আমিও তার পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলুম—তারই মতন আনন্দে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে। .. .. আমরা তিনজনে মিলে যতক্ষণ পারলুম, প্রাণ ভ'রে জলপান করলুম। আহা, সে যে কি তৃপ্তি, কি আনন্দ, কেমন ক'রে তা বর্ণনা করব? শেষটা পেটে যখন আর ধরল না, তখন আমরা বাধ্য হয়ে ক্ষান্ত হলুম।

রামহরি আহ্লাদে নাচতে নাচতে বললে, "আঃ, আর আমার কোন কষ্ট নেই, এখন আবার আমি একশো ক্রোশ হাঁটতে পারি!"

আমারও সমস্ত শক্তি আর উৎসাহ আবার ফিরে পেলুম।

বিমল ইতিমধ্যে গোটাকয়েক পেকেলে ডানাহীন হাঁস শিকার ক'রে ফেললে, আমরা সাঁতার দিয়ে তাদের দেহগুলো জল থেকে ডাঙায় এনে তুললুম।

রামহরি মুখ চোক্‌লাতে চোক্‌লাতে বললে, "খোকাবাবু, আমার আর দেরি সইচে না, চল, চল, তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে রান্না সুরু ক'রে দি!"

আমি বললুম, "হ্যাঁ বিমল, আমাদের আর দেরি কবা উচিত নয়, কুমার আর কমল এতক্ষণে আমাদের জন্যে ভেবে হয় তো আকুল হয়ে উঠেচে।"

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "হ্যাঁ, চলুন এইবার। আমবা তো বাসায় প্রায় এসে পড়েচি, ঐ যে আমাদের পাহাড় দেখা যাচ্চে!"

আমরা সবাই আবার অগ্রসর হলুম। একবার জলপানের পরে আমাদের দেহে আবার নূতন শক্তিব সঞ্চার হয়েছিল, তাই এবারে আর পথ চলতে কোনই কষ্ট হ'ল না।

কিন্তু এ দ্বীপে বিপদ দেখচি পদে পদে! আমরা যখন পাহাড়ের খুব কাছেই এসে পড়েছি, মাথার উপরে তখন হঠাৎ একটা কর্কশ চীৎকার শুনতে পেলুম। উপরে চেয়ে দেখি, দুটো হাড়-কুৎসিত গরুড়-পাখী চক্রাকারে ঘুরতে ঘুবতে আমাদেব দিকেই নেমে আসছে।

তাদের উদ্দেশ্য যে ভালো নয়, তা বুঝতে আমাদেব কিছুমাত্র বিলম্ব হ'ল না। বিমলের বন্দুক তখনি গর্জ্জন ক'রে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে একটা পাখী গুলি খেয়ে মাটির উপরে এসে পড়ল। পাখীটা সাংঘাতিক রূপে আহত হয়েছিল, কিন্তু সেই অবস্থাতেই করাতের মত দাঁতওয়ালা চঞ্চু তুলে সে আমাদের আক্রমণ করতে এল। বিমল বন্দুকের কুঁদো দিয়ে প্রচণ্ড এক আঘাতে তার মাথাটা চূর্ণ ক'বে দিলে। ততক্ষণে আমার বন্দুকের গুলিতে দ্বিতীয় পাখীটারও ভব-লীলা সাঙ্গ হয়ে গেল।

আমরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সৃষ্টিছাড়া জীবদুটোকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলুম। বৈজ্ঞানিকরা যে কি দেখে এদের পাখী ব'লে স্থির করেছেন তা স্বধু তাঁরাই জানেন, কারণ পাখীদের সঙ্গে এই বীভৎস জীবগুলোর কিছুই মেলে

না, তাদের দেহ পালোক-হীন ও সরীসৃপের মতন, দাঁতওয়ালা চঞ্চু আর পা হচ্ছে চারখানা ও ল্যাজ হচ্ছে দড়ীর মতন। কিম্ভূতকিমাকার!

এমন সময় বাঘার চীৎকার শুনলুম—ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ! মুখ তুলে দেখলুম, চ্যাচাতে চ্যাচাতে সে আমাদের দিকেই বেগে ছুটে আসছে!

রামহরি বললে, "ও কি, বাঘা খোঁড়াচ্চে কেন?"

সত্যিই তো, বাঘা ছুটে আসছে বটে, কিন্তু খোঁড়াতে খোঁড়াতে, পিছনের একখানা পা তুলে! তার চীৎকারও আজ যেন কেমন কাতরতা মাখানো!

বাঘা ছুটে এসে একেবারে আমাদের পায়ের কাছে লুটিয়ে প'ড়ে হাঁপাতে লাগল!

বিমল হেঁট হয়ে পড়ে বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "বিনয়বাবু, বিনয়বাবু, দেখুন! বাঘার গায়ে রক্ত!"

হ্যাঁ, বাঘার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত!

বিমল পাহাড়ের দিকে ছুটতে ছুটতে বললে, "শীগ্‌গির আসুন, কুমার আর কমল বোধ হয় কোন বিপদে পড়েচে!"

আমি আর রামহরিও পাহাড়ের দিকে ছুট দিলুম।

পাহাড়ের উপরে উঠেও কোন গোলমাল শুনতে পেলুম না। কিন্তু গুহার সামনে গিয়ে দেখলুম, সেখানে পাহাড়ের পাথর রক্তে একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছে!

বিমল ঝড়ের মতন গুহার ভিতরে ঢুকে, আবার বেরিয়ে এসে বললে, "গুহার ভেতরে তো কেউ নেই! কুমার, কুমার!"

কেউ সাড়া দিলে না!

আমি চেঁচিয়ে ডাকলুম, "কুমার! কমল!"

কোন সাড়া পেলুম না!

বিমল করুণ স্বরে বললে, "এত রক্ত কিসের বিনয়বাবু, এত রক্ত কিসের? তবে কি তারা আর বেঁচে নেই?"

আমি বললুম, "হয় তো তারা সমুদ্রের ধারে গিয়েচে। এস, পাহাড় থেকে নেমে খুঁজে দেখি গে!"

সকলে আবার পাহাড় থেকে নেমে গেলুম। কিন্তু নীচে গিয়ে দেখলুম, সমুদ্রের ধারে জনমানব নেই!

বিমল মাথায় হাত দিয়ে সেইখানেই বসে পড়ল, রামহরি চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল, বাঘাও সেইসঙ্গে যোগ দিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে কাঁদতে লাগল, কেঁউ, কেঁউ, কেঁউ।

হঠাৎ বালির উপরে আমার চোখ পড়ল। তাড়াতাড়ি বিমলকে ডেকে আমি বললুম, "দেখ, দেখ, এ আবার কি ব্যাপার?"

—"কি বিনয়বাবু, কি?"

—"পায়ের দাগ।"

—"পায়ের দাগ। কার পায়ের দাগ।"

—"মানুষের।"

—"তাই তো, একটা-দুটো নয়, এ যে অনেকগুলো। এ আবার কি রহস্য বিনয়বাবু?"

—"বেশ বোঝা যাচ্ছে এখানে একদল মানুষ এসেছিল।"

—"কিন্তু আমরা ছাড়া এ দ্বীপে তো আর মানুষ নেই।"

—"নিশ্চয় আছে নইলে মানুষের পায়ের দাগ এখানে এল কেমন ক'রে? বিমল, কাল রাত্রে আমরা ভুল শুনি-নি, বনের ভিতরে কাল নিশ্চয় মানুষই আর্ত্তনাদ ক'রেছিল!"

বিমল নিষ্পলক নেত্রে বালির-উপরে-আঁকা সেই পদচিহ্নগুলোর দিকে তাকিয়ে নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

নূতন ধাঁধা

১। কে চোখে মেলে ঘুমিয়ে থাকে ?

২। কে জন্মে নড়ে না ?

৩। বাতাসের চেয়ে দ্রুতগামী কে ?

৪। কার হৃদয় নাই ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে

ধাঁধাঁর উত্তর

১। মোচাক ২। শ্রীরামচন্দ্র ৩। রমাপতি ৪। পৌষ

৫। গজ ৬। হনুমান

নিম্নলিখিত গ্রাহকগ্রাহিকাগণ ধাধার উত্তর দিয়েছেন—

অবনীচন্দ্র মিত্র ও নির্ম্মলচন্দ্র মিত্র (কিষণগঞ্জ) নীহাররাণী ও বণু (কলিকাতা), রাজেন্দ্রকুমার
(কৃষ্ণনগর), অমলেন্দু বসু (পাটনা), অরুনকুমার রায়, অতুলচন্দ্র রায়, নলিনীমোহন, . । বহুবাজার
কুমারী পুষ্পলতা দেবী (দেওঘর), ভরতী (পাটনা ভাবী খেঞ্জি । আর এই ঘেঞ্জি জায়গাটুকুর
সর্ব্বপ্রিয় ঘোষ ও তৃপ্তিময়ী ঘোষ (ঢাকা), ...র মুসলমান গুণ্ডার দল দিনে-দুপুরে নিরীহ
সুখেন্দুবিকাশ সেন (গয়া), ডলি ঘোষ (ক ...নিত নির্বিবাদে ! পুলিশ খবর পেয়ে মহা-ধুম-
কুমারী সুধাময়ী বসু (কলিকাতা), শোভনা, ...
বিস্ময় দাসগুপ্ত (আলিপুর), দেবীভূষণ ...জানির কোনো কিনারাই করতে পারতো না।
কাজি সরফুল বারি (খুলনা), অনিলচন্দ্র ...কলেজে এফ-এ পড়ি। থাকি পটলডাঙ্গার এক
(দিল্লী), প্রেমাংশুকুমার ও ইন্দুলেখা দা ...শন ইনস্পেক্টর ছিলেন। তিনি তখন বহুবাজার
(শিবসাগর), সাবিত্রী সেন (কটক), রাস. ...
শ্রীশুভা ও আভা দেবী (পুরী) প্রফুল্লময়ী দে দিনগুলো আমাদের সেই থানাতেই কাটতো !
অর্দ্ধেন্দু মজুমদার (নদিয়া), নলিনী দেবী, ...তী পূজার ভাসান। বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে ;

৭ম বর্ষ]　　　　ফাল্গুন, ১৩৩৩　　　　[একাদশ সংখ্যা

চীনে পাড়ায়

(গল্প)

সে প্রায় চব্বিশ বৎসর আগেকার কথা! সে কথা মনে হলে এখনো হৃৎকম্প হয়!

কলকাতার গা ফুঁড়ে তখন সেণ্ট্রাল এভেনিউ রাস্তা বার হয়নি। বহুবাজার থেকে লালবাজার—এই অঞ্চলটা ছিল ভারী ঘেঞ্জি। আর এই ঘেঞ্জি জায়গাটুকুর গলি-ঘুঁজিতে কাফ্রী, ফিরিঙ্গি, চীনে আর মুসলমান গুণ্ডার দল দিনে-ত্নপুরে নিরীহ পথিকের গলা টিপে পয়সা-কড়ি কেড়ে নিত নির্ব্বিবাদে! পুলিশ খপর পেয়ে মহা-ধুম-ধামে তদ্বির করেও এ-সব খুন বা রাহাজানির কোনো কিনারাই করতে পারতো না।

আমরা তখন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে এফ-এ পড়ি। থাকি পটলডাঙ্গার এক গলিতে। আমার এক মামা পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। তিনি তখন বহুবাজার থানার চার্জ্জে। রবিবার আর ছুটীর দিনগুলো আমাদের সেই থানাতেই কাটতো!

বেশ মনে আছে, সেদিন সরস্বতী পূজার ভাসান। বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে;

আমি থানার নীচেকার অফিস-কামরায় বসে, মামা একটা জরুরি তদারকে বেরিয়েছেন, মামাতো ভাইয়েরা উপরে সাজগোজ করছে—তাদের সাজগোজ হলে আমরা সকলে গঙ্গার ধারে যাবো ভাসান দেখতে,—এমন সময় এক কাণ্ড ঘটলো।

এক চীনা ছোকরা—সাহেবী পোষাক-পরা,—ছুটে এসে থানার ঘরে একটা বেঞ্চে বসে পড়লো; বসেই বলে উঠলো—আমায় বাঁচাও। কথাটা অবশ্য সে বাংলায় বলেনি, ইংরাজীতে বলেছিল।

তার পানে তাকিয়ে দেখি, ভয়ে তার মুখ একেবারে নাল হয়ে গেছে। এই শীতে কপাল দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। মাথার চুলগুলো উস্কোখুস্কো; আর চোখদুটো? তেমন দৃষ্টি মানুষের চোখে কখনো দেখিনি।

আমি ইংরাজীতে জবাব দিলুম,—ইনস্পেক্টর নাই। আমি লোক ডেকে দিচ্ছি।

পাশের ঘরে থানার জমাদার-মুন্সীরা জটলা পাকাচ্ছিল। খপর দিতেই মুন্সী উঠে এলো। চীনা ছোকরা তার কাছে ভয়ে গলার কাঁপা স্বরে যা বললে, তার অর্থ এই দাঁড়ায়,—তার নাম লিচং। সে থাকে কাছের এক গলিতে। তার বাপ চীনের এক সদাগর; থাকেন ক্যান্টন সহরে। ব্যবসা নিয়ে দেশে ক'জন চীনার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া আছে। তারাই এখানকার ক'জন বদমায়েস চীনেকে ভাড়া করে তাদের উপর হুকুম দিয়েছে, লিচংকে ধরে কোথাও বন্দী করে রেখে লিচংএর বাপকে জব্দ করবে। চীনা গুণ্ডারা লিচংকে ক'দ্দিন ধরে শাসাচ্ছে—কিন্তু কিছুই করেনি। আজ লিচং বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটা মোড় বাঁকবা মাত্র তারা তাকে ধরতে আসে। লিচং সোজা দৌড় দেছে প্রাণের ভয়ে। তারা দলে ছিল পাঁচজন—তাদের নাম লিচং জানে না, তবে ওপাড়ার চীনা কফিখানায় তারা বসে থাকে, আর বদমায়েসী করাই হলো তাদের পেশা।

মুন্সী বললে,—আমরা তোমার নালিশ লিখে নিচ্ছি। তুমি আদালতে হাকিমের কাছে নালিশের দরখাস্ত দাও গে। হাকিমের হুকুম পেলে আমরা তাদের শাসিয়ে আসবো। হাকিমের হুকুম ছাড়া আমরা তো কিছু করতে পারি না।

লিচং বললে, তাদের শাসালে কোনো ফল হবে না। অর্থাৎ তাদের গ্রেফতার না করলে আমার পক্ষে বাঁচা দায় হবে !

মুন্সী বললে,—কিন্তু আইনে আমাদের আর কিছু করার ক্ষমতা নাই তো !

লিচং হতভম্বের মত বসে রইলো। তার চোখে-মুখে নিরুপায়তার এমন করুণ কাতর ছবি ফুটে উঠলো যে তা দেখে আমার বুক মমতায় ভরে গেল।

আমি বললুম,—তুমি বসো। ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু এলে তাঁর কাছে সব কথা খুলে বলো।

মুন্সী পাশের ঘরে চলে গেল। লিচংএর সঙ্গে আমার তখন আলাপ চললো। লিচং ডভটন স্কুলে পড়ে। তার বাপের ইচ্ছা, সে মানুষের মত লেখাপড়া শিখে বিলাত যায়। তাই লিচংকে বাপ কলকাতায় পাঠিয়েছে। কলকাতায় তাদের আত্মীয় শুফং থাকে। শুফঙের জুতার মস্ত কারবার। লিচং শুফঙের বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া করে।

মামাতো ভাইয়েরা সেজেগুজে নীচে এল—আমার আর ভাসান দেখতে যাওয়া হলো না। লিচংএর কাছে রইলুম। মামা এলে মামাকে বলে যদি তার নিরাপদ হবার কোনো সুযোগ করে দিতে পারি, এই ভরসায় ! ভাইয়েরা আমায় না পেয়ে একটু খুঁৎ খুঁৎ করতে করতে বেরিয়ে গেল ভৃত্য রামভরোষের সঙ্গে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মামা এলেন। মামাকে লিচংএর কথা বললুম। মামা লিচংকে বললেন—সে লোকগুলোকে চিনিয়ে দিতে পারো ?

লিচং বললে—পারি।

মামা বললেন,—আচ্ছা, চলো, দেখি, কি করতে পারি।

একটা জমাদারকে নিয়ে মামা বেরুলেন। আমিও সঙ্গ নিলুম। থানা থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে একটু এগিয়ে বাঁয়ে আর একটা গলি। সেই গলি দিয়ে সোজা দক্ষিণ মুখে চললুম—কত আঁকাবাঁকা গলি—দু'ধারে কতকালের সব পুরানো বাড়ী, আর জঞ্জালের কি দুর্গন্ধ স্তূপ,—ওঃ যে-লোক নরকের কল্পনা প্রথম করেছিল, সে বুঝি এই গলি দেখেই তা করেছিল ! এখানে-সেখানে চীনা ছেলেমেয়ে জাটজেটে

পাঁকের উপর স্বচ্ছন্দ মনে খেলা করছে! দু'চারটে ভীমমূর্ত্তি ষণ্ডা লোক দোকানে বসে চা খাচ্ছে, গল্প করছে। একটা দোকানে লোহার সিকে গেঁথে মাংসর টুকরো পোড়াচ্ছে! আরব্য উপন্যাস আমার পড়া ছিল—তারি ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলো মনের উপর ভেসে উঠে সমস্ত শরীরটাকে কেমন এক ছমছমানিতে ভরিয়ে তুলছিল।

আরো গোটাকতক মোড় ঘুরে এক চানা কফিখানার সামনে এসে পৌঁছুলুম। সামনে একটা চীনেম্যান প্রায় দু'হাত লম্বা নল মুখে দিয়ে কি টানছিল, সে-ই জানে! তার দুই গাল শুকনো বেদানার মত চুপ্‌সোনো, চোখ দুটো কোথায় কপালের নীচে ঢুকে গেছে, —পাৎলা ফুরফুরে চাটিখানি দাড়ি ঠাকুরের আরতির বরণডালার ছোট্ট চামরের মত দেখাচ্ছিল। মুখখানা তার অবিকল নিউ মার্কেটের দোকানে ঝুলোনো মুখোসের মত! নলের টানে সে একেবারে বিভোর। মামা তাকে ডেকে একধারে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কি কথাবার্তা কইলেন। তারপর সে পথ দেখিয়ে কফিখানায় ঢুকলো—আমরাও তার পিছনে গিয়ে ঢুকলুম।

মস্ত একটা ঘর। দেওয়ালে চানা হরফে কি সব লেখা—ঘরের মাঝখানে কাঠের টেবিল। টেবিলের উপর কাঠের কতকগুলো থালা আর চানা মাটির বাটি, পেয়ালা। পাঁচজন চানাম্যান দু'হাতে কাদা-মাটি নিয়ে থালা থেকে কি খুঁটে খাচ্ছিল। যেমন লাল-পাগড়ী জমাদারকে দেখা, অমনি হাতের কাঠি না টেবিলে ফেলে ওদিককার খোলা দরজা দিয়ে তারা একেবারে দে ছুট! আমরা অবাক।

মামা সেই মুখোস-মুখো চীনেম্যানটাকে কি সব বলে বেরিয়ে এলেন। পথে এসে লিচংকে বললেন—চল, তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি। আমি এই কফিখানার মালিককে বলে গেলুম, সে কতকগুলো বদমাসেয়ের নাম আমায় থানায় দিয়ে আসবে। তাদের নাম পেলে আমি একটা যা-হয় কিনারা করে দেবো'খন। মোদ্দা ত না করা অবধি তুমি বেশ হুঁশিয়ার থাকবে।

লি-চংয়ের বাড়ী এলুম। দোতলা বাড়ী। ফটকের পর উঠান, উঠানে চামড়ার পাহাড়—কি দুর্গন্ধ!

লিচং বললে—ভিতরে আসুন দয়া করে একবার......।

দোতলায় উঠলুম। ঘর বেশ সাজানো। সোফা, চৌকি, টেবিল, চেয়ার, কড়িতে—চীনা লণ্ঠন ঝুলছে হরেক রকমের। তাতে আলো জ্বলছে। ঘরে বিস্তর চীনা ছবি। শুফং বুড়ো মানুষ। তার শরীরটা খারাপ ছিল। সে বিছানায় শুয়েছিল; আমাদের দেখে উঠে বসলো, বসে বললে, -একটু চা হুকুম করুন, আমাদের খাস চীনা চা।...
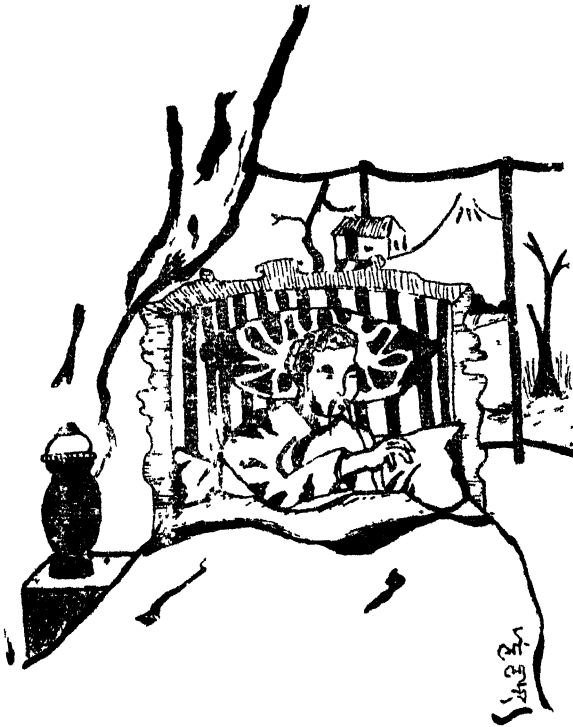
মামা বললেন -আমি চা খাবো না। তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—তুই খা চীনা চা...খেয়ে নে, এসেছিস যখন সঙ্গে।....

বহুৎ আচ্ছা! পরে শুফঙের মেম এলো! কথাবার্ত্তা হলো। মামা আশ্বাস দিলেন। শুফং বললে—ভারী বদমাস এই চীনা গুণ্ডারা। এরা আইন-, আদালত মানে না, পুলিশ মানে না! এদের অসাধ্য কাজ নেই।

মামা বললেন- তা হলে লিচংকে ঠাঁই-নাড়া করবে?

শুফঙের মেম বললে—তাই বা কি করে হয়, তার বাপের কথা না পেলে?

আসল কথা বুঝলুম, লিচংএর বাপ লিচংয়ের এখানে থাকার জন্য এদের অনেক

টাকা দেন—সেই টাকাটা হাতছাড়া হবে ..কাজেই লিচংকে ঠাঁইনাড়া করতে এদের অমত !

মামা বললেন—ভয় নেই। আমার এই জমাদারকে বলে দেবো—সে নজর রাখবে। তবে লিচং যেন যখন-তখন না পথে বেরোয়, বিশেষ রাত্রে। আর যখন বেরুবে, তখন গাড়ীতে বেরুলেই ভাল হয় ! তবে, এ ইংরেজের রাজত্ব, এখানে ভয় কি !

এর প্রায় তিন মাস পরের কথা বলছি।

লিচংএর ব্যাপার এক রকম ভুলেই গেছলুম। মাঝে মাঝে চীনা জুতাওয়ালাদের দেখলে শুধু মনে হতো, চীনাদের মধ্যেও সৌখীন সুপুরুষ আছে,—লিচং ! সে তো এদের মত নোংরা নয় ! সে তো বেশ- এই অবধি !

সেদিনও রবিবার। রাত প্রায় নটা। থানাব দোতলা ঘরে আমরা খেতে বসেছি—মামা খাটে শুয়ে খপরের কাগজ পড়ছেন, এমন সময় খপর এলো, কতকগুলো চীনা ধরা পড়েছে !

চীনা ! শুনেই লিচংএব কথা আমার মনে পড়লো। মামার দিকে চেয়ে বললুম—লিচং নয়তো মামা ?

মামা বললেন,—দেখি। বলে মামা নীচে চলে গেলেন। আমিও তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নীচে ছুটলুম। এসে দেখি, চারটে চীনা ধরা পড়েছে। জমাদার বললে, --চীনা পাড়ায় এক গলির সামনে এরা দল বেঁধে মারামারি করছিল। আমরা যেতে কজন পালিয়ে গেছে। এদের আমরা ত্থ'জন জুড়িদার মিলে ধরেছি।

চীনাদের পানে চেয়ে দেখি, বদমায়েসী তাদের মুখে যেন একেবারে মাখানো। অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ তাদের বিছানার পাশে দেখলে চমকে উঠতে হয়, এমন ভয়ঙ্কর দুশমণ চেহারা। চীনা এমন জোয়ান হতে পারে, এ জ্ঞান আমার ছিল না ! চণ্ডুখোর চীনে—বাস্‌রে, তাদের ইয়া মাশ্‌ল্ !

কতকগুলো প্রশ্ন করে মামা বুঝলেন, সেই শুফং চীনাম্যানের বাড়ীর সামনেই হাঙ্গামা ! লিচং...?

মামা গাড়ী ডাকিয়ে বেরুলেন্— চীনা কজনকে বেঁধে একটা গাড়ীতে তোলা হলো। আমিও বহু কাকুতি করে মামার সঙ্গে বেরুলুম। মামা বললেন,—চল্, তুই ডান্‌পিটে জোয়ান আছিস, হয়তো কাজে লাগবি!

গাড়ী এসে দাঁড়ালো সেই শুফঙের বাড়ীর সামনে। মামা শুফংকে ডাকালেন। শুফং এসে খপর দিলে, লিচং গেছলো নিউ-মার্কেটে। কথা তো শোনে না! এই রাত্রে গাড়ী করে না ফিরে হেঁটে আসছিল। যেমন বাড়ীর কাছে পৌঁছুনো, অমনি ক'জন চীনা তাকে ধরে। চীৎকার শুনে আমি, আমার লোকজন বেরিয়ে পড়ি। খুব মারপিট চলে। আমার একটা চাকর বেহুঁশ পড়ে ছিল। তাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছি। লিচংকে তারা পাঁজাকোলা করে নিয়ে পালালো। পুলিশ এসে চারজনকে ধরে থানায় নিয়ে যায়। ভয়ে আমার স্ত্রীর মূর্চ্ছা হয়, এইমাত্র জ্ঞান হয়েছে। আমিও এখনি থানায় যাচ্ছিলুম।

বাড়ীর সামনে ভাঙ্গা বিস্কুট ছড়ানো—কাগজের বাক্স ভাঙ্গা। শুফং বললে,—লিচং গেছলো নিউমার্কেটে বিস্কুট, কেক্, টফি এই সব কিনতে। আমার ছোট ছেলে শিংফুর জন্মদিন কাল, তাই তাকে উপহার দেবার জন্য...

আমার আতঙ্ক আব ভাবনার অন্ত ছিল না। বেচারা লিচং! এত বড় কলকাতা সহর! এই গলি-ঘুঁজি!...এর মধ্যে কোথায় সে পড়ে আছে, তার উপর কত অত্যাচার কি নির্য্যাতন না চলছে! প্রাণে সে বাঁচবে কি না!.. মামাকে বললুম,—কি হবে' মামা? মামা বললেন,—দেখছি সব।

বলে' সেই গ্রেপ্তারী চীনা ক'জনকে নিয়ে শুফঙের বসবার ঘরে ঢুকলেন। সেখানে এসে তাদের বললেন,—তোদের দলের সকলের নাম বল্...

তারা কিছুতেই বলবে না! মামা বললেন, তাদের ছেড়ে দেবেন! তবু তারা অবিচল! তখন মামা বললেন,—ভালো কথায় হবে না। দাওয়াই দিতে হলো।

মামা শুফংকে বললেন—কুইনাইন আছে?

শুফং বললে,—আছে। আমার মেয়ে চিংটির সেদিন জ্বর হয়েছিল--এক বোতল গুঁড়ো কুইনাইন আনিয়েছিলুম। বলে গুঁড়ো কুইনাইনের শিশি এনে দিলে। মামা

বললেন—ওদের শুইয়ে ফেলে হাঁ করিয়ে মুখের মধ্যে দাও এক গাদা করে কুইনাইন ঢেলে! তাই করা হলো। চীনারা তো নাক-মুখ সিঁটকে গড়াগড়ি দিতে লাগলো! মামা বললেন,—দে ওদের নাকে নস্যি পুরে।

জমাদার নস্যি এনে দিলে তাদের নাকে পুরে। ফ্যাঁচ্‌চো, ফ্যাঁচ্‌চো হ্যাঁচচো!.. কি সে হাঁচির ধূম—কিন্তু ভবী ভোলবার নয়! কিছুতেই তারা দলের কোনো কথা ভাঙ্গলে না।

তখন মামা একজন জমাদারকে কি সব পরামর্শ দিয়ে থানায় ফিরে এলেন, আমিও এলুম—সঙ্গে সেই গুণ্ডা চীনাদেরও আনা হলো।

তারপর জোর তদারক সুরু হলো। যে চারজন চীনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তার হাজতেই পচতে লাগলো। কিন্তু তা হলেই তো কাজ হলো না। মহা ভাবনা এখন লিচংকে নিয়ে। তাকে মেরেই ফেললে, কি, কি হলো তার……

প্রায় সাতদিন পরে মামা বললেন,—লিচংয়ের সন্ধান পেয়েছি রে। আজ আমরা বেরুবো। তুই যাবি আমাদের সঙ্গে?

—নিশ্চয়।

মামা বললেন,—তা হলে একটা হাফ্‌প্যাণ্ট আর সার্ট পরে আয়। দেরী করিস্‌নে।

পাঁচ মিনিটে আমি তৈরী হয়ে নিলুম। মামা বললেন,—লড়তে হবে হয়তো—তোর মাশ্‌লের জোর কত, পরখ করবো। কেমন এক্‌সারসাইজ্‌ করিস্‌, বোঝা যাবে।

আমি হেসে বললুম,—আচ্ছা!

আমরা একটি দল বেরুলুম—সঙ্গে দু'জন গোরা-সার্জ্জেণ্ট ছিল। মামার হাতে আর সার্জ্জেণ্টদের হাতে রিভলভার।

রাত তখন দশটা। সেই চীনাপাড়ার গলি। সঙ্গে একটা চীনা ছিল,—সে-ই আর কি গোয়েন্দা হয়ে এসেছিল! বরাবর গলি পার হয়ে এসে আমরা একটা বড় বাড়ীতে ঢুকলুম। বাড়ীর সামনের ঘরে মস্ত চামড়ার গুদাম। এক পাশে সরু সিঁড়ি। আমরা সিঁড়ি বয়ে দোতলায় এলুম। চুপি চুপি এসে

গোয়েন্দা একটা ঘরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাবা মাত্র মামা সে ঘরের দোরে ঘা মারিলেন। সকলে রিভলভার উঁচিয়ে রইলো। ভিতর থেকে দোর খোলা হলো—দেখি, একটা চীনাম্যান। যেমন আমাদের দেখা, সে এক শিষ দিয়েই চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। ঘরের মধ্যে আলোও নিবে গেল। অন্ধকার ঘুরঘুট্টি! সার্জ্জেন্টদের কাছে টর্চ্চ ছিল। সেই টর্চ্চের আলোয় দেখি, যে-ঘবটায় ঢুকেছি, সেটা মস্ত হল-ঘর। আসবাব-পত্র নাই। আমরা খানিক এগিয়ে এসে পাশেই এক দরজা পেলুম। সেই চীন গোয়েন্দা পাশের ঘরে ঢুকতে বললে। ঢুলুকম। সে ঘরে পাঁচজন চীনাম্যান—একজনের হাতে একটা বন্দুক। তারা বসে কি খেলছিলু! আমাদের দেখে একজন বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরলে—আর একজন একটা বাঁশী বাজিয়ে দিলে। যেমন বাঁশী বাজানো, অমনি এক সঙ্গে চারাদিকে দরজা-জানলা বন্ধ হবার ধড়াধ্বম্ শব্দ শোনা গেল। মামা সে চীনাগুলোকে চেয়ে দেখবার অবসর না দিয়ে রিভলভার ছুড়লেন। যে-চীনাটা বন্দুক উঁচিযে ছিল, তার হাত থেকে বন্দুক পড়ে গেল—সেও অমনি দোতলার খোলা জানলা দিয়ে দিলে এক লাফ! অন্য চীনাগুলোও ভড়কে সেই পন্থা অনুসরণ করলে ..

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়! পর মুহূর্ত্তেই একদল চীনা লাঠি-সোঁটা নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। এক বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধলো। হাঁকডাক, চ্যাঁচামেচি,—তার মধ্যে রিভলভার চললো—চার পাঁচজন চীনা জখম হয়ে পড়ে গেল। একজন সার্জ্জেণ্ট লাঠির চোট পেলে বেশ ভারী রকম। আমি একজন চীনার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তার লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে দুটো-তিনটেকে ঘাল করলুম। সে একটা ছোটখাট যুদ্ধ! তারা আমাদের সঙ্গে পারবে কেন? আমাদের সঙ্গে প্রায় বারোজন কনষ্টেবল ছিল। তারাও ঠিক সময়ে এসে জুটলো!

ব্যাপার যখন থামলো, তখন দেখা গেল, পাঁচজন চীনা গ্রেফতার, বাকী ফেরার! কিন্তু এই তো আসল কাজ নয়—লিচং? লিচং কোথায়?

গোয়েন্দা বললে,—আসুন। বলে সে একটা দেওয়ালের গায়ে সাঁটা আলমারির

দরজা খুলে ফেললে। দেখি, সেটা ঠিক আলমারি নয়। দেওয়ালের মধ্যে একটা সিঁড়ি, সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে। গোয়েন্দা বললে—আসুন—

ভয় হলো। কে জানে, এর মনে কি আছে! মামারও বোধ হয় সে কথা মনে হয়েছিল। মামা বললেন—তুমি আগে নামো -

তাই হলো। কনষ্টেবলরা উপর রইলো। আমরা সেই সিঁড়ি বয়ে নীচে নামলুম। প্রায় বত্রিশটা ধাপ নেমে এসে দেখি, ছোট একটা চোরা-কুঠরীর মত ঘর, অন্ধকার ঘুটঘুটে! আব সেই ঘরেব মেঝেয় পাড়ে···একজন মানুষ! চারটে টর্চ্চ এক সঙ্গে বাগিয়ে তার মুখে আলো ফেলে চিনলুম। এ লিচংই তো! সে নির্জীবের মত পড়ে—দেহ যেন পাত হয়ে গেছে! অমন টকটকে রং...তাতে কে যেন কালি লেপে দেছে!

ধরাধরি করে তাকে উপরে আনা হলো। তারপব থানায়—থানা থেকে হাসপাতালে পাঠানো হলো। তার সারতে প্রায় মাসখানেক সময় লেগেছিল আমি অবাক হয়ে গেছলুম এই ভেবে যে, কলকাতা সহরেও এমন আরব্য উপন্যাসের মত ঘটনা ঘটে! মানুষ-চুরি!

সে চীনাম্যানগুলো ?. আদালতের বিচারে তাদের দু'বছর করে জেলের হুকুম হলো।

সেই লিচং এখন চীনে থাকে—মাঝে মাঝে আমায় চিঠি লেখে—আর দু'চারবার সওগাতও পাঠিয়েছিল। একবার চীনা চা, আর একবার চীনে-মাটীর বাটী, থালা, নানা খেলনা, টুকিটাকি। সেগুলিকে আমি খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছি। আজো সেগুলির পানে চেয়ে দেখলে মনে আতঙ্ক জাগে—আর এই কথাই ভাবি যে, মানুষ মানুষের উপর কি অমানুষিক অত্যাচারই না করতে পারে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

লাল মাছ

সখ—আমাদের একটা-না-একটা আছে। কেউ ফুলগাছ পুঁতে সখ মেটায় ; কেউ গান-বাজনা করে ; কেউ তাস-পাশা খেলে ; কেউ খেলে ফুটবল-ক্রিকেট ; কেউ কুকুর পোষে, খরগোস পোষে, পায়রা পোষে ; আবার কেউ-বা পোষে লাল মাছ। এই পাখী পোষা, কুকুর পোষা, লাল মাছ পোষা—প্রাণে মমতার মাত্রা বেশী না থাকলে এ সখ মেটানো যায় না। কারণ জানোয়ার বা পাখী পুষতে হলে তাদের খাওয়ানো-দাওয়ানো, রোগে সেবা, এমনি নানা হেফাজতী-তদারক করতে হয়। আবার কুকুর পোষা, পাখী পোষায় হেফাজতী যা করতে হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী হেফাজতী করতে হয় লাল মাছ পোষার ব্যাপারে। তার কারণ লাল মাছ ভারী সুখী জীব। একটু উপেক্ষা অবহেলা বা অনাদরে এদের প্রাণ রক্ষা করা শক্ত হয়ে পড়ে। লাল মাছ পুষতে হলে তাদের খাওয়ানোর দিকে নজর রাখলেই শুধু চলবে না—এরা যাতে অক্সিজেন পায়, এদের জল যাতে নিয়মিত বদলানো হয়, সে সব দিকে খুব তীক্ষ্ণ ভাবেই নজর রাখা দরকার। অল্প জল, অল্প জায়গা, আর রৌদ্র—এই তিনটি জিনিষ এদের ধাতে মোটেই বরদাস্ত হয় না। কাচের বড় পাত্রে অনেকে লাল মাছ রাখতে চান ; তাতে বাহার খোলে বটে, কিন্তু এদেশের পক্ষে কাচের পাত্র লাল মাছের পক্ষে খুব নিরাপদ জায়গা নয়। মাটীর বড় গামলাই এদের বাসের পক্ষে সব-চেয়ে নিরাপদ। ১৪।১৫ সের জল ধরে এমন গামলায় ১৫।২০টা মাছ রাখলে তারা অনায়াসে সাঁতার কেটে নিরাপদে বাঁচতে পারে। তবে গামলার জলে বা গামলার গায়ে দুপুরের তপ্ত রৌদ্র বা বৈকালের পড়ন্ত রৌদ্র না লাগে! সে তাপে জল গরম হয়ে উঠতে পারে ; আর গরম জল হলো লাল মাছের পক্ষে মৃত্যু-বাণ। শীতকালে বড় কাচের পাত্রে লাল মাছ রাখা যেতে পারে ; তবে অল্প স্থান হলে তাতে বেশী মাছ রাখা চলতেই পারে না।

গামলাটি যেন নোংরা না হয়! সাবান একেবারেই নয়, সাজিমাটীর সাবান দিয়ে গামলা সাফ করতে হবে। খুব সতর্ক হতে হবে যেন একটুও সাবান গামলার গায়ে লেগে

না থাকে। গামলা সাফ করে তাতে পরিষ্কার জল ঢালো। গামলার তলায় পরিষ্কার বালি বিছিয়ে দেবে—এই বালি যেন নোণা না হয়। তার পর চাই শ্যাওলা। ঝাঁজি দিতেই হবে—খুব ঘন শ্যাওলা দিয়ো না। সরু আঁশওয়ালা, অর্থাৎ সুতার মত ছোট ছোট ডালওয়ালা শ্যাওলাই সব-চেয়ে ভালো। এই শ্যাওলা বাহির থেকে অক্সিজেন গ্যাস বয়ে আনে; আর সেই সরু ডাল বয়ে পরিষ্কার অক্সিজেন জলের মধ্যে যায়। সেই অক্সিজেন লাল মাছদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার সুযোগ দেয়। এই অক্সিজেন হলো, শুধু লাল মাছ কেন, সমস্ত জীবের প্রাণবায়ু।

শ্যাওলা পুকুর থেকে প্রচুর সংগ্রহ করা যাবে। খুব পাঁক-ওয়ালা নোংরা পুকুরের শ্যাওলা নিয়ো না। লম্বা শিকড়-ওয়ালা শ্যাওলাই ভালো। তাছাড়া ছোট শামুক গেঁড়ি গুগলি রাখতে পারলে ভালো হয়। ভালো হয় বলি কেন?—গেঁড়ি-গুগলি-শামুক রাখা চাইই। কারণ এদের কচি শাঁস লাল মাছ খেতে চায়। একঘেয়ে খাবার কে খায়? খই খাওয়ালে মাছেরা প্রাণ বাঁচবে বটে, তবে শামুক গেঁড়ি-গুগলির শাঁস তাদের খোলা থেকে এরা মাঝে মাঝে খেতে চায়। মুখ বদলাবার জন্যই শুধু নয়, শরীর-রক্ষার জন্যও বটে। খই প্রশস্ত আহার। পাওরুটীর টুকরো লাল মাছকে কেউ কেউ খেতে দেয়, কিন্তু তার মস্ত দোষ জলে গুলে গিয়ে রুটীর টুকরো নোংরার সৃষ্টি করে।

শ্যাওলা, শামুক ছাড়া আর কতকগুলি জিনিষ জলে দেওয়া চাই; সে জিনিষ হলো ছোট ছোট নুড়ি।

তারপর চাই জল বদলানো। রোজ একবার জল বদলাতে পারলে ভালো হয়; না হয় তো একদিন অন্তর জল বদলাবে। একেবারে হুশ্ করে বালতি বা ঘটী থেকে জল না ঢেলে লম্বা রবারের নল দিয়ে জল ঢালতে পারলেই ভালো হয়। নলের একটা মুখ গামলার মধ্যে ঝুলোনো থাকবে, এই নলের আর-এক মুখে জল ঢালবে। এভাবে জল ঢালার মানে শ্যাওলা নুড়ি বা মাছ শামুক কাউকে বিরক্ত বা নাড়াচাড়া করা হবে না।

তারপর লাল মাছকে নাড়াচাড়া করা—হাতে নিতে হলে খুব আলতো

ভাবে নিতে হবে। একটু জোরে হাত লাগলে মাছের আঁশ ঝরে যাবে। এই আঁশ হলো তার রক্ষা-কবচ; একটি আঁশ খসে গেলে শরীরের সে অংশ দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। কাজেই হাতে করে ঘাঁটাঘাঁটি করলে লাল মাছকে বাঁচানো শক্ত হবে। ছোট ছাঁকনি জাল বানিয়ে নিয়ে তাতে তুলে নাড়াচাড়া করতে পারলেই মাছের পক্ষে ভয়ের কোনো কারণ থাকবে না।

লাল মাছের একটা রোগ আছে, যা একেবারে কলেরা-বসন্তর মত এপিডেমিকের সৃষ্টি করে। যখনই দেখবে কোনো মাছের গায়ে সাদা ফুটকির মত দাগ দেখা যাচ্ছে, তখনি বুঝবে সেই সর্ব্বনেশে রোগ তাকে ধরেছে। সে মাছকে তখনি অন্য পাত্রে রাখবে এবং গামলার জল বদলে ফেলবে। এই রোগে ভুগছে এমন মাছকে জলে রাখলে অন্য মাছেরও সেই রোগ হবে। এবং এ রোগ এদের অতি-শীঘ্র মৃত্যুর দোরে টেনে ফেলবে। লাল মাছ কেনবার সময় জানা বিশ্বাসী লোকের কাছে কেনাই ভালো। বেশী দামের মাছ হলেই যে মাছ ভালো হবে, এমন মনে করো না। ছোট মাছ কেনাই ভালো। দাম শস্তা হবে, তাছাড়া তাদের 'পালন' করতে কষ্টও কম। তিন ল্যাজওয়ালা মাছের বাহার বড় হলে সব-চেয়ে বেশী খোলে। কালো মাছও দেখতে চমৎকার।

একটা কথা মনে রেখো, রৌদ্রের তাপ এদের শরীরে সহ্য হয় না। শীতকালে সকালের দিকের রৌদ্র এদের পক্ষে ক্ষতিকর হয় না, তবে গ্রীষ্মকালে বেলা সাতটা বাজলেই রৌদ্রের দিক থেকে মাছের গামলা সরিয়ে রেখো। যেখানে হাওয়া প্রচুর, আলো প্রচুর, এমন জায়গায় গামলা রেখো। আর গামলা যত কম নাড়াচাড়া করতে হয়, ততই মঙ্গল।

এবারে মোটামুটী এই কটি কথা বললুম। আরো বেশী খপর যদি জানতে চাও, তো মৌচাকের সম্পাদক-মশায়ের কাছে লিখে পাঠিয়ো, জবাব দেবো।

শ্রীগৌরদেব মুখোপাধ্যায়

বাসন্তিকা *

(গীতি-নাটিকা)

শ্বেত রঙ্গপট

শুষ্ক ডাল-পাতা জ্বালিয়ে, তার চারপাশে ব'সে বন-বালারা আগুন পোয়াচ্ছে।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

দুর্ব্বাদলের শ্যামল চোখে আজ্‌কে শিশির-অশ্রু ঝরে,
হিমেল শীতের শীতল বাতাস মরচে কেঁদে মাঠের পরে!
উষার প্রাণে তুষার ঢালা,
গলায় দোলে শুক্‌নো মালা,
শিউলিরা ঐ ধূলায় শুয়ে, মন যে কেমন কেমন করে!

প্রথম বনবালা—কেঁপে মরি মা কেঁপে মরি!

দ্বিতীয়—প্রাণ যায় গো, প্রাণ যায়!

তৃতীয়—কাল কুয়াশার ভয়ে চাঁদ ওঠেনি।

চতুর্থ—আজ বোধ হয় সূয্যিও উঠবে না।

প্রথম—চল ভাই, সবাই বনলক্ষ্মীর কাছে ধর্ণা দিয়ে পড়ি গে।

দ্বিতীয়—আর যেতে হবে না, ঐ যে তিনি এদিকেই আসচেন!

তৃতীয়—এস, সবাই মিলে ওঁকে বলি যে, এ বনে আর থাকা চলে না!

চতুর্থ—হ্যাঁ ভাই, এ বনে বাজ্যির শীত এসে বাসা বেঁধেচে!

প্রথম—আর পাখী ডাকে না—

দ্বিতীয়—আর ফুল ফোটে না—

তৃতীয়—আর জ্যোছনা হাসে না—

চতুর্থ—আর দখিনা দেয় না—

সকলে—মাগো মা, এখানে কি মানুষ থাকে!

---

* রবি-বাসরীয় গীতি-বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের দ্বারা অভিনীত। এখন কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে "মৌচাকে" প্রকাশিত হ'ল।

(গান গাইতে গাইতে বনলক্ষ্মীর প্রবেশ)

গান

আমার প্রাণে একটি বাঁশী সদাই বাজে, সদাই বাজে,
দুখের দিনে, সুখের দিনে, সমান তালে সকাল-সাঁঝে !
মন-ভোলানো ঐ আকাশে,
বন-দোলানো ঐ বাতাসে,
আলো-ছায়ার মায়া-লীলায় সুরের খেলা হৃদয়-মাঝে !

সকলে—দেবি, আর আমরা এখানে থাকতে পারব না !

বনলক্ষ্মী—কেন বাছা, তোদের আবার কি হ'ল ?

সকলে—এখানে ভারি শীত মা, ভারি শীত !

বনলক্ষ্মী—(সহাস্যে) ভারি শীত ? তা শীত নেই, এমন কোন্ দেশে যেতে চাস তোরা ?

সকলে (গান)

মোরা, সেই দেশেতেই যাব, মোরা সেই দেশেতেই যাব,
যেথায়, চাঁদের আলো, ফুলের হাসি দেখতে সদাই পাব !
যেথায়, কোকিল-পাখী ডাকে, তমাল শাখে শাখে,
যেথায়, দখিন-হাওয়ার খেলা, প্রজাপতির মেলা,
যেথায়, সবুজ ঘাসের সভায় ব'সে সুখের গীতি গাব !

বনলক্ষ্মী—ও, তোরা বুঝি চির-বসন্তের রাজ্যে থাকতে চাস্ ?

সকলে—হ্যাঁ মা, হ্যাঁ ! চির-বসন্ত—চির-বসন্ত—যেখানে শীতের জারিজুরি একটুও খাটে না !

বনলক্ষ্মী—এ আর এমন শক্ত কথা কি ?

সকলে—(সোৎসাহে) শক্ত নয় ? তবে আমাদের সেইখানে নিয়ে চল মা, সেইখানে নিয়ে চল !

বনলক্ষ্মী—আমাকে নিয়ে যেতে হবে কেন বাছা, সে দেশে তোরা তো নিজেরাই যেতে পারবি !

সকলে—আমরা তো সে'দেশ চিনি না, তার ঠিকানা জানি না!

বনলক্ষ্মী—সে দেশের ঠিকানা তোদের মনের ভিতরে!

সকলে—(সবিস্ময়ে) আমাদের মনের ভিতরে!

বনলক্ষ্মী—হ্যাঁ। তোদের মনের ভিতরে।

প্রথম—মনের ভিতরে! কৈ, কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো!

দ্বিতীয়—মনের ভিতরে সুধুই যে অন্ধকার!

তৃতীয়—আর ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ শীতের কাঁপুনি—

চতুর্থ—আর কন্‌কনে ঠাণ্ডা দীর্ঘশ্বাস!

বনলক্ষ্মী—(সহাস্যে) অমন ক'রে দেখলে তো মনকে দেখা যায় না বাছা! তোদের যে কবির চোখ নিয়ে দেখতে হবে!

সকলে—(সবিস্ময়ে) কবির চোখ নিয়ে!

বনলক্ষ্মী—হ্যাঁ। কবি এই পৃথিবীতে থাকেন বটে, কিন্তু দিনে-রাতে, শীতে-গ্রীষ্মে, আলো-আঁধারে তাঁর বাঁশী কখনো আনন্দের রাগিণী ভোলে না, কারণ তিনি মনোবসন্তের রাজ্যে বাস করেন। পৃথিবীর ধূলোর দিকে তাঁর চোখ থাকে না, তাঁর চোখ থাকে আপন মনের দিকে—নিত্যই যেখানে বসন্তের উৎসব চলচে। তাইতো সকল ঋতুতেই কবির প্রাণ ঝরণার মত হাসির গান গেয়ে যেতে পারে। তোরাও কবির চোখে এই পৃথিবীকে দেখবার চেষ্টা কর্, তাহ'লে তোদেরও আর শীতের ভয় থাকবে না!

সকলে—ওমা, এমন কথা তো কখনো শুনি নি!

বনলক্ষ্মী—এই তো হচ্চে আসল কথা। বসন্ত যে মানুষের মনের আত্মীয়। যে অকবি, যার মনের ভিতরটা অসাড়, বসন্তকালেও তো সে বসন্তের আনন্দ ভোগ করতে পারে না!

সকলে—আমরা ডাক্‌লেই বসন্ত আসবে?

বনলক্ষ্মী—মানুষের প্রাণের ডাকে সাড়া দেওয়াই যে বসন্তের ধর্ম্ম! ডাকার মতন ডাকতে পারলে বসন্ত যে মরুভূমিতেও ফুলের ফসল ফলাতে পারে!

সকলে—ওহো, কি মজা! কি মজা!, আমরা ডাকলেই বসন্ত আসবে! চল্ চল্, সবাইকে বলি গে চল্!

(সকলের প্রস্থান)

বনলক্ষ্মী—গান

সবুজ নিশান কে ওড়াবে নতুন হাওয়াতে,
মিষ্টি চাঁদের সাধ-জাগানো চোখের চাওয়াতে !
অশোক, শিমূল, ও মাধবী।
আমের মুকুল, লাল করবী !
নাচের তালে সবাই জাগো বাঁশীর গাওয়াতে।

(প্রস্থান

(দুজন শীতানুচরের প্রবেশ)

প্রথম—চু রে রাং চাং, সোনা দিয়ে বাঁধাব ঠ্যাং !

দ্বিতীয়—সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা—সা-নি-ধা-পা-মা-গা-রে-সা।

প্রথম—আঃ, দিব্যি ঠাণ্ডাটি পড়েচে ভাই, কি মিষ্টি !

দ্বিতীয়—সত্যি ভাই, যা বলেচিস্। হিমালয় থেকে কন্‌কনে হাড়-কাঁপানো হাওয়া আসচে, সবুজ পাতাগুলো ঝ'রে পড়েচে, আর ন্যাড়া ন্যাড়া গাছগুলোর মাথা বরফের কুচিতে একেবারে ছেয়ে গেছে। চারদিকে কোথাও ফুলের নামগন্ধ নেই—কি সুন্দর দেখাচ্চে !

প্রথম—ওদিকে কুয়াশা-রাণীর আঁচলে চাপা প'ড়ে চাঁদা-মামা কেমন হাঁপিয়ে উঠেচেন, কোকিলগুলো ভাঙা গলায় ডেকে ডেকে কাণে আর তালা ধরাতে পারচে না, মৌমাছি আর ভোমরাগুলো হুল নেড়ে ভ্যান্ ভ্যান্ ক'রে বেড়াচ্চে না,—আঃ, বেশ মজায় আছি রে ! আয় ভাই, মনের ফুর্ত্তিতে একটা গান গেয়ে নি।

উভয়ে—গান

ওহো, ধিন্‌তাধিনা পাকা নোনা, ডাল-ভাতে-ভাত চড়িয়ে দে'না !
যাদের মানা তাদের মানা, নাক কেটে ধুম—ধম্ তেরেনা !
মুইও চিঁচাই, তুইও গা'না,
ও দিম্ তান্নুম দিম্ তা না না,
ঘোড়ার ডিমের ডাল্‌না খাব, ডিম দে' না রে দিন্ দে রে না !

(নেপথ্যে গান)

বসন্ত গো, এস এস, মনের সকল দুয়ার খুলে।

প্রথম—(চম্‌কে উঠে) তাইতো, কি হবে ! বনবালারা যে বিদ্রোহী হয়েচে।

দ্বিতীয়—সর্ব্বনাশ ! ওরা এরি মধ্যে বসন্তকে ডাকচে।

প্রথম—ওদের ডাক শুনে দুষ্টু বসন্ত সত্যিই যদি এসে পড়ে।

দ্বিতীয়—চল্ ভাই চল্, রাণীকে খবর দিয়ে আসি।

(দুজনের বেগে প্রস্থান)

(বনবালাদের প্রবেশ)

গান

বসন্ত গো, এস এস, মনের সকল দুয়ার খুলে।
বনের পাতার ঘুম ভাঙিয়ে, রূপ-সায়রে দুলে দুলে।
তমাল-পিয়াল-বকুল-বনে,
জাগিয়ে সাড়া ক্ষণে ক্ষণে,
মাখিয়ে দিয়ে চাঁদের আলো নদীর শ্যামল কূলে কূলে।
নীল-আকাশে উড়ুক তোমার নতুন-গাঁথা কমল-মালা,
রঙে রঙে দাও রঙিয়ে এই ধরণীর প্রাণের ডালা।
এস এস সকল-ভোলা।
দুলাও তোমার আলোর দোলা,
বুলিয়ে চল স্বপন-তুলি কানন-ভরা ফুলে ফুলে।

প্রথম—স্থাখ্ স্থাখ্, ওদিকের বন দুলিয়ে সত্যিই কি যেন বয়ে যাচ্চে না ?

আর সকলে—দখিন বাতাস, দখিন বাতাস।

দ্বিতীয়—গাছের ডালে ডালে ও কি ফুটে উঠচে ?

আর সকলে—সবুজ পাতা, সবুজ পাতা।

তৃতীয়—আকাশের গায়ে মেঘের ওপরে জরির পাড়ের মত ও কি ফুটে উঠচে ?

আর সকলে—চাঁদের আলো, চাঁদের আলো।

চতুর্থ—হ্যাঁ ভাই, তবে কি বসন্ত সত্যিই এল,—নইলে প্রাণের ভিতরটা এমন উল্‌সে উঠচে কেন ?

আর সকলে—বসন্ত এসেচে, বসন্ত এসেচে। সত্যিই বসন্ত এসেচে

গান

হারে রে, রঙের বাঁশী বাজিয়ে কে আজ মন ভুলালো,

—বাসতে ভালো !

আহা রে, পূর্ণিমা আজ মূর্ত্তি ধ'রে জ্বাললে আলো,

—বাসতে ভালো !

ধ্যান-সাগরের ওপার হতে

কে এল আজ রূপের স্রোতে,

মরি রে, কোন্ কুহকে মন-গহনে ঘুচিয়ে কালো,

—বাসতে ভালো !

(সকলের প্রস্থান)

[ধীরে ধীরে শ্বেত রঙ্গপট সরে গেল। সবুজ বন।]

(বসন্তের প্রবেশ)

গান

সাধ ক'রে আজ পথ ভুলে ভাই, অতিথ্ আমি ভুবন-দ্বারে,

সবুজ প্রাণের ডাক শুনেছি, থাক্‌তে দূরে পারব না সে !

চাঁদের আলো, চাঁদের আলো !

তোমার প্রেমের কিরণ ঢালো,

নয়ন-তরী যায় ভেসে যায় নীলাকাশের পারাবারে !

আমার বিভোল চিত্ত-মাঝে, কোন্ রাগিণী নিত্য বাজে,

সেই সুরেতে বিশ্ববীণা,

শুন্‌ব আমি বাজ্‌বে কিনা,

ফুটিয়ে তুলে হাসির মত ফুলের কুঁড়ি ভারে ভারে !

(প্রস্থান)

(চারজন বনবালার প্রবেশ)

প্রথম—ঐ শোন্—

দ্বিতীয়—কি ?

প্রথম—বনে বনে কোকিল-পাপিয়ার সুরের ঝড় ছুটেছে।

তৃতীয়—আর তাই শুনে জ্যোছনার বুক পুলকের ঢেউয়ে দুলে দুলে উঠচে!

চতুর্থ—বনলক্ষ্মী ঠিক বলেচেন! সত্যিই তো আমাদের মনের বসন্ত আজ বাইরের ভুবনে, আকাশে-বাতাসে, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েচে!

প্রথম—কিন্তু ফুল ফুটবে কখন্, প্রকৃতিকে সাজাবে কে?

দ্বিতীয়—মৌমাছি আর ভ্রমর এখনো বোধ হয় খবর পায়নি! তারা না ডাকলে তো ফুলের ঘুম ভাঙবে না!

তৃতীয়—তারা কোন্ গোপনে লুকিয়ে আছে ভাই?

চতুর্থ—কে জানে সে ঠিকানা?

সকলে—তবেই তো! মৌমাছি আর অলিকে খবর দেবে কে?

নেপথ্যে অনেক—আর খবর দিতে হবে না, খবর আমরা পেয়েচি।

(আরো কয়েকজন বনবালার প্রবেশ)

গান

ফুটবে কুঁড়ি খবর এসেচে।
কোন্ কাননের কোন্খানে ভাই, কোন্ মুরলীর মূর্চ্ছনা—
ফুল-পরীদের ভালো বেসেচে?
সেকি, নতুন হাওয়ায় মুখ খুলেচে,
সেকি, নদীর তানে ঘুম ভুলেচে,
সাত-সাগরের ওপার থেকে কোন্ স্বপনের ইঙ্গিতে—
রূপটানেতে মনটি হেসেচে?
সবুজ-পাতার দোল্না দোলে (গো), কোন্ কবিতার ছন্দতে,
কোন্ পাপিয়ার বুকের গীতি লীলায় মাতে গন্ধতে!
দেখ, ঘুম ভেঙে ঐ জুটল অলি,
বলি, কেমন ক'রে ফুটল কলি?
তারার আলোর নিছ্নিতে, বাসন্তিকার গুঞ্জনে—
অশোক-চাঁপার ঘোমটা ভেসেচে!

(সকলের প্রস্থান)

(শীতানুচরদের বেগে প্রবেশ)

গান

শীত গেল রে, প্রাণ গেল রে, ভালোয় ভালোয় আয় পালিয়ে !

ফাগুন-মাসের আগুন-হাওয়া বন-বাদাড়ে যায় জ্বালিয়ে ।

মনের সুখে ছিলেম খাসা,

হায় রে কপাল, ভাঙল বাসা !

হিমালয়ের দিকেই তবে পাগুলোকে চল্ চালিয়ে।

(বেগে প্রস্থান)

শ্বেত রঙ্গপট

(শীত ও সর্দ্দির প্রবেশ)

শীত—কি মুস্কিল, আমার রাজ্যে বসন্তের উপদ্রব ! কে তাকে এখানে ডেকে আনলে ?

সর্দ্দি—(কাশতে কাশতে) বনলক্ষ্মীর পরামর্শেই এই কাণ্ড হয়েচে।

শীত—(সক্রোধে) আচ্ছা, এখনি আমি বনলক্ষ্মীর কাছে যাচ্চি !

সর্দ্দি—(নীরবে কাশতে লাগল)

শীত—কি আপদ ! সর্দ্দি, আমার মুখের কাছ থেকে তুমি তোমার মুখ সরিয়ে নিয়ে যাও বলচি !

সর্দ্দি—কেন মহারাজ ?

শীত—কেন, তা জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হ'ল না তোমার ? বাপরে বাপ, সেবারে কি বিপদেই ফেলেছিলে ! আমার মুখের কাছে এম্নি কাশতে কাশতে তুমি দুবার হেঁচে ফেললে, আর তার পরের দিন থেকেই আমাকে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ধরল ! তারপর আমার প্রাণ নিয়ে সে কি টানাটানি ! শেষটা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দর্শনী দিয়ে, স্বর্গ থেকে ধন্বন্তরিকে আনিয়ে তবে সে যাত্রা প্রাণে প্রাণে রক্ষে পাই ! আমার সামনে তুমি কিনা আবার খক্ খক ক'রে কাশচ ? স'রে দাঁড়াও, শীগ্গির স'রে দাঁড়াও !

(নেপথ্যে বনলক্ষ্মীর গান)

শীত—কে গান গায় ?

সর্দ্দি—বনলক্ষ্মী। উনি যে এই দিকেই আস্চেন দেখচি !

শীত—তাই নাকি? সর্দ্দি, তাহ'লে তুমি এখনি এখান থেকে বিদাও হও!

সর্দ্দি—কেন মহারাজ, আর একটু থাকি না! বনলক্ষ্মীর গান আমার ভারি ভালো লাগে।

শীত—না, না, তোমার কাশির আওয়াজ পেলে বনলক্ষ্মী আর এমুখো হবেন না! ভদ্র-সমাজে তোমার কি আর মুখ দেখাবার উপায় আছে হে? যাও, বিদায় হও!

(সর্দ্দির প্রস্থান)

(বনলক্ষ্মীর প্রবেশ)

গান

হৃদয়ে আজ দোল দিলে রে, সেই দোলেতে ভুবন দোলে, (দোদুল দোলে)
বনের পাতায় দুল্‌চে শ্যামল, মর্ম্মরিত সুরের বোলে, (দোদুল দোলে)
দুল্‌চে মেঘে তারার হাসি, আলোর কুঁড়ি রাশি রাশি,
মাধবী ঐ দুলিয়ে দোলা আকুল পুলক জাগিয়ে তোলে (দোদুল দোলে)।
রঙন-ফুলের রাঙা দোলায় দুল্‌চে ভ্রমর, দুল্‌চে অলি,
মানস-সরোবরের জলে দুল্‌চে ভাবের কমল-কলি!
বিশ্ব দোলার দুল্‌কি-তানে, যৌবনেরি বিজয়-গানে,
তাথৈ নাচে বাউল হয়ে জীবন আমার মরণ ভোলে (দোদুল দোলে)!

শীত—দেবি, আমার প্রণাম নিন।

বনলক্ষ্মী—এস শীত, ভালো আছ তো?

শীত—দেবি, আমি তো ভালো আছি, কিন্তু আমার রাজ্য যে ছারখার হয়ে যায়!

বনলক্ষ্মী—সে কি কথা শীত?

শীত—আজ্ঞে হাঁ দেবি! আর শুনচি আপনার পরামর্শেই এই অমঙ্গল সম্ভব হয়েচে।

বনলক্ষ্মী—আমার পরামর্শে!

শীত—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুনলুম আপনার পরামর্শে বনবালারা বিদ্রোহী হয়ে অকালে বসন্তকে নিমন্ত্রণ করেচে। আমার রাজ্য বসন্ত অধিকার করবে কেন দেবি?

বনলক্ষ্মী—(সহাস্যে) বাছা শীত, মিছেই তুমি ভয় পেয়েচ। বসন্ত তোমার রাজ্য তো অধিকার করতে আসেনি,—সে এসেচে তোমার অতিথির বেশে।

শীত—অতিথির বেশে!

বনলক্ষ্মী—হ্যাঁ বাছা। অতিথি সৎকারেও কি তোমার আপত্তি আছে?

শীত—(একটু চিন্তা ক'রে), না, তা নেই। তবে ভয় এই, যদি আমার প্রতাপ নষ্ট হয় ?

বনলক্ষ্মী—তোমার প্রতাপ ? জানো শীত, তোমার এ ভয়ের শাসন ?

শীত—জানি মা। কিন্তু এ শ্রীহীন জীবনে তা ছাড়া আর উপায় কি ? ভয় না দেখালে লোকে আমাকে মানবে কেন ?

বনলক্ষ্মী—শীত, এটা তোমার মস্ত ভুল। লোকে যাকে চায়, তুমিও তাকে ভালোবাসতে শেখ, তুমিও তাহ'লে সকলের ভালোবাসা পাবে। তুমিও আজ বসন্তকে আদর ক'রে ডেকে নাও।

শীত—আমি ? কিন্তু আমার ডাক বসন্ত কি শুনবে দেবি ? সে সুন্দর, আমি কুৎসিত, সে তরুণ, আমি বৃদ্ধ, সে আলো আর আমি অন্ধকার। তার মন আমি পাব কেন মা ?

বনলক্ষ্মী—বসন্তের কাজই যে তাই। সে কুৎসিতকে সুন্দর করে, বৃদ্ধকে তরুণ করে, অন্ধকারকে আলো করে। বসন্তকে তোমারই তো বেশী দরকার !

শীত—দেবি, আপনার কথায় আমার সকল ভয় দূর হ'ল। আমি শীত, আজ থেকে আমিও বসন্তের গান গেয়ে গেয়ে আমার প্রাণের মরুভূমিতে স্বর্গের পারিজাত ফুটিয়ে তুলব ! জয়, বসন্তের জয় !

গান

শীতল বুকের তলায় ওগো ঘুমিয়েছিল সবুজ হাসি,
কে তাহাকে জাগিয়ে দিলে ফুটিয়ে তুলে কুসুম-রাশি।
অন্ধ-স্বপন ভুলিয়ে দিয়ে,
মর্ম্ম-গগন দুলিয়ে দিয়ে,
আলোর ছাঁদে সুর ধরেচে না-শোনা ঐ চাঁদের বাঁশী।
মনের বনের আলোক-লতা, কে জানে তার পুলক-ব্যথা !
আকাশ তারে ডাকল কাছে,
বাতাস যে তার প্রাণেই নাচে,
শয়ন-ভোলা নয়ন-পাখী শ্যাম-সায়রে যায় যে ভাসি।

(উভয়ের প্রস্থান)

শ্বেত রঙ্গপট স'রে গেল। ফলে-ফুলে সুশোভন, আলোকোজ্জ্বল বনভূমি।

(বসন্তের প্রবেশ)।

গান

রূপকথা যে শুনতে এলেম, ওরে অশোক, তোদের কাছে,
সেই পুলকে ফুলেল হাওয়া ঝুলন খেলে বকুল-গাছে।
এসেচি আজ রঙের পুরে,
কিশোর কিশলয়ের সুরে,
ভুবন ভরা রঙের ভাষা আমার প্রাণে লুকিয়ে আছে।
শোন্ করবী, শিরীষ, পলাস, দুলাল-চাঁপা, ঝুমকো লতা।
বল্‌ব কি ভাই, কাণে কাণে মধুবনের মনের-কথা?
বাজ্‌চে শুনি মউল-বনে
ফুলের বাঁশী ক্ষণে ক্ষণে,—
কমলাফুলি রং মেখে তাই 'কুহু'র তালে মন যে নাচে। (প্রস্থান)

(আনন্দে নাচতে নাচতে বনবালাদের প্রবেশ)

প্রথম—ওরে ভাই, শীত-কুহেলির দিন ভুলে যা,—আজ আকাশে বাতাসে চারিদিকেই সুধু বসন্ত আর সুধু বসন্ত।

দ্বিতীয়—আর ফুলের গন্ধ।

তৃতীয়—আর গানের ছন্দ।

চতুর্থ—আর প্রাণের আনন্দ।

পঞ্চম—এত সুখ, এত হাসি এত দিন কোথায় লুকিয়ে ছিল ভাই?

ষষ্ঠ—কুয়াশার ঐ সাদা আঁচলের কালো ছায়ায়, আকাশের নীল বুকের আড়ালে।

সপ্তম—না, না, শিশিরে-ভেজা ঝরা-শেফালীর ঘুমন্ত প্রাণে।

অষ্টম—না, না, কুঞ্জবনে প্রজাপতির নীরব গুঞ্জরণে।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ—ওরে না, না, এতদিন এ আনন্দ লুকিয়ে ছিল আমাদেরই মনের ভিতরে!

পঞ্চম—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েচে ভাই! তাহ'লে আজ আমরা কি করব ভাই?

সকলে—আজ আর কিছু করা নয়—আজ খালি গান, খালি হাসি, খালি খেলা! জয় বসন্তের জয়!

গান

বাসন্তিকার গলায় দোলে ঝিঁঝি-সুতোর মালা—
সুরু হ'ল নতুন গানের পালা।
আজ ভুবনের মনে মনে সুরের আগুন জ্বালা –
গাইবি কে আয় নতুন গানের পালা।
"গাইবি কে আয়, গাইবি কে আয়"—উতল হাওয়া ডাকে,
তাই শুনে কি নাচের মাতন বেবা-নদীর বাঁকে,
সোনার রঙে উঠল ভ'রে পূর্ণিমার ঐ থালা।
গাইতে হবে নতুন গানের পালা।
শ্যাম-সোহাগে আকুল হল কাঁচা সবুজ পাতা,
হৃদয়ে তার দোল-দোলানো ফুল ফোটানো গাথা।
"গাইবি কে আয়, গাইবি কে আয়"—বনের পাখী ডাকে,
তাই শুনে মন হিসেব নিয়ে ঘরে কি আর থাকে।
আলোর বীণা বাজল ওরে আঁধার ক'রে আলা—
গাইব সবাই নতুন গানের পালা।

(আচম্বিতে চারিদিক ম্লান হয়ে এল)

প্রথম—একি, চাঁদের আলো আবার ঝাপ্‌সা হয়ে এল কেন?

দ্বিতীয়—আকাশে কি মেঘ হয়েচে? বাতাস বইচে যেন তুষারের দীর্ঘশ্বাস।

তৃতীয়—বনে বনে মর্ম্মর ধ্বনিতে যেন কার কান্নার সুর জেগে উঠচে না?

চতুর্থ—ওকি, ভ্রমর প্রজাপতি আর মৌমাছিরা কোথায় গেল? এখনো তো তাদের খেলার বেলা যায় নি।

সকলে—(সভয়ে ও সবিস্ময়ে) ও কারা আসে গো, ও কারা?

(শীতের প্রবেশ)

ওমা, এযে শীত!—কি জ্বালা!

(বনলক্ষ্মীর প্রবেশ)

দেবি, দেবি, শীত আবার এখানে কেন?

(বসন্তের প্রবেশ)

এই তো বসন্ত হয়েচে, তবে শীত এখানে কেন ?

বনলক্ষ্মী—বসন্ত চিরদিনই তোমাদের কাছে-কাছেই আছে, চিরদিনই তোমাদের কাছে কাছেই থাকবে,—বসন্ত যে সকলের বন্ধু, বসন্ত যে অমর !

সকলে—তবে শীত আবার এখানে কেন ?

বনলক্ষ্মী—শীতও চিরদিন তোমাদের কাছে আছে, চিরদিন তোমাদের কাছে থাকবে ! তোমরা তাকে ডাকো ব'লেই তো সেও সাড়া না দিয়ে পারে না !

সকলে—একি কথা !

বনলক্ষ্মী—শীত আর বসন্ত দুজনেই যে তোমাদের মনের আত্মীয় ।

বসন্ত—আমি যে তোমাদের মনের সুখের মূর্ত্তি ! ডাকলেই আমার সাড়া পাবে ।

শীত—আর আমি যে তোমাদের মনের দুঃখের মূর্ত্তি । ডাকলেই আমি তোমাদের কাছে আসি !

বনবালারা—কিন্তু আমরা তো তোমাকে ডাকি না ।

শীত—যখনি তোমাদের আনন্দে অবসাদ আসে, তখনি তোমাদের ডাক যে আমি শুনতে পাই ! তাইতো আমি আসি ।

বনবালারা—আর আমাদের আনন্দে যখন অবসাদ আসে না ?

শীত—তখন আমিও সুখ হয়ে সুখের সঙ্গে এক হয়ে মিলে যাই—যেমন নিরানন্দের সময়ে তোমাদের মনের সুখ, দুঃখের সঙ্গে মিলে কাঁদতে থাকে ।

বনবালারা—তবে এতক্ষণ ধ'রে আমরা যা দেখচি, যা শুনচি—

বনলক্ষ্মী—হ্যাঁ, ঐ চাঁদ, ঐ নীলাকাশ, এই ফলে-ফুলে ভরা শ্যামল পৃথিবী, ... সুর, অলির গান—এ সবই সৃষ্টি করেচে তোমাদের প্রাণের আনন্দ !

বনবালারা—তবে চাঁদের আলো আবার ঝিমিয়ে আসচে কেন ?

বনলক্ষ্মী—শীতকে দেখে তোমরা অকারণে ভয় পেয়েচ ব'লে । ভয়ই যে দুঃখকে ডেকে আনে ! যে আনন্দ ভীরু, সে যে অসার্থক না হয়ে যায় না !

শীত—তোমরা মিছেই আমাকে দেখে ভয় পেয়েচ ! তোমাদের প্রাণের আনন্দে আমিও যে আজ আনন্দময় হয়েই এখানে ছুটে এসেচি—আমি শীত, আজ যে বসন্তের রূপে আর রসেই আবার সৌন্দর্য্যময় হয়ে উঠব !

সকলে—জয় বসন্তের জয়—জয় আনন্দের জয়।

(চারিদিক আবার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল)

বনলক্ষ্মী—সুখের মধ্যে দুঃখকে, দুঃখের মধ্যে সুখকে যিনি নূতন জীবন দিয়েচেন, আনন্দের আশীর্ব্বাদে এই বিশ্বকে যিনি বিচিত্র ক'রে তুলেচেন, আলো-আঁধারে যিনি সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি ফুটিয়ে রেখেচেন, এস, এখন আমরা তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করি!

গান

প্রণাম করি, প্রণাম করি!

ওকে নীল-সায়রের মোহন নাবিক যায় ভাসিয়ে রূপের তরী!

ও যার, বিশ্ব-বীণার মূর্চ্ছনাতে,

চন্দ্র-তারা সূর্য্য মাতে (রে),

চলে, কি বসন্তে, কি হেমন্তে, বর্ষা-শীতে রঙের হোরী!

প্রণাম করি, প্রণাম করি!

আহা, অশ্রু-হাসির ভাবের ঘরে অন্ধকারে জ্বলচে আলো,

ওরে, তার শিখাতে পথ চিনে মন, এই ধরণী বাসবি ভালো!

সে কে, মরুর বুকে কুসুম ফোটায়,

পাথর টুটে ঝরণা ছোটায় (রে),

আসে, বাদল-মেঘের কাজল-পটে ইন্দ্রধনুর ছন্দ ধরি!

প্রণাম করি, প্রণাম করি।

যবনিকা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মৌমাছি

মৌমাছির শরীরের প্রত্যেক অংশই এক একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার! তাদের এক একটা বিবরণ এইবার দেখা যাক।

মাথা

মৌমাছির মাথা অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে তাক্ লেগে যেতে হয়। এদের পাঁচটা

চোখ; তার মধ্যে তিনটে সাধারণ চোখ আর দুটো সংশ্লিষ্ট চোখ (Compound eye)। সংশ্লিষ্ট চোখ দুটো অণুবীক্ষণে দেখলে পাশাপাশি হাজার হাজার ছোট ছোট চোখ দেখতে পাওয়া যাবে। ঠিক এই সংশ্লিষ্ট চোখ দুটোর পাশ থেকে এদের শুঁড় দুটো (Antennae) বেরিয়েছে। এদের মাথার মস্তিষ্ক, মানুষ ছাড়া, অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অনেক বড়। এই মস্তিষ্কটাকে নাভিকেন্দ্র বলা চলে। নাভিকেন্দ্র হচ্চে টেলিগ্রাফের প্রধান কেন্দ্রের মত! টেলিগ্রাফের তারের মত নাভিকেন্দ্র থেকে চারিদিক অসংখ্য স্নায়ু চলে গেছে। শরীরের মধ্যে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে স্নায়ু নেই। শরীরের কোথাও কিছু হলেই স্নায়ু বেয়ে নাভিকেন্দ্রে টেলিগ্রাফ চলে যায়। আর তখনই প্রাণী অনুভব করে। মৌমাছিদের গলার কাছেও একটা নাভিকেন্দ্র আছে, তবে মাথারটাই বড়।

মানুষের মাথা কেটে নিলে সে প্রায় তখনই মরে যায়, কিন্তু মৌমাছির মাথা কেটে দিলে দুটো অংশই অনেকক্ষণ বেঁচে থাকে। এমন কি শুধু ধড়টা উড়ে অনেক সময় চাকে চলে যায়। মৌমাছি যখন ফুলের মধু খায়, তার কোমর থেকে অর্দ্ধেকটা কেটে দিলে মাথার দিকটা উড়ে উড়ে মধু খেয়ে বেড়ায়—প্রায় আধঘণ্টা বেঁচে থাকে। আর পিছন দিকটা হাতের তেলোয় তুলে নিলে হুল ফোটাবার চেষ্টায় বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে।

আশ্চর্য্য শুঁড়

মৌমাছির শরীরের সব চেয়ে আশ্চর্য্য অংশ হচ্ছে এর শুঁড় দুটো। এরা এই শুঁড় দিয়ে শুনতে পায়, শুঁকতে পারে আর স্পর্শ কোরে সব জিনিসের হাব-ভাব অনুভব করতে পারে।

রাত্রের অন্ধকার যখন চোখে দেখা যায় না এদের শুড় তখন চোখের কাজ করে। রাতের অন্ধকারেও মৌমাছিরা তাই মৌচাকের কাজ করতে পারে।

মৌমাছির শুঁড়ে বারোটা গাঁট আছে। প্রথম গাঁটটা খুব লম্বা, ইংরাজিতে এটার নাম Scape। তারপর এগারটা ছোট ছোট গাঁট। বড় গাঁট আর প্রথম তিনটে ছোট গাঁটে বড় বড় লোম আছে। গোলামদের শুঁড়ে প্রায় চোদ্দ হাজার,

বিবিদের প্রায় পাঁচ হাজার আর বাবুদের দুই হাজার লোম আছে। এই লোম দিয়েই এরা অনুভব করে। শুঁড় দিয়ে একবার একটু ছুঁয়েই এরা জিনিসের উচ্চতা, আকার, সব খোঁজ-খবর বলে দিতে পারে—ঠিক মাপকাঠিরই মতো। এই আশ্চর্য্য শুঁড়ের গুনেই এরা মৌচাকের প্রত্যেক খোপের প্রত্যেক কোন সমান করে এমন সুন্দর ভাবে গড়ে।

শুঁড়ের প্রত্যেক লোমে ছোট ছোট গর্ত্ত আছে— এই গর্ত্তের কতক দিয়ে এরা শুঁকতে আর কতক দিয়ে শুনতে পায়। সব চেয়ে আশ্চয্য হচ্ছে এদের শুঁড় দিয়ে কথা কওয়া। এক জনের শুঁড়ে আর একজন শুঁড় ঠেকিয়ে এরা নিজেদের মনের ভাব পরকে বুঝিয়ে দেয়।

চোখ

মৌমাছির পাঁচটা চোখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দুটো দিয়ে এরা দূরের জিনিস আর সাধারণ তিনটে দিয়ে কাছের জিনিস দেখে।

সংশ্লিষ্ট চোখ দুটোকে অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে ভারি সুন্দর দেখায়—রং বেগুনি! এই চোখ দুটোকে চট্ করে খুঁজে বার করা কঠিন দেখলে মনেই হয় না যে ও দুটো চোখ। মানুষের মত এদেরও চোখের উপর পাতা আর পাতার উপর চুল আছে। প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট চোখে অনেক খুদে খুদে চোখ আছে। প্রত্যেক চোখই এক একটা আলাদা আলাদা চোখ। সেই জন্যে এর নাম "সংশ্লিষ্ট"। বাবুদের প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট চোখে প্রায় তের হাজার ছোট চোখ আছে, গোলামিদের আর বিবিদের পাঁচ হাজার করে। সেই জন্যে বাবুদের সংশ্লিষ্ট চোখ আকারে আর সবার চেয়ে বড়।

এই দুটো চোখ ছাড়া সাধারণ চোখ তিনটে এদের মাথার উপরের অংশে থাকে – একটা মধ্যিখানে নীচের দিকে আর দুটো পাশাপাশি—অনেকটা এই রকম ৹ উপরের চোখ দুটো মাঝের চেয়ে অনেক বড়।

বাবুদের সংশ্লিষ্ট চোখ বড় বলে তাদের সাধারণ চোখ সেই অনুপাতে ছোট।

জিভ ও চোয়াল

মৌমাছির মধু সংগ্রহ করবার যন্ত্র জিভ। এরা ইচ্ছা-মত জিভকে গুটোতে বা বার করতে পারে। গোলামদের মধু সংগ্রহ করতে হয় বলে এদের জিভ বাবু ও বিবিদের ডবল লম্বা। গোলামদের জিভে প্রায় একশ' সারি, বাবু আর বিবিদের প্রায় পঞ্চাশ সারি লোম আছে। জিভের অধিকাংশ লোমেরই কাজ হচ্ছে ফুলের মধ্যে কোথায় একফোঁটাও মধু পড়ে আছে তাই খুঁজে বার করা। মৌমাছিরা ফুলের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে চারিদিকে জিভ বুলিয়ে যায়—যেখানে এক বিন্দুও মধু পায় তক্ষুণি সংগ্রহ করে নেয়।

এদের জিভের ঠিক নীচে একটি ছোট্ট চামচ থাকে। মধুর সব চেয়ে ছোট-বিন্দুটিও এরা এই চামচ দিয়ে সংগ্রহ করতে পারে।

মৌমাছিদের চোয়াল খুব শক্ত। এদের দাঁত নেই বটে, কিন্তু এরা চোয়াল দিয়ে অনেক জিনিষ কেটে ফেলতে পারে। একটা মোটা কাগজের বাক্সে একটা মৌমাছিকে বন্ধ করে রাখলে একদিনের মধ্যে কাগজ কেটে সে বেরিয়ে আসে—দেখা যায়। অনেক সময় এরা চোয়াল দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে মৌচাক গড়বার জন্যে মোম নরম করে থাকে।

পা

তিন জোড়া পা যে মৌমাছিদের শুধু চলবার জন্যেই হয়েছে তা নয়। অনেক রকম কাজই এরা পা দিয়ে করে থাকে। প্রত্যেক পায়ে ন'টা গাঁট বা জোড় আছে—সকলের শেষের জোড়টা দিয়ে এরা আসল পায়ের কাজ করে অর্থাৎ চলে।

প্রত্যেক পায়ের তলায় এদের অনেক চুল, একজোড়া বাঁকান নখ, একটা প্যাড আর এক রকম আঠাল জিনিষ আছে। চুল গুলোতে এদের শুঁড়ের মত অনুভব করবার শক্তি আছে। এই চুল দিয়ে এরা ঝেঁটিয়ে ফুলের পরাগ সংগ্রহ করে আর অনেক সময় মৌচাকে ঝাঁট দেয়।

প্যাড নখ আর আঠাল জিনিষ এ তিনটেই এদের চলবার সাহায্য করে। প্যাডটা একটা মাংসের ঢিপি— ভিতরে গর্ত্ত করা, বাটির মত। খুব মসৃন জায়গায় চলবার

সময় এই প্যাডগুলো কাজ দেয়। প্রত্যেক বার পা ফেলাতে প্যাডগুলোও সঙ্গে সঙ্গে Airtight হয়ে যায়! তাই এরা পিছল জায়গায়, কাঁড়কাঠে বা কাঁচের উপরেও শক্ত হয়ে বসতে পারে। নখগুলো কাজ দেয় যখন এরা ঝাঁক বাঁধে তখন। একজনের পিঠে আর একজন নখ দিয়ে আঁকড়ে ঝুলে এরা ঝাঁক তৈরী করে। এদের ঝাঁক ভারি সুন্দর জিনিস, তার কথা পরে বলব। পায়ের তলার আঠাল জিনিসটা এদের চলবার একটুখানি সুবিধে করে দেয়। চলবার সময় অনবরত এদের পায়ের তলা দিয়ে এই আঠা বার হয়। মিনিটে এরা প্রায় বারশ' বার পা ফেলতে পারে।

সামনের পা দুটো অন্য চারটের চেয়ে কিছু ছোট। এই দুটো পায়ের প্রত্যেকটার মধ্যিখানে একটা করে খাঁজ আছে। খাঁজের মধ্যে থাকে একটি করে চিরুণী—ঐটি শুঁড় সাফ করবার যন্ত্র। শুঁড় দিয়ে এরা অনেক রকম ভাল-মন্দ জিনিস স্পর্শ করে আর আঘ্রাণ নেয়, তাই এদের শুঁড় খুব তাড়াতাড়ি ময়লা হয়ে যায় আর শুঁড়ের চুলের ছোট ছোট গর্ত্ত ধুলো-ময়লায় বুঁজে যায়। সেই জন্যে মাঝে মাঝে শুঁড় পরিষ্কার করা দরকার। তোমরা হয় ত অনেক সময় দেখে থাকবে, মৌমাছিরা সামনের পা দুটো মাথার কাছে তুলে এনে কি যেন করে—সেই সময় এরা শুঁড় সাফ করে। শুঁড়টা চিরুণীর মধ্যে চালিয়ে উপরে একটা ঢাকনি ফেলে দেয়। তারপর শুঁড়কে চিরুণীর ভিতর থেকে টেনে বার করে নিলেই শুঁড় পরিষ্কার হয়ে গেল। সামনের পায়ে ন'টা গাঁট আছে বলে এরা এত ঘুরিয়ে পা'টা মাথার উপর তুলতে পারে।

মাঝের পা দুটো সামনের দুটোর চেয়ে কিছু বড়, শেষের দুটোর চেয়ে কিছু ছোট। এই মাঝের পা দুটো দিয়ে এরা ডানা সাফ করে। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে ডানায় এদের ময়লা লাগে আর বেশী ময়লা লাগলে ডানা ভারি হয়ে ওড়বার অসুবিধা হয়। সেই জন্যে ডানাটাকেও এদের হরদম পরিষ্কার রাখা দরকার।

শেষের পা দুটোই হচ্ছে এদের সবচেয়ে দরকারী। পায়ের নীচের দিকে এদের একটা করে থলি থাকে। এই থলিতে করে এরা ফুলের পরাগ জমিয়ে মৌচাকে

নিয়ে যায়। অনেক সময় এতে করে জলও নিয়ে যায়। মৌচাক তৈরী করবার সময় এই পায়ের থলিতে এরা মোম বয়। এটাকে এদের ঝুড়ি বলা চলে।

দেহ

গোলাম আর বিবি মৌমাছিদের দেহে ছটা ভাগ আছে, বাবুদের দেহে সাতটা। গোলামদের পেটের তলায় আটটা মোমের থলি আছে—সেই থলিগুলোর মুখে মোম জমা হয়ে থাকে, আর দরকার মত সেই মোম দিয়ে এরা মৌচাক গড়ে। বাবু আর বিবিদের মোমের থলি নেই বলে এদের কাছ থেকে মোমও পাওয়া যায় না।

গোলামদের পেটে দুটো পাকস্থলী আছে—একটা মধু তৈরী করবার জন্যে, অন্যটা খাবার হজম করবার জন্যে। এরা ফুল থেকে মধু খেলেই সেই মধু মধুর পাকস্থলীতে গিয়ে জমা হয়। ফুলের মধু আর মৌচাকের মধুতে অনেক তফাৎ। ফুল থেকে মধু খেয়ে এদের পেটে গিয়ে অনেক রকম রসের সঙ্গে মিশে মৌচাকের মধু তৈরী হয়। একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অবধি এরা পাকস্থলীতে মধু রেখে দেয়; ততক্ষণ পাকস্থলীর রস মধুর সঙ্গে মিশতে থাকে।

এই পাকস্থলী থেকে একটা নল এদের শরীরের বাইরে অবধি এসেছে। এরা ইচ্ছামত এই নলের মুখ খুলতে বা বন্ধ করতে পারে। মৌচাকে ফিরে গিয়ে নলের মুখ খুলে এরা মৌচাকে মধু ঢেলে দেয়।

হুল

মৌমাছির হুলকে কে না ভয় করে? মৌমাছি মানুষের শরীরে হুল ফোটাবার সঙ্গে হুলের ভিতরের সরু ছেঁদা দিয়ে খানিকটা বিষ ঢেলে দেয়। সেই বিষ রক্তের সঙ্গে মিশে জ্বালা করে।

হুল মৌমাছির মাথায় থাকে; ইচ্ছামত এরা সেটাকে বার করতে বা ঢুকিয়ে রাখতে পারে। মৌমাছির হুল এত সূক্ষ্ম ও সুন্দর ভাবে তৈরী যে মানুষের-গড়া সবচেয়ে সরু ছুঁচের ডগা তার পাশে বিশ্রী মোটা দেখায়। এদের হুল খুব শক্ত—চট্ করে ভেঙ্গে যাবার নয়। মৌমাছিরা সব সময়েই হুল ঢুকিয়ে থাকে; রাগ হলে হুল উঁচিয়ে শত্রুকে তেড়ে যায়।

হুলের আগায় একটা বিষের থলি আছে; বিষের থলি থেকে একটা খুব সরু ছেঁদা হুলের ডগা অবধি গেছে। হুল ফুটোলেই এই থলিতে আপনি চাপ পড়ে আর হুলের ডগা দিয়ে বিষ বার হয়। এই বিষ Formic Acid। মৌমাছির কাছেই মানুষ এই Acidএর সন্ধান প্রথম পেয়েছিল। মৌচাকে অনেকদিন ধরে মধু জমা থাকলেও মধু পচে যায় না তার কারণ মৌমাছিরা মধুর সঙ্গে একটু করে Formic Acid মিশিয়ে দেয়। এর গুণে মধু অনেক দিন তাজা থাকে।

মৌমাছির হুলের উল্টো মুখে কতকগুলো কাঁটা আছে। সেই জন্যে এদের হুল সহজে ফুটে গেলেও বার করবার সময় কাঁটায় আটকায় বলে উঠে আসতে চায়না। এই জন্যে মৌমাছিরা কারুর গায়ে হুল ফুটোলে মৌমাছির আর বাঁচবার সম্ভাবনা থাকে না। হুল ফুটিয়ে তারা বার করে নিতে পারে না— টানাটানিতে হুলটা কিংবা সেই সঙ্গে মাথারও খানিকটা অংশ ছিঁড়ে যায়। মানুষ কিংবা কোনো শক্ত চামড়াওয়ালা প্রাণীর গায়ে হুল ফুটোলেই মৌমাছির এই দুর্দ্দশা হয়; কিন্তু অন্য কোন মৌমাছি বা নরম-মাংস-ওয়ালা প্রাণীর গায়ে হুল ফোটালে তাদেরই খানিকটা মাংস নিয়ে হুলটা বেরিয়ে আসে। যে কোন মৌমাছি যে কোন মৌমাছিকে হুল ফোটালেই শেষেরটি মরে যায়।

গোলামদের হুল ঠিক সোজা বিবিদের সামান্য বাঁকা। বিবি বড় চট করে কাউকে হুল ফোটান না— যখন তিনি বিদ্রোহী হয়ে চাক ছেড়ে চলে যান তখন সুবিধে পেলেই বাচ্চা বিবিদের হুল ফুটিয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেন।

'বিদ্রোহী' বিবি'র কথা তোমাদের পরের বারে বলব।

ক্রমশঃ

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত মৌচাক সম্পাদক বরাবরেষু—

যে ছেলে-মেয়েরা সারা জগতের পাকা-পাকা সাহিত্যিক, সমালোচক, নানা-তত্ত্ববিদ্, ভাষ্যকার, টীকাকার, তর্জ্জমাকার, মাসিকের সম্পাদক, বার্ষিকের চাঁদার খাতা-বাহক ও সাহিত্য সভা সমস্তের ভূত ভবিষ্যৎ সভাপতি সভাসদ সেক্রেটারি ইত্যাদির ঘরে ঘরেও মধু পৌঁছে দিতে এল, তাদের জন্য আজকালের বাংলা সাহিত্যের কোঠায় কে যে কোথায় কি জমা করলেন তা জানবার উপায় নেই যতক্ষণ না সে খবর কাগজে পড়ি, তাই আমরা - যারা সাহিত্য-আকাশে চাঁদ হয়ে লণ্ঠনের মতো ঝুলে থাকতে চাইনে, শুধু ছেলে-ভোলানো গল্প-স্বল্প লিখে তেলের পিদুম ঘরের কোণে জ্বালিয়ে দিয়ে আমাদের কথাটা ফুরিয়ে দিতে পারলেই খুসি হই, সেই দলের এক জনের লেখা 'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ' বলে বই খানির কথা 'মৌচাকে'র গ্রাহকদের জানাতে আপনার হুকুম চাই। দেশের সাহিত্যিকদের সভা বৈঠক ইত্যাদি যা বসে, তার হাল-চাল দেখে বোধ হয় যে শিশু-সাহিত্যকে তাঁরা সাহিত্যের একটা দরকারি জিনিষ বলেই ধরেন না। এই সেদিনও দিল্লীতে বাঙালী সাহিত্যিকদের মস্ত একটা সভা বসে গেল। সেখান থেকে যে সাহিত্য কেবলি বয়স্কদের মৌতাত জুগিয়ে চলেছো; কচিদের কাঁচাদের জন্যে এক ফোঁটা চোখের জলও নিয়ে আসছে না কেবল তারি খবরাখবর পেলেম! শিশু-সাহিত্য বলে একটা কিছু যে সাহিত্যের মধ্যে থাকা প্রয়োজন এবং তার খবর নেওয়া ও দেওয়া প্রয়োজন--একথা মনেই ওঠে না সাহিত্য-চর্চ্চার সময়ে; শিশু বলে একটা যে কেউ দাবি করছে দেশের সাহিত্যিকদের কাছে তার জন্যে লিখতে গল্প কবিতা নাটক নভেল পুরাণ ইতিহাস ভূগোল এবং নানা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বই —সে চিন্তাও নেই। কাজেই শৈশব বলে কালটা বাদ যাচ্ছে আমাদের সাহিত্য জগৎ থেকে এবং তার স্থান অধিকার করছে হটাৎ-গজিয়ে-ওঠ

শ্রীযামিনীকান্ত সোম লিখিত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২নং কর্ণওয়ালিসস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত মূল্য ১৲।

যাদুকরের আম গাছ এবং কোথাও কোথাও বা পশ্চিম বাতাসে শিকড়-গাড়া আগাছা ও শূন্যে লটকানো গোটাকতক সাহিত্য-ফানুস, যাকে হঠাৎ গ্রহ-নক্ষত্রের সমান বলে ভুল হয়। কিন্তু সত্যিকার গ্রহ-নক্ষত্র শৈশবকালকে অস্বীকার ক'রে তো বিরাজমান হয় না কোনো দিন, কেবল দেওয়ালীর ফানুস্ তারাই খানিক ধূঁয়ার ঠেলায় আকাশে উঠে ভিড় লাগিয়ে চমকে দেয় লোক, হাততালিও পেয়ে যায় যথেষ্ট।

ছেলে-ভুলোনো ছড়ায় আছে—

"তারা করে ঝিকি মিকি চাঁদ করে আলো—
যে ঘরেতে খোকা নেই সেই ঘর কালো!"

রইলোই বা আকাশে শরতের চাঁদ আলো দিতে, ঘরে যদি পিদুম না জ্বলে, চাঁদ-মুখ আলো না দেয় তো সব অন্ধকার। সাহিত্য-আকাশ জুড়ে সাহিত্যিকের ভিড় আর ঠেলাঠেলি—ঘরের প্রদীপ জ্বালাতে মনে নেই কারু, তার জন্যে চিন্তা নেই একটুও!

ছেলেবেলায় একটা খাবারওয়ালা পথ দিয়ে হেঁকে যেতো—ঘীউ আছে, চিনি আছে, সুজী আছে, ময়দা আছে, শুধু ডাল্ নাই কেট্ কেট্ গড়াম! আমাদের বাংলা সাহিত্য এই অপূর্ব্ব খাবার হয়ে দাঁড়াতে চলেছে—তার জাতীয়তা কাব্যাংশ বিষয়-নির্ব্বাচন, তার ভাষার মাগধী অর্দ্ধ মাগধী কাশী কোশলী সচল অচল ঠাঁট—ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে নিয়ে—শিশু কালটাকে বাদ দিয়ে।

আমাদের সৌভাগ্য যে শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোম "ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ" বলে চমৎকার শিশুপাঠ্য বইখানি রচনা করেছেন, না হলে বাংলার আমাদের ছেলে-মেয়েরা জানতেই পারতোনা তাদের কবি এখনো ছেলেদের জন্যে ভাবেন ও লেখেন দরদ দিয়ে।

বইখানির বিষয় আমার আপন জনকে নিয়ে সুতরাং এ বই সম্বন্ধে মতামত আমার দেওয়া সাজে না, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের দিক থেকে আমি 'মৌচাকে'র সব মধুকরকে এই বইখানির রস পরখ করে নিতে বলি। এই বই পড়তে পড়তে আমার নিজের হারাণো ছেলেবেলার অনেকখানি আজ অনেককাল পরে খুঁজে পেয়ে গেলেম

আমি এবং আমার সঙ্গে আমার ঘরের ছেলেমেয়েরাও সেকাল ও একালের উজ্জ্বল একখানি ছবি পেয়ে ধন্য হল ।

আমি পেলেম যা এবং এই 'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ' পড়ে দেশশুদ্ধ ছেলে-মেয়ে পাবে যা, শুধু সেইটুকখানির জন্যে ভবিষ্যৎ কালের কোনো এক সাহিত্য সভায় আজকের শিশু সে সভাপতি হয়ে প্রথমেই লেখক ও প্রকাশককে ধন্যবাদ দেবে নিশ্চয়, কিন্তু সেই সুদূর ভবিষ্যতে আমার পৌঁছবার উপায় নেই আশাও নেই, তাই আমি এখনি যামিনীবাবুকে বাংলার শিশু সাহিত্যে তাঁর এই দানের জন্যে আশীর্ব্বাদ ধন্যবাদ সবই দিলেম অন্তরের সঙ্গে ।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নতুন আবিষ্কার

আজ তোমাদিগকে কয়েকটি নতুন ধরণের গাড়ী এবং নৌকার কথা বলব ।

আমেরিকার মিঃ ম্যাক্‌লখিন নামে এক ভদ্রলোক একটি মজার মোটরকার নির্ম্মাণ করেছেন । এই মোটরকার দরকার মত জলে এবং স্থলে সমান ভাবে চলতে পারে । নদী বা খাল পার হবার জন্য এই সাহেবের পুল বা অন্য নৌকার দরকার হয় না । এই নতুন ধরণের গাড়ীটিকে উভচর বলা যেতে পারে । এরোপ্লেন-ইঞ্জিনের সাহায্যে এই গাড়ী চলে ।

কর্নেল মার্শেল নামক একজন সেনানায়ক একটি অত্যন্ত গতিশীল নৌকা তৈয়ার করেছেন । এই নৌকার গতি ঘণ্টায় ৯০ মাইল, অর্থাৎ মিনিটে দেড় মাইল । এই মোটর বোটটিতে এরোপ্লেন ইঞ্জিন লাগান হয়েছে । সাধারণ যে মোটর নৌকাতে লাগান হয়, তার গতি ঘণ্টায় তিরিশ মাইলের বেশী হয় না । মার্শেল সাহেব এই নৌকাটিকে বাইচ খেলবার জন্যে নির্ম্মাণ করেছেন । তিনি আশা করেন যে এই নৌকার সঙ্গে অন্য কোনো নৌকা বাজী জিততে পারবে না ! নৌকাটি দেখতে অত্যন্ত অদ্ভুত হয়েছে ।

তোমাদের মধ্যে যারা দার্জ্জিলিং বা সিমলা গিয়েছ তারা রেল মোটর দেখে থাকবে। আমাদের দেশের এই রেল মোটর মোটরবাসের মতন দেখতে। সম্প্রতি আর এক প্রকার নতুন ধরণের রেল মোটর আবিষ্কার হয়েছে। ইহা দেখতে ঠিক একটি ভাল দামী মোটরকারের মত। ইহার গতি ঘণ্টায় ৮০ মাইল। রেল লাইনের উপর গাড়ীতে গাড়ীতে ধাক্কা লাগে বা গাড়ী উল্‌টিয়ে বা অন্য কোনো প্রকারে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে এই মোটরে করে ডাক্তার ওষুধ-পত্র ঘটনাস্থলে খুব তাড়াতাড়ি পাঠাবার জন্যই এই গাড়ী ব্যবহৃত হবে। এই মোটরকার রেল লাইনের উপর চলে এবং এর সামনে ইঞ্জিনের মত "কাউ-ক্যাচার" লাগান আছে।
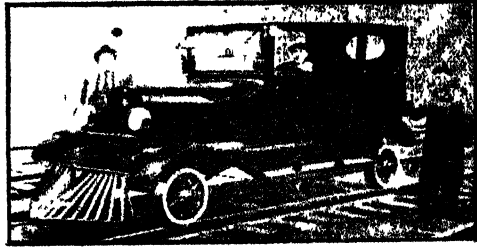
তোমাদের অনেকেই ট্রাইসাইকেল চড়েছ। কিন্তু মোটর সাইকেলের মত সাইডকারওয়ালা ট্রাইসাইকেল বোধ হয় চড় নাই। এতে দুইজন বেশ চড়তে পারে। ইহা দেখতেও ঠিক একটি ছোট সাইডকারওয়ালা মোটর বাইকের মত। ছবিতে দেখ—তোমাদের মত দুইজন কেমন আনন্দে মোটর সাইকেল চড়ার মত করে ট্রাইসাইকেল চড়েছে।

দুইজন হল্যাণ্ড বাসী একটি বাজী জিতবার জন্য একটি মোটর ট্রাকে করে সমস্ত জগৎ ভ্রমণে বাহির হয়েছেন। এই মোটরট্রাকটিকে তাঁরা সব রকম রাস্তায় সমান ভাবে চলবার মত করে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহাকে একটি ছোট-খাট চলন্ত বাড়ী বলা যায়। ইঁহারা ১৯২৪ খৃঃ অব্দে বের হয়েছেন—এবং এদের জগৎভ্রমণ শেষ করে

১৯২৪ খৃঃ অব্দে দেশে ফিরতে হয়। ইহারা এখন আমেরিকাতে ভ্রমণ করছেন। বছর দুই পরে আমাদের দেশে আসিবেন।
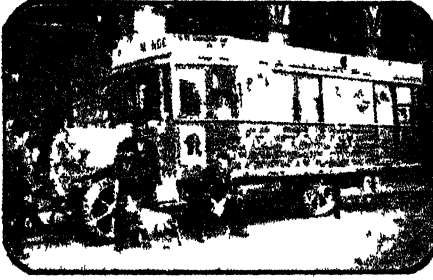
অনেক সময় নতুন সাঁতার শিখতে গিয়ে অনেকে জলে ডুবে মারা যায়। ইহা বন্ধ করবার জন্যে এক প্রকার সাঁতার শিখবার যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, এই যন্ত্রের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে সাঁতার কাটবার সময় যে প্রকার হাত পা ছোঁড়ার দরকার হয়, তা করা যায়। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে এই যন্ত্রের উপর কয়েক দিন সাঁতার শিখে একজন আনাড়ী লোক খুব অল্প সময়েই জলে সাঁতার কাটতে পারে। এই যন্ত্র এখনও আমাদের দেশে আসে নাই, যখন আসবে তখন তোমাদের খুব সুবিধা হবে। শীতকালে কাপড় চোপড় পরে সাঁতার শিখে গরম কালে সত্যিকার জলে আরামে সাঁতার কাটতে পারবে।

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ময়নামতীর মায়াকানন

চৌদ্দ

চোখের মায়া

এ দ্বীপেও তাহ'লে মানুষ আছে!

কাল রাত্রেই, সেই ভয়ানক বনের নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে ব'সে এই সন্দেহটা প্রথমে আমার মনের ভিতরে জেগে উঠেছিল। তারপর আজকে বালির

উপরে এই পায়ের দাগ! এ দাগগুলো যে মানুষেরই পায়ের ছাপ, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই!

এতদিন যে দ্বীপকে জলহীন ব'লে মনে করতুম, আজ সেখানে মানুষ আছে জেনে প্রথমটা আমার মন পুলকিত হয়ে উঠল! কিন্তু তারপরেই মনে হ'ল, এখানে মানুষ থাকলেও তারা কি আমাদের বন্ধু? তারা কি আমাদেরই মতন সভ্য? এই যে কমল আর কুমারের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, এ ব্যাপারের সঙ্গে কি তাদের কোনই সম্বন্ধ নেই?

কুমার আর কমল কোথায় গেল? বাঘার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত, কুমার জামাটা রক্তে ভেসে গেছে, এখানে অজানা মানুষের পায়ের দাগ, এ সব দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, এখানকার মানুষরা হয় তাদের বন্দী, নয় হত্যা করেছে!

রামহরি আকুল কণ্ঠে বললে, "বাবু, বাবু! নিশ্চয় কোন রাক্ষুসে জানোয়ার এসে কুমার আর কমল বাবুকে খেয়ে ফেলেচে!"

বিমল এতদূর অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে সে আর কোন কথাই কইতে পারলে না, দুই হাতে মুখ ঢেকে বালির উপরে সে হেঁট হয়ে ব'সে রইল।

আমি তার হাত ধ'রে নাড়া দিয়ে বললুম, "বিমল, ওঠ, ওঠ!"

বিমল মুখ তুলে হতাশ ভাবে বললে, "উঠে কি করব বিনয়বাবু?"

আমি বললুম, "কুমার আর কমলকে খুঁজতে যেতে হবে যে!"

অশ্রুপূর্ণনেত্রে বিমল বললে, "আর কি তারা বেঁচে আছে?"

আমি বললুম, "আমার বিশ্বাস তারা মরে-নি। এই বালির ওপরে যাদের পায়ের দাগ রয়েচে, তারাই তাদের ধরে নিয়ে গেছে।"

শুনেই বিমলের হতাশ ভাব চলে গেল! একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে সে বললে, "এ কথা তো এতক্ষণ আমার মনে হয়-নি! চলুন তবে! তারা যদি বন্দী হয়ে থাকে তাহ'লে তাদের উদ্ধার করতেই হবে!"

আমি বললুম, "দাঁড়াও বিমল, এতটা ব্যস্ত হলে চলবে কেন? আগে আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নি!"

বিমল বললে, "বন্ধুরা, শত্রুর হাতে, এখন আমরা পেটের ভাবনা ভাবব!"

আমি বললুম "না ভাবলে তো উপায় নেই ভাই! কাল থেকে অনাহারে আছি, আজ কিছু না খেলে শরীর আমাদের ভার বইতে রাজি হবে কেন? কুমার আর কমলের খোঁজে পথে পথে এখন ক'দিন কাটবে কে বলতে পারে?"

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বিমল আমাদের সঙ্গে আবার গুহার ভিতরে ফিরে এল। রামহরি সেকেলে ডানাহীন হাঁসগুলোর খানিক ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি উনুনে আগুন দিলে।......

যেমন-তেমন ক'রে খানিকটা সিদ্ধ মাংস খেয়ে এবং পথে খাবার জন্যে আরো খানিকটা মাংস সঙ্গে নিয়ে আমরা তিনজনে যখন আবার বেরিয়ে পড়লুম,— সূর্য্য তখন পশ্চিমে নামতে সুরু করেছে!

আমার ইচ্ছা ছিল আজ বিশ্রাম ক'রে কাল ভোর-বেলায় কুমার আর কমলের খোঁজে বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু এটুকু দেরিও বিমলের সইল না। অথচ সে একবারও ভেবে দেখলে না যে, ঘণ্টা কয় পরে রাত হলেই আমাদের পথের মধ্যেই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে হবে —কারণ বেলা থাকতে থাকতে এই অল্প সময়ের মধ্যে, নিশ্চয়ই আমরা কুমার আর কমলের কোন খোঁজই পাব না!

সমুদ্রের তীরে গিয়ে বালির উপরে সেই পদচিহ্নগুলো দেখে আমরা অগ্রসর হ'তে লাগলুম। বাঘা কিছুতেই একলা গুহার ভিতরে থাকতে রাজি হ'ল না,. কাজেই তাকেও সঙ্গে নিতে হয়েছে। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমাদের আগে আগে চলল

পাহাড় আর সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে বালির উপরে অসংখ্য পায়ের দাগ বরাবর চলে গেছে। দাগগুলো এত স্পষ্ট যে অনুসরণ করতে আমাদের কোনই কষ্ট হ'ল না। দ্বীপের যেদিকে আমরা যাচ্ছি এদিকে আমরা আগে আর কখনো আসিনি, এদিকটায় যতদূর চোখ চলে দেখতে পাচ্ছি খালি পাহাড়ের পর পাহাড়! অধিকাংশ পাহাড়ই ছোট ছোট—নব্বই কি একশো ফুটের বেশী উঁচু নয়। সেই সব পাহাড়ের মাঝে মাঝে ছোট-বড় বন-জঙ্গল। চলতে চলতে আমার মনে হ'তে লাগল, দ্বীপের এই অজানা অংশে হয়তো সেকালের আরো কত রকমের ভীষণ জীব বাস করে!

আজ রাত্রেই হয়তো তাদের অনেকের সঙ্গে দেখাশুনা হয়ে যাবে, কালকের মত আজ রাত্রেও হয়তো প্রতিমুহূর্ত্তেই চোখের সামনে মৃত্যু এসে মূর্ত্তি ধরে দাঁড়াবে! এ সব কথা ভাবতেও মন হাঁপিয়ে উঠতে লাগল—এমন নিত্য নব বিপদের সঙ্গে যুঝে যুঝে বেঁচে থাকাও আমার কাছে যেন মিথ্যা বলে মনে হল—না আছে আনন্দ, না আছে শান্তি, না আছে দু'দণ্ড বিশ্রাম,—একে কি আর জীবন বলে? এই তো আমাদের দুজনকে আর দেখতে পাচ্ছি না, আর দেখতে পাব কি না, তাও জানি না, এমনি বিপদের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে একে একে আমাদেরও লীলাখেলা সাঙ্গ হয়ে যাবে—দেশের কেউ আমাদের কথা জানতেও পারবে না, মরবার সময়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের মুখ পর্য্যন্ত দেখতে পাব না!

ভাবতে ভাবতে পথ চলছি। বিমল আর রামহরির মুখেও কোন কথা নেই, তারাও বোধ হয় আমারই মতন ভাবনা ভাবছে। ঘণ্টা-দুই পরে সূর্য্য পশ্চিম-আকাশের মেঘের দরজা খুলে অদৃশ্য হয়ে গেল, সমুদ্রের নীলজলের উপরে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

আরো খানিকক্ষণ চলবার পরে আমরা যে জায়গায় এসে দাঁড়ালুম, তার দুদিকে দুটো পাহাড় আর মাঝখানে অরণ্য। পায়ের দাগ বেঁকে সেই বনের ভিতরে চলে গেছে।

আমি বললুম, "বিমল, সামনেই রাত্রি, এখন এ বনের ভিতরে যাওয়া কি উচিত?"

বিমল বললে, "না গেলেও তো চলবে না!"

আমি বললুম, "কিন্তু গিয়েও তো কোন লাভ নেই। অন্ধকারে পায়ের দাগ দেখা যাবে না, আমরা যদি নিজেরাই কালকের মতন আবার পথ হারিয়ে ফেলি, তা হলে কুমার আর কমলকে উদ্ধার করবে কে?"

বিমল বললে, "তাহ'লে উপায়?"

—"আমার মতে আজকের রাতটা এই পাহাড়ের উপরে উঠে কোনরকমে কাটিয়ে দেওয়া উচিত। তারপর কাল ভোরে বনের ভিতরে ঢুকলেই চলবে।"

রামহরিও আমার মতে সায় দিলে।

বিমল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "আচ্ছা।"

ঠিক সেই সময়ে বাঘা হঠাৎ গোঁ গোঁ ক'রে গজরে উঠল ! আমি সচমকে চারিদিকে তাকালুম, কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। বাঘার মাথায় একটা চাপড় মেরে আমি বললুম, 'চুপ কর, বাঘা, চুপ কর।'

সে কিন্তু চুপ করলে না, আরো কয় পা এগিয়ে গিয়ে তেমনি গজরাতে লাগল !

রামহরি বললে, "বাঘা নিশ্চয় কিছু দেখেচে, ও তো মিথ্যে চ্যাঁচায় না।"

কিন্তু কি দেখেছে বাঘা ? এদিক ওদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ জঙ্গলের এক জায়গায় আমার নজর পড়ল— কারণ সেখানকার গাছপালা অল্প অল্প কাঁপছিল !

দু পা এগিয়েই আমি চমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। সভয়ে দেখলুম, গাছের পাতার ফাঁকে, অন্ধকারের ভিতর থেকে দুটো ভীষণ চোখ জ্বল্-জ্বল করছে ! সে ক্রূর চোখের দৃষ্টি কী নিষ্ঠুর—কী তীব্র—তার মধ্যে লেশমাত্র দয়া-মায়ার ভাব নেই ! কে ওখানে গাছের আড়ালে ব'সে অমন লোলুপ নেত্রে আমাদের পানে তাকিয়ে আছে —সে কি জানোয়ার, না মানুষ, না পিশাচ ?

সে চোখদুটোর মধ্যে কি সাংঘাতিক আকর্ষণ ছিল জানি না, কিন্তু নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমি পায়ে পায়ে তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলুম। শুনেছি সাপেরা কেবল চোখের চাউনি দিয়ে গাছের ডাল থেকে পাখীদের মাটির উপরে টেনে এনে ফেলে—আমারও সেই অবস্থা হ'ল নাকি ?

সেই ভয়ানক চোখের আকর্ষণে আচ্ছন্নের মতন এগিয়ে যাচ্ছি,—হঠাৎ পিছন থেকে বিমল ডাকলে, "বিনয়বাবু, বিনয়বাবু !"

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

— — —

নূতন ধাঁধা

বিধু আর সিধু দুই ভাই। তাদের বাবা অনেক হাঁস পুষেছেন। হাঁসেরা রোজ অনেক ডিম পাড়ে, আর তারা সেই ডিম দু'হাতে যারে তাকে বিলোয়। বাপ নানা উপায়েও ডিম পান না—শেষে তিনি এক ফন্দী ঠাওরালেন। তাঁর বাগানে একটা চৌকোণো পুকুর ছিল ; সেই পুকুরের মাঝখানে ছিল এক চৌকোণো দ্বীপ। হাঁস, সেই দ্বীপের মধ্যে

৭ম বর্ষ] চৈত্র, ১৩৩৩ [দ্বাদশ সংখ্যা

উল্টো দেখা

পণ্ডিতেরা দিদি
　　কেন এত শেখে ?
বড্ড যেটা সোজা
　　উল্টো সেটা দেখে।

সূর্য্য ওঠে পূবে,
　　পশ্চিমে যায় পাটে,
অস্ত-অচল পাবে
　　এম্‌নি দিন কাটে ?
সারথি তাঁর অরুণ—
　　অগ্নি বরণ রথে
সপ্ত অশ্ব জুড়ি'
　　চালায় আকাশ-পথে

এই ত, দিদি, ঠিক
এই আমাদের জানা!
পণ্ডিতেরা কিন্তু
বলবে, "না—না" "না—না।"
গুরুমশায় হেসে
বলবে, "তা নয়, ওরে,
সূর্য্য আছে স্থির
পৃথিবীটাই ঘোরে।"

পারবে না কো তর্কে,
কথায় ওরা দড় ;
আমাদের যা ছোট
ওদের যে তাই বড়।
পুট পুটে সব তারা
ফুট্ ফুটে ফুল যেন,
মস্ত ওদের বলে
কে জানে ভাই কেন!
আমাদেরি মত
ওরাও বেড়ায় খেলে,
নীল গগনের যত
ফুট্ ফুটে সব ছেলে।
তখন ছেলে মানুষ
মনে নাই কো কবে,
রাত্তিরে একদিন,
বছর খানেক হবে,

মা যখন ঘুমালো,
ওদের একটি তারা
ডাকলে আমায়, দিদি,
ক'রে সে ইসারা !
ওদের সঙ্গে ভাই
সেদিন রাত্রি বেলা,
খেলে এলুম গিয়ে
লুকোচুরি খেলা।
তারারা সব ছোট
এই আমাদের জানা,
পণ্ডিতেরা কিন্তু
বলবে, "তা নয়, না—না,
দেখেছ যা তা নয়,
ওরা অন্যতর,
পৃথিবীটির চেয়েও
তারাগুলি বড়।"

নন্দন-বন, স্বর্গ
শূন্য ওদের কাছে,
ওদের যাহা নাই
আমাদের তা আছে।
মিথ্যা তো সে নয়,
আমরা তারে চিনি,
ওই আকাশের গঙ্গা,
নামটি মন্দাকিনী।

নীল মাণিকের ঢেউ—
দুধের মত জলে
রূপালি পাল তোলা
সোনার নৌকা চলে,
সেই তরীতে চড়ি
সেই পারাবার বেয়ে
দূর বিদেশে চলে
কোন্ অমরার মেয়ে।
সেই আমাদের 'সত্যি'
মান্‌তে করে মান।
আমরা বলি, "আছে,"
ওরা বলে, "না—না'
মতি বোঝা ভার
ওদের মতামত ;
মন্দাকিনী মোদের
ওদের ছায়াপথ।
পণ্ডিতেরা দিদি,
এত কেন শেখে,
সোজা জিনিষ যত
উল্টো করে দেখে !

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বাইসাইকেলের জন্ম কথা

তোমরা আজকাল পথে ঘাটে বাইসাইকেল দেখতে পাও এবং তোমাদের মধ্যে অনেকে সাইকেল চড়ে থাক। কিন্তু বাইসাইকেলের জন্ম কোথা হতে হল—কে একে আবিষ্কার প্রথম করেন এবং তা কোথায় হয় —এই সকল প্রশ্ন বোধ হয় কারো মনে জাগে না। আমাদের মনে হয় যেন সাইকেল চিরকালই আছে—আমাদের পাঁচ ছয় পুরুষ আগের লোকেরাও আমাদের মতন সাইকেল চড়ে বেড়াতেন। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নয়।

আজকালকার যে রকম সাইকেল আমরা চড়ি, তার আদি আবিষ্কারক কার্ক প্যাট্রিক্ ম্যাকমিলান্ নামে একজন স্কটল্যাণ্ডদেশীয় কর্ম্মকার। এই কর্ম্মকার সেই সময়কার প্রচলিত "হবি হর্সে" সাইকেলের মত প্যাডেল লাগিয়ে চালাতে সমর্থ হয়। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে এই সাইকেল আবিষ্কার হয়।

অদ্ভুত সাইকেল।

এই "হবি-হর্স" একটি অদ্ভুত জিনিষ ছিল। সামনে এবং পিছনের দুইটি চাকা—মাঝখানে ডাণ্ডার উপর বসবার যায়গা, সামনের চাকার উপর হ্যাণ্ডেল সিটে বসে একবার ডান পা এবং একবার বাঁ পা মাটিতে ঠেকা দিয়ে দৌড়তে হত। এই প্রকারে চাকা দুইটি ঘুরতে ঘুরতে পথ চলত। এই "হবি হর্স" অর্থাৎ খেলনা ঘোড়া সেই সময় সখের এবং খেলার কাজেই ব্যবহৃত হত। সত্যিকার কোনো কাজে এর কোনো ব্যবহার ছিল না। এই "হবি-হর্স" যখন খুব

জোরে চলত তখন প্রায় হাঁটার মত বেগ হত। হবি-হর্স চড়ে একজন লোক প্রাণপণ শক্তিতে একে চালিয়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়ে ঘণ্টায় প্রায় আড়াই মাইল, তিন মাইল যেতে পারত। লোকে যখন হবি-হর্স চড়ে যেত, তখন সে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে চলত। এই সময় এই প্রকার গাড়ী চালাতে পারা একটা মহা বাহাদুরীর কাজ বলে গণ্য হত।

এর পর এক শ বছরের মধ্যে এই হবি-হর্সের সামান্য উন্নতি। পূর্ব্বে মোড় ঘুরাবার সময় চালককে হবি-হর্স হতে নেমে মোড় ঘুরোতে হত ক্রমে সামনের হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে মোড় ফিরবার উপায় আবিষ্কার হল। হবি-হর্সের ওজনও অনেক পরিমাণে কোমল। মাটিতে ঠেকা দিয়ে হবি-হর্স চালাবার জন্য বিশেষ প্রকারের বুট জুতার আবিষ্কারও এই সময় হয়। এই জুতার তলায় লম্বা পেরেক লাগান থাকত - তাতে পা দিয়ে সাইকেল ঠেলবার জোর বেশী পাওয়া যেত। হবি হর্স চালানো শিক্ষা দেবার জন্যে ইস্কুলও এই সময় অনেক স্থানে খোলা হয়।

হবি-হর্স আবিষ্কার হবার একশ বছরের পরে কার্কপ্যাটরিক্ ম্যাকমিলান প্যাডেল যুক্ত সাইকেল আবিষ্কার করে।

প্যাডেলওয়ালা সাইকেল আবিষ্কার হবার পর পঁচিশ বছর পর্য্যন্ত আরো কোনো উন্নতি এর হয় নাই। তারপর ফ্রান্সে সাইকেলের চাকার খুব উন্নতি হয়। প্যারিসে কাঠের মোটা চাকার পরিবর্ত্তে পাতলা চাকার আবিষ্কার হয়। তার পর ক্রমশঃ লোহার আরো পাতলা চাকার চলন হয়। বিলাতে কভেণ্ট্রি নামক স্থানে ফ্রান্সের এই সকল পাতলা চাকার আমদানি হত। সেই সময় হতেই কভেণ্টি

সাইকেল নির্ম্মানের জন্যে বিখ্যাত হয়ে পড়ে। ক্রমশ কাঠের স্পোকের বদলে তারের স্পোক (Spoke) ব্যবহার সুরু হল। চাকার মোটা লোহার হালের বদলে রবারের টায়ার ব্যবহার আরম্ভ হল। তারপর এই রবারের টিউব এবং টায়ারও আবিষ্কার হল। ১৮৭০ সাল হতে সাইকেলে সামনের এবং পিছনের চাকার ছোট বড় অনেক পরিমাণে কমতে লাগল। প্রথম প্রথম পিছনের চাকা ছিল অত্যন্ত বড় এবং সামনের চাকা ছিল অত্যন্ত ছোট। সামনের চাকা বড়তে লাগিল এবং পিছনের চাকা কমতে লাগিল।

প্রথম যুগে ... [illegible] ... রেস

এই প্রকার নানা রকম উন্নত হয়ে শেষে আজকালকার সাইকেলের জন্ম হল। সাইকেলের প্রথম যুগে ঘোড়ার গাড়ীওয়ালারা সাইকেলওয়ালাদের নানা জ্বালাতন করত। সুবিধা মত জায়গায় পেলে ঘোড়া গাড়ীর গাড়োয়ানরা সাইকেলওয়ালাদের ইট ছুঁড়েও মারতে ছাড়ত না। সাইকেলের স্পোকে ইট মেরে সাইকেলওয়ালাকে মাটিতে ফেলে দেবার জন্য ইট ছুঁড়বার যন্ত্র এই সময় গাড়োয়ানরা ব্যবহার করত।

হবি-হস বা খেয়াল ঘোড়া

কিন্তু এই অত্যাচার সত্ত্বেও সাইকেলওয়ালা সাইকেল চালাত ...

সাইকেল-ক্লাব হল। তখন দল বেঁধে সারিসারি সাইকেলওয়ালারা পথ দিয়ে তাহাদের সাইকেল চালাইতে আরম্ভ করে।

নিরেট টায়ারের স্থানে হাওয়াভরা টিউব এবং টায়ার ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে প্রথম ব্যবহৃত হয়।

হবি-হর্স চালাবার স্কুল

প্রথম প্রথম সাইকেলের সিট একটা চাকার ঠিক উপরে থাকত, ক্রমশঃ তার স্থান প্রায় দুই চাকার মাঝ খানে হইল। প্যাডেল প্রথম প্রথম সামনের চাকাকে ঘুরোত, ক্রমশ পিছনের চাকা ঘুরাবার মত করে লাগান হল।
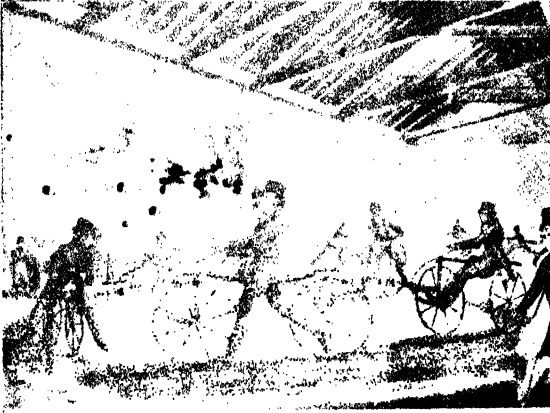
এই সময় বিলাতের নানা স্থানে সাইকেল তৈয়ারার কারখানা স্থাপিত হয়। প্রত্যেক কারখানাই চেষ্টা করত অন্য কারখানার চেয়ে ভাল এবং মজবুত গাড়ী নির্ম্মান করতে।

এই সময় স্ত্রীলোকেরা সাইকেল চড়লে লোকে তাকে মেয়ে-বোম্বেটে বলে ঠাট্টা করত। একবার একজন স্ত্রীলোক সাইকেল চড়ে গিয়েছিল বলে তাকে হোটেলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নাই।

১৮৯০ হতে ১৯০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে সাইকেলের প্রায় সকল রকম উন্নতির চরম হয়। ব্রেক ইত্যাদি খুব নিরাপদ করে চাকার সঙ্গে লাগান হয়। সাইকেলের সিটেরও নানাপ্রকার উন্নতি হয়।

এইবারে মোটর-সাইকেলের যুগ এসেছে। সাইকেলের উন্নতির বিষয় আর কেউ মাথা ঘামায় না। তবুও মনে হয় বাইসাইকেল চিরকাল থাকবার জন্যে

এসেছে। মোটর সাইকেল যতই ভাল হোক এবং এর বেগও যত বেশী হোক —খরচও তেমনি সাইকেলের চেয়ে অনেক বেশী। সাধারণ লোক, যে গাড়ী ঘোড়া, মোটর বা মোটর সাইকেল রাখতে পারে না, সেও অনায়াসে সাইকেল রাখতে পারে। গ্রামেও মোটর সাইকেল অপেক্ষা সাইকেলের সুবিধা ঢের বেশী; সাইকেলের হাঙ্গামাও অনেক কম। মোটর সাইকেল হাজার চেষ্টা করলেও তাড়াতে পারবে না।

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

এডিনবরা

স্কটলণ্ডের তলার দিকে পূর্ব্ব সাগরের কাছে ছোট ছোট পাহাড়ের ওপর এডিনবরা একটি ছোট সুন্দর সহর। লণ্ডনের মতন মোটেই বড় নয় কিন্তু খুব সুন্দর। লণ্ডন থেকে রেলে আসতে প্রায় দশ ঘণ্টা লাগে। আগে এডিনবরা স্কটলণ্ডের রাজধানী ছিল, তারপর ১৭০৭ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড যখন এক রাজার অধীনে যুক্তরাজ্য হয়ে গেল, তখন লণ্ডনই সমস্ত রাজ্যের রাজধানী হল। কিন্তু এডিনবরা স্কটলণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে বড় সহর হয়ে রইল।

সহরটি খুব পুরাতনও বটে। সহরের একদিকে পুরান বাড়ী-ঘর-দোর, আর এক দিকে সব নতুন ফ্যালফ্যাসনের বাড়ী, এই দুরকম মিলে সহরটিকে বড় সুন্দর করেছে।

ষ্টেসন থেকে বাহির হয়েই একটি সুন্দর রাস্তা। রাস্তাটির নাম হচ্ছে Princess Street। প্রিন্‌সেস ষ্ট্রীট খুব চওড়া রাস্তা—প্রায় এক মাইল টানা সোজা চলে গেছে, তার একদিকে সুন্দর সুন্দর বড় বাড়ী, দোকান, হোটেল, আর একদিকে বাগান, সুন্দর সবুজ মাঠ। রাস্তাটিকে দেখে কলকাতার চৌরঙ্গীর কথা মনে পড়ে।

সার ওয়াল্টার স্কটের নাম (Sir Walter Scott) তোমরা অনেকে বোধ হয় শুনেছ। তিনি একজন প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক; তিনি অতীত ইতিহাসের সব

ঘটনা নিয়ে বড় সুন্দর গল্প লিখে গেছেন। তিনি স্কটলণ্ডের লোক, এডিনবরাতে থাকতেন। এই প্রিনসেস্ ষ্ট্রীটের ডান দিকে বাগানের মধ্যে তাঁর প্রতিভার সম্মান দেখাবার জন্য একটি সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ আছে। স্মৃতিচিহ্নটি একটি সুন্দর গথিক্ টাওয়ার, ২০০ ফিট উঁচু। চারটি খিলানের উপর গড়া। টাওয়ারটি থাকে-থাকে সরু হয়ে উঠে গেছে, তার গায়ে খোপে খোপে স্কটের নানা উপন্যাস হতে প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ চরিত্রগুলির ছোট ছোট পাথরের মূর্ত্তি বসান। একজন লেখকের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্যে তার লেখা থেকে প্রসিদ্ধ লোকদের মূর্ত্তি গড়ে, তার স্মৃতিস্তম্ভে সেগুলি সাজিয়ে রাখা বড় সুন্দর। স্তম্ভটির মাঝ-খানে স্কটের একটি মূর্ত্তিও আছে।

স্কটের বাগা

স্কট নিজের থাকবার জন্য যে বাড়ী করেছিলেন সেটি এডিনবরা থেকে কিছু দূরে। নির্জ্জন পাহাড়ের মধ্যে টুইড (Tweed) বলে একটি ছোট নদী তীরে এই সুন্দর বাড়ী। ইয়োরোপে মধ্যযুগে অর্থাৎ পাঁচ শ বছর আগে রাজা বা নাইটেরা যেরূপ থাকবার বাড়ী (Castle) তৈরী করতেন, বাড়ীটি সেই রকম ভাবে তৈরী। একদিন মোটর করে সেই বাড়ী দেখতে গেছলুম, তার নাম হচ্ছে Abbotsford। স্কট যে ঘরে থাকতেন, যে ঘরে বসে পড়তেন, গল্প লিখতেন, যে ঘরে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করতেন, সে সব ঘরে চেয়ার টেবিল ইত্যাদি সব সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেন মনে হয় কাল এখানে বসে স্কট তাঁর উপন্যাস লিখেছেন। প্রতিদিন কত স্কট-ভক্ত তাঁর বাড়ী দেখে যান।

প্রিন্‌সেস্ ষ্ট্রীট থেকে স্কট-মনুমেন্ট ছাড়া আর একটি জিনিষ প্রথমে চোখে পড়ে, সেটি হচ্ছে এডিনবরা দুর্গ (Edinburgh Castle)। সহরের মধ্যে একটি ছোট পাহাড়ের মাথায় সুন্দর দুর্গ, সমস্ত সহরের মাথায় একটা লোহার মুকুটের মতন বসান। এই দুর্গটি খুব পুরাতন সময়ের। সামনের দিকটা খাড়া পাহাড়, সে দিক দিয়ে ওঠবার জো নেই, পেছন দিকে পাহাড় ঠালু হয়ে নেমে গেছে, সেই দিকে প্রবেশ দ্বার। এই দুর্গের আশ্রয়ের ছায়ায় যে ছোট গ্রামখানি গড়ে উঠেছিল তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী বেড়ে এখন বিখ্যাত বিশাল সহর।

স্কট মনুমেন্ট

দূর থেকে পাহাড়ের মাথায় ছোট দুর্গটি ছবির মত দেখায়। দুর্গটি ঢুকতে প্রথমে সামনে একটি প্রকাণ্ড খোলা মাঠ পার হতে হয়। এই মাঠে আগে কত শতাব্দী ধরে, কত লোককে হত্যা করা হয়েছে। বিচারে কারুর প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হলে, এই মাঠে কুঠার দিয়ে মাথা কাটা হত বা আগুনে পুড়িয়ে মারা হত। এখন অবশ্য এখানে কাউকে বধ করা হয় না। এখন এখানে সৈন্যদের কুজকাওয়াজ হয়।

এই মাঠ পেরিয়ে এক পোল দিয়ে দুর্গের তোরণ দ্বারে ঢুকতে হয়। দুর্গের চারদিকে যে খাদ কাটা আছে তার ওপর এই পোল। এই পোলটি ইচ্ছা মত দুর্গের ভিতর টেনে তুলে নেওয়া যায়, তার পর দুর্গের দরজা বন্ধ করে

দিলে, গভীর খাদ না পেরিয়ে ঢোকবার জো নেই। খাদের পরে শক্ত উঁচু দেওয়াল দিয়ে সমস্ত দুর্গ ঘেরা।

স্কটলণ্ডের ইতিহাসের অনেক ঘটনা এই দুর্গটির সঙ্গে জড়িত। যারা ইতিহাস জানে তাদের কাছে এটি খুব রহস্যকর।

দুর্গের ওপরে উঠে তলায় সমস্ত সহরটি ও দূরে ছোট ছোট পাহাড়ের মালা নীল সমুদ্রের তীর সুন্দর দেখা যায়।

এডিনবরা দুর্গ

দুর্গের ভিতর একটি পুরাতন বৃহৎ কামান আছে, তার নাম হচ্ছে Mons Meg। সেটি ১২ফিট লম্বা। অবশ্য এখনকার কামানের তুলনায় সেটি শিশু-কামান; কিন্তু কামানটি প্রায় পাঁচশ বছর আগের বলে আশ্চর্য্যকর। দুর্গের মধ্যে সেণ্ট মারগারেটের চ্যাপেল বলে একটি ছোট প্রার্থনা ঘর বা গির্জ্জা আছে, সেটি সাড়ে আট শ বছর পুরাতন হবে। অত পুরাতন কালের প্রার্থনা ঘর বলে ঘরটি যত্নে রাখা হয়েছে।

দুর্গ থেকে সহরের প্রান্তে একটি বড় পুরাতন বাড়ী চোখে পড়ে। সেটি হচ্ছে হলিরুড (Holyrood)। একবার স্কটলণ্ডের এক প্রাচীন রাজা মৃগয়া করতে বাহির হয়েছিলেন, একটা হরিণ তাঁর দিকে শিং বেঁকিয়ে তেড়ে আসে, সহসা কে তাঁর হাতে একটি ক্রুশ দিয়ে যায়, তা দেখে হরিণটি ভয়ে পালায়, তাঁর প্রাণ রক্ষা হয়। সেই জন্যে তিনি একটি গির্জ্জা ও খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের [illegible] তৈরী করে দেন

তার নাম হয় পুণ্যক্রুশ বা হলিরুড। তারপর তাঁর বংশধরেরা ওই জায়গায় থাকবার প্রাসাদ তৈরী করে। এখন প্রসাদটিকে সুন্দরভাবে আছে, কিন্তু পুরাতন গির্জ্জার ধ্বংশবিশেষ আছে, এই ভাঙা গির্জ্জা সন্ধ্যার আলোয় দেখতে বড় সুন্দর হয়।

নতুন এডিনবরার চেয়ে পুরাতন সহরটিই দেখতে ভাল লাগে। এই পুরাতন সহরটির মধ্যে একটি বাড়ী দেখতে সবাই আসে। সেটি হচ্ছে জন নক্সের বাড়ী (John Knox's House)। জন নক্স একজন তেজী খৃস্টধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন, তিনি ১৫৭২ খৃঃ অব্দে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর ঘর বাড়ী টেবিল চেয়ার ইত্যাদি যেরূপ ছিল, ঠিক সেইরূপ ভাবে এখনও সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বাড়ীটি দেখলে ইংলণ্ডের ষষ্ঠদশ শতাব্দীর বড় ঘর কেমন ছিল তার ধারণা হয়। বাড়ীটি কাঠের —ঘরগুলি ছোট ছোট, জানলাও ছোট ছোট, ছোট বারান্দা ও সুন্দর সুন্দর কোণ আছে। বাড়ীর তলায় একটি ছবির দোকান।
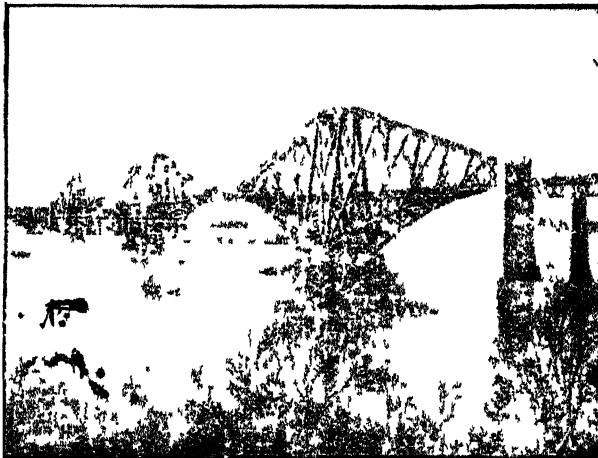
ফোর্থের পোল

স্কটলণ্ড হচ্ছে পাহাড়ে জায়গা। তবে তলার দিকটা অত পাহাড়ে নয়। এডিনবরার চারিদিক সুন্দর ঢেউখেলান, উঁচুনীচু। কালটন বলে একটি পাহাড় থেকে সহরটা বড় সুন্দর দেখায়। প্রথম দেখা যায় দুর্গ তার পর তার নীচে ও আশপাশে থাকে থাকে সুন্দর বাড়ী সাজান—তাদের উপর স্কট মনুমেণ্টের ধ্বজা দেখা যাচ্ছে।

এডিনবরার কাছে অনেক সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঐতিহাসিক স্থান আছে

দেখবার অনেক জায়গা আছে। কার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ আশ্চর্য্যাকর পোল সবাই দেখতে যান। পোলটির নাম Forth Bridge বা ফোর্থ সেতু। এই সেতু ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার একটি আশ্চর্য্যকর কীর্ত্তি। Forth নদী সমুদ্রে যেখানে গিয়ে পড়েছে সেই মোহানার কাছে সেতুটি তৈরী। স্কটলণ্ডের বড় ম্যাপে ফোর্থ নদীর মোহানার ছবি দেখলে বুঝতে পারবে। এখানে নদী খুব গভীর এবং খুব ঝড়-বাতাসও আছে।

সমস্ত সেতুটি প্রায় দেড় মাইল লম্বা; সেতুর রাস্তা জল থেকে ১৫০ ফিট উঁচু। এই সেতু তৈরী করতে মিলিয়নের ওপর পাউণ্ড খরচ হয়েছিল।

এডিনবরার যে জিনিষটি সব চেয়ে চোখে ভাসে সেটি হচ্ছে তার দুর্গ, এই দুর্গ সমস্ত সহরের ওপর প্রহরীর মত জেগে রয়েছে। যখন সন্ধ্যা হয়ে আসে, চারিদিক অন্ধকার হয়, তখন এ দুর্গের আলো আলোক-প্রদীপের মত সহরের ওপর জ্বলজ্বল করে, দূরে সাগরে নাবিকেরা জাহাজ থেকে তা দেখে ঘরের কথা ভাবে, দূরে পাহাড় বনে কৃষকেরা সেই আলো দেখতে দেখতে তাদের ঘরে ফেরে।

শ্রীমনীন্দ্রলাল বসু

লাইসিন্, সুইজারল্যাণ্ড

মৌমাছি

মৌচাক

বাবু আর বিবি মৌমাছিরা মৌচাক গড়তে জানেনা—কেবল গোলামরাই জানে। মৌচাক তৈরী করবার জায়গাটি এরা আগে ভাল করে খুঁজে নেয়—যেখানে পরিষ্কার বাতাস পাওয়া যায়, ফুলের অভাব হয় না, জল যথেষ্ট আছে, শত্রুর ভয় নেই—এই রকম জায়গা।

মৌচাক তৈরী হয় মোম দিয়ে, কিন্তু এই মোম এরা কোথা থেকে পায় জান?

আগেই বলেছি, এদের দুটো পাকস্থলী আছে, একটা সাধারণ খাবার হজম করবা-জন্য, একটা মধু তৈরী করবার জন্য। এরা মধুর পাকস্থলীতে যখন মধু জমা করে তখন খাঁটি মধুটুকু পাকস্থলীতে রেখে অসার অংশটা শরীরের বাইরে বার করে দেয়। এই অসার অংশটুকুই মোম। সেই জন্যে মোমের সংস্কৃত নাম 'মধুমল' বা মধুর অসার অংশ। এই মোম এদের শরীরের আটটা থলিতে জমা থাকে। হিসেব করে দেখা গেছে দশ পনের সের মধু থেকে এক সের মোম বেরয়।

গোলাম মৌমাছিরা প্রথমে পায়ের ঝাঁটা দিয়ে মৌচাক গড়বার জায়গাটি পরিষ্কার ঝরঝরে করে নিয়ে তবে মৌচাক গড়তে সুরু করে।

এরা মোমের থলি থেকে প্রথম যখন মোম বার করে সে মোম শক্ত আর নোংরা থাকে। সে রকম মোমে মৌচাক গড়া চলে না, তাই তারা মোমকে চোয়াল দিয়ে চিবোতে আরম্ভ করে দেয়। চিবোবার সঙ্গে সঙ্গে এদের মুখ থেকে এক রকম লালা বার হয়ে মোমটুকু পরিস্কার আর নরম করে দেয়। মোম যতক্ষণ না খুব নরম হয় ততক্ষণ এরা সেটুকু চিবোতে থাকে।

মোম তৈরী হয়ে গেলে এক জনের পর একজন নিজের নিজের মোম মৌচাক তৈরী করবার জায়গায় জমা করতে থাকে। দেখতে—দেখতে অনেকটা সাদা মোম সেখানে জমে ওঠে। তখন গোলামদের মধ্যে দু-তিন-জন মিস্ত্রী উঠে মোমকে চেপে চেপে সমান করে। তারপর সেই মোমে সমান সমান ছোট-ছোট ছ-কোণা গর্ত্ত করে দেয়। এই গুলোই মৌচাকের খোপ।

মৌচাকে তিন রকম খোপ থাকে—প্রথম, বাচ্চাদের খোপ। এই মৌমাছিদের বাচ্চারা বড় হয়; গভীর আধ ইঞ্চি, ব্যাস সিকি ইঞ্চি। দ্বিতীয়, রাখবার খোপ; এগুলোর মুখ হেলানো-ভাবে উপর দিকে থাকে। এ আর ব্যাস বাচ্চাদের খোপেরই সমান। তৃতীয়, বাচ্চা বিবিদের পরিমাণে অনেক বড়। দেখতে ছোট ছোট বাটির মত।

[illegible] করা হয়।

মৌচাকের উপরের অংশে এরা মধু পরাগ ইত্যাদি জমিয়ে রাখে আর নীচে অংশটা রাণীর ডিম পাড়বার ঘর—বাচ্চারা যেখানে বড় হয়।

মৌচাকের প্রত্যেক খোপ সমান উঁচু, সমান চওড়া সব রকম ভাবে সমান ... সাজান। এই কাজ করবার এদের আর কোন মাপকাটি বা যন্ত্র নেই, আছে কেবল এদের সেই আশ্চর্য্য শুঁড়'টি।

ফুল থেকে মধু ও পরাগ সংগ্রহ

মৌমাছিরা ফুল থেকে একদিন মধু আর একদিন পরাগ সংগ্রহ করে।

মানুষ যেমন ধান চাল, গম, আলাদা-আলাদা গোলায় জমা করে রাখে, মৌমাছিও তেমনি এক এক ফুলের পরাগ এক এক জায়গায় রাখে।

মৌমাছিরা পায়ের ঝাটাতে করে ফুলের পরাগ জড় করে, তারপর ফুল থেকে এক ফোটা মধু নিয়ে তার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। সেই পরাগের-ডেলা একটার পর একটা পায়ের থলিতে জমা করতে থাকে। এমনি ভাবে জমাতে জমাতে যখন এক থলি পরাগ হয়ে যায়, এর মৌচাকে ফিরে গিয়ে পরাগ বার করে দেয়। এক সময় এরা থলিতে এত পরাগ করে ফেলে যে এদের উড়তে ভারি কষ্ট হয়।

...রে এরা জমায় আগেই বলেছি। মধুর সবচেয়ে ছোট বিন্দুও এরা ফেলে ... মত এরা আলাদা আলাদা ফুলের মধু আলাদা-আলাদা জায়গায় রাখবার উপায়ও নেই। কারণ পেটের মধ্যেই সব মধু মিশে ... য়।

যে ... শুধু এক জাতের ফুল থেকে নেওয়া হয়েছে তাকে সেই ফুলের মধু বলা ...যেমন "কদমের মধু" "পদ্ম মধু"। এই রকম এক জাতের মধু প্রায়ই পাওয়া যায় ... না রকম ফুল মেশানো মধুই বেশী পাওয়া যায়। যে সব জায়গায় এক জাতের ... মৌচাক তৈরী ক... আছে সেখানে মৌচাকে প্রায় সেই ফুলের মধু পাওয়া যায়।

বাতাস পাওয়া যায়, বর্ষা, এই তিন ঋতু এরা শুক্লপক্ষে মধু জমায় আর কৃষ্ণ পক্ষে পেট ... এই ঋতুগুলো ... হেমন্ত কালে এদের মধু জমাবার জন্যে ... পড়ে যায় মৌচাক তৈরী হয় মো... এরা সঞ্চয় করে তা শীতকালে খেয়ে শেষ করে ...